তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
স্ব-নির্বাচিত গল্প

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ
৯৩, হারিসন রোড, কলিকাতা ৭

প্রথম সংস্করণ :
৭ই শ্রাবণ, ১৩৬১

দ্বিতীয় সংস্করণ :
চৈত্র, ১৩৬২

চার টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : [illegible] মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
প্রভু প্রেস
৩০ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

জগদীশ ভট্টাচার্য

প্রীতিভাজনেষু

লেখকের কথা

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী অনেক
গল্প লেখকদের সুনির্বাচিত গল্প সংগ্রহ প্রকাশে উদ্যোগী
হয়েছেন। আমার গল্প সংগ্রহ তাঁদেরই সুনির্বাচিত গল্প
সেই গ্রন্থমালার অন্যতম গ্রন্থ। এর মধ্যে তৃতীয় প্রকাশের মধ্যেই
দশ-তম বই। পাঠকদের কাছে লেখকদের নির্বাচিত গল্পের
একটা মূল্য আছে। তবে পাঠকেরা যাচাই করে দেখতে পারবেন
তাঁদের বিচারের সঙ্গে লেখকের বিচারবুদ্ধির মিল কতখানি
তফাৎ কতখানি। এই কারণেই লেখককে এ সংগ্রহে সূচিপত্র
লিখবার ভার দিতে হয়েছে। পাঠকের কাছে নির্বাচনের একটা
সূত্র ধরিয়ে দিতে হবে।

নির্বাচন অনেক রকম করা যায়। এর আগে একটি গল্প
সংগ্রহের গল্প আমি নির্বাচন করেছি। তার নামের মধ্যেই
আমার নির্বাচনের সূত্রটি দেওয়া আছে। 'আমার প্রিয়গল্প'।
আমার জীবনের কতকগুলি স্মরণীয় ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে
যে গল্পগুলি, আমার মনের কাছে আদরণীয় হয়ে রয়েছে -
ভালো মন্দ নির্বিশেষে, তারই সংকলন।

এক প্রকাশক প্রস্তাব করেছিলেন - সেরা গল্পগুলি একত্রিত
করে দেবার কথা। সাহস পাই নি। সুতরাং সুদূর। কিন্তু আমি
জানি - এবং পাঠকেরাও জানেন - সেরা গল্প আমার কোনটি নেই;
সেরার সন্ধানে আমিও নিজে আছি।

রাজনৈতিক চেতনা, দেশের বিশেষ কোন অবস্থার সূত্র ধরে
গল্প নির্বাচন করা চলে। শুধু চলে না, তারই চেষ্টাই প্রবল
হয়ে উঠেছে। এক সময় '১৩৫০' নাম দিয়ে একখানি গল্প সংগ্রহ
আমার প্রকাশিত হয়েছিল। সে বইখানির একটি দুটি মাত্র
গল্প অন্য গল্প সংগ্রহে অন্তর্ভুক্ত করে বইখানির দ্বিতীয় প্রকাশ

আমি বন্ধ করে দিয়েছি। অনেকে প্রশ্ন করেছেন। উত্তর সকলকে দেওয়া হয় নি। আজকের ভূমিকায় তার উত্তর দেওয়া হবে।
আমার সাহিত্যজীবনের আয়ু হল আজ পর্যন্ত বাইশ তেইশ বছর। এই বাইশ তেইশ বছরে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি কত না পাল্টালো! যে দেশের জীবন নিয়ে গল্প রচনা করি তার পটভূমি কত না বদলালো। 'গতং অনুদ্দয়' কাজের কথাই। এ চিরকাল আছে; এ কালেও রয়েছে - অতীত দৃষ্টিভঙ্গি বদল হয়ে চলেছে; আগামী কালেও থাকবে। পটভূমিও ভাববাদ অনেক বদলই হবে। এই ভাববাদ ও পটভূমির আমূল পরিবর্তনের মধ্যে কালান্তর হয়, পুরানো কাল যায় নূতন কাল আসে। কাল-প্রধান কাহিনী গল্প-ইতিহাসের উপাদানের মূল্য ছাড়া অন্য সকল মূল্যই হারিয়ে বসে।
সেকাল - একাল - অর্থাৎ খণ্ড খণ্ড কাল নিয়ে চিরকাল বা মহাকাল। মহাকালের মধ্যে ~~[struck out]~~ বা চিরকালের মধ্যে আছে একটি চিরন্তনীর সুর। সে সুর ইতিহাস নয়, ইতিহাস সূত্রে গাঁথা শুকনো ফুলের মরে যাওয়া পাপড়ি। সুর এটি হল জীবনের সুখ ও দুঃখের - হাসি ও কান্নার মধ্য দিয়ে চাওয়া ও পাওয়া, পাওয়া ও হারানো, হারানো ও খোঁজার, পাওয়ার মধ্যেও না পাওয়ার, না-পাওয়ার মধ্যেও অনন্ত তৃপ্তির বিচিত্র কথার সুর। সে সুর ধরা যায় না - ছোঁয়া যায় না - অর্থাৎ তাকে ইন্দ্রিয়ের ধরা যায় না চোখের সামনে। কিন্তু উপলব্ধি করা যায়। সাহিত্যের সৃষ্টি সেই ধরা ছোঁয়ার বাইরের সুরটি ধরে যখন গাঁথে - মিলন সূত্রের গাঁথা মালার মত।
আমার একটি গল্প আছে - 'ভৈরবী মাঝি'; পটভূমি ময়ূরাক্ষী। ময়ূরাক্ষীর সর্বনাশা- হড়পা বান দেশের বুকে কি ধ্বংসলীলায় বয়ে চলে যায় - তার বর্ণনা তাতে অনেক আছে। কিন্তু তার থেকে বড় হয়ে উঠেছে ভৈরবীর সুখ দুঃখ। আজ ময়ূরাক্ষী বাঁধা পড়েছে। এ কালে বাঁধে বাঁধা ময়ূরাক্ষী - তার বন্যাশক্তি সংহত করে শান্ত হয়েছে। শান্ত শিষ্ট - মেয়েটির মত সে আজ দেশে দেশে কাঁখে তার পূর্ণকুম্ভ নিয়ে তৃষ্ণার জলে অন্নসত্র ব্রতধারিণী হয়ে দিন পরিবেশন করে ফিরছে। ভৈরবী মাঝি গল্পের পটভূমি ময়ূরাক্ষীর বন্যার বর্ণনা আজ ইতিহাসের উপাদান হয়েছে। আবার সেকালের কণ্টকই ময়ূরাক্ষীর [illegible] বন্যার বর্ণনার মধ্যে অনেক

পড়লে দেখে বিস্মিত হবে। কিন্তু তারিণী-মাঝি গল্পটির
সঙ্গে এমনই প্রাণবান — তার সুখদুঃখ এমনই চিরকালের
সুখদুঃখ যে তাকে অতিক্রম কালের সাধ্য নেই বলে মনে হবে।
তারিণীই গল্পটিকে কাল থেকে কালান্তরে নিয়ে যাবে।
তারিণী মাঝি সম্পর্কে এ বিশ্বাস আমার আছে।

তারিণী মাঝি — তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ গল্পের অন্তর্ভুক্ত।
সেই কারণে সে গল্পটিকে এ সংগ্রহের মধ্যে স্থান দিই নি।
তাতে পুনরুক্তি বা পুনরাবৃত্তির দোষ ঘটবে। প্রিয়গল্পের
মধ্যে — শ্রেষ্ঠ গল্পের মধ্যে যে সব গল্প আছে — সেগুলি
বাদ দিয়ে — এই সূত্র ধরে যে গল্পকে আমি আমার
বিচার বুদ্ধি মত পাঠকের হাতে মহাকালের দুয়ারে নিক্ষেপ
করতে পারি — সেই গল্পগুলিকেই এতে স্থান দিয়েছি।

অনেকে হয় তো বা হাস্য করবেন। কেউ কেউ তিক্ত হবেন।
বলবেন, খণ্ডকালের ভগ্নাংশ পার হওয়ার জোর নেই, মহাকাল
মহাকাল কর কেন? উত্তরে আমি যে রাঢ়দেশের মানুষ, সেই
রাঢ়দেশের একটি কথা বলি। মাটির দেওয়ালের উপর
বাঁশ কাঠ, তাল কাঁড়ি, কাশবনের ছাউনির কাঠামো তৈরী করে
খড় দিয়ে ছাইয়ে আমরা ঘর তৈরী করতাম। আজও করি।
দেবতার পাকামন্দির তৈরী করবার সামর্থ্যের অভাবে ওই
ভাবেই দেবতার ঘর, আটচালা মাটির মন্দির তৈরী করে
তার চৌকাঠে লিখে দিই — যাবচ্চন্দ্র দিবাকর। অর্থাৎ
চন্দ্র সূর্য যতদিন। কথাটা দম্ভের নয়। ওটা নিবেদনমন্ত্র।
ওগো তুমি চিরকাল — তোমার চরণে চিরকালের জন্য নিবেদন
করে আমি ধন্য হলাম। থাকে তো রেখো, না হয়
দিয়ো — ধূলিসাৎ করে ধুলোয় মিশিয়ে। এ ক্ষেত্রে আমার
কথাও তাই। যিনি কাল, যিনি রুদ্র, যিনি অন্তে আবির্ভূত
এবং যিনিই মহাকাল, যিনি পরমশান্ত, যিনি অনন্ত
মৃত্যুঞ্জয়, তাঁরই চরণে পৌঁছে দেবার জন্য পাঠক-
পুরোহিতের হাতে তুলে দিলাম।

৭ই শ্রাবণ
১৩৬২

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

আখ্‌ড়াইয়ের দীঘি

কয়েক বৎসর পর পর অজন্মার উপর সে বৎসর নিদারুণ অনাবৃষ্টিতে দেশটা যেন জলিয়া গেল। বৈশাখের প্রারম্ভেই অন্নাভাবে দেশময় হাহাকার উঠিল। রাজ সরকার পর্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। সত্যই দুর্ভিক্ষ হইয়াছে কিনা তদন্তের জন্য রাজকর্মচারী-মহলে ছুটাছুটি পড়িয়া গেল।

এই তদন্তে কান্দী সাব্‌-ডিভিসনের কয়টা থানার ভার লইয়া ঘুরিতেছিলেন রজতবাবু ডি. এস. পি., সুরেশবাবু ডেপুটি আর রমেন্দ্রবাবু কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টর। অতীতকালের সুপ্রশস্ত বাদশাহী সড়কটা ভাঙিয়া-চুরিয়া গো-পথের মত মানুষের অব্যবহার্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ঠিকাদার মাটির ঢেলা বিছাইয়া পথটিকে আরও দুর্গম করিয়া তুলিয়াছে। কোনরূপে তিনজনে এক পাশের পায়ে-চলা পথরেখার উপর দিয়া বাইসিক্ল ঠেলিয়া চলিয়াছিলেন।

বৈশাখ মাসের অপরাহ্ণবেলা। বিদগ্ধ আকাশখানা ধূলাচ্ছন্ন ধূসর হইয়া উঠিয়াছে। কোথাও কণামাত্র মেঘের লেশ নাই। হু হু করিয়া গরম বাতাস পৃথিবীর বুকের রস পর্যন্ত শোষণ করিয়া লইতেছিল। একখানা গ্রাম পার হইয়া সম্মুখে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর আসিয়া পড়িল। ও-প্রান্তের গ্রামের চিহ্ন এ-প্রান্ত হইতে দৃষ্টিতে ধরা দেয় না। দক্ষিণে বামে শস্যহীন মাঠ ধূ-ধূ করিতেছে। গ্রামের চিহ্ন বহু দূরে দিগ্‌বলয়ে কালির ছাপের মত বোধ হইতেছিল।

রজতবাবু চলিতেছিলেন সর্বাগ্রে। তিনি ডাকিয়া কহিলেন—নামছি আমি। আপনারা ঘাড়ের উপর এসে পড়বেন না যেন। তিনজনেই বাইসিক্ল হইতে নামিয়া পড়িলেন। সঙ্গীরা কোন প্রশ্ন করিবার পূর্বেই তিনি বলিলেন—কই মশাই সামনে গ্রামের চিহ্ন যে দেখা যায় না! এদিকে দিবা যে অবসান প্রায়।

রমেন্দ্রবাবু কোমরে ঝুলান বাইনাকুলারটা চোখের উপর ধরিয়া কহিলেন—দেখা যাচ্ছে গ্রাম, কিন্তু অনেক দূরে। অন্ততঃ পাঁচ-ছ মাইল হবে। রজতবাবু রিস্টওয়াচটার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—পৌনে ছ'টা। এখনও

আধঘণ্টা তিন কোয়ার্টার দিনের আলো পাওয়া যাবে; কিন্তু এদিকে যে বুক মরুভূমি হয়ে উঠল মশাই। আমার ওয়াটার ব্যাগে ত একবিন্দু জল আর নেই। আপনাদের অবস্থা কি?

রমেন্দ্রবাবু কহিলেন—আমারও তাই! সুরেশবাবু, আপনার অবস্থা কি? আপনি যে কথাও বলেন না, দৃষ্টিটাও বেশ বাস্তব জগতে আবদ্ধ নয় যেন। ব্যাপার কি বলুন ত?

সুরেশবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—সত্যিই বর্তমান জগতে ঠিক মনটা নিবদ্ধ ছিল না। অনেক দূর অতীতের কথা ভাবছিলাম আমি।

রজতবাবু সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন—অতীত যখন তখন ইণ্টারেস্টিং নিশ্চয়, চাই কি রোমাণ্টিকও হতে পারে। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য আর ভাবতে হবে না। উঠে পড়ুন গাড়িতে। গাড়িতে চলতে চলতেই আপনি গল্প বলতে শুরু করুন। আমরা শুনে যাই। কিন্তু এই চার-পাঁচ মাইল পথ কভার করবার মত গল্পের খোরাক হওয়া চাই মশাই!

সুরেশবাবু আপনার জলাধারটি খুলিয়া আগাইয়া দিয়া বলিলেন—আমার জল এখনও আছে। জল পান ক'রে একটু সুস্থ হ'ন আগে।

জলপানান্তে সুরেশবাবুকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়া রজতবাবু বলিলেন—আপনি কথক। আপনাকে আগে যেতে হবে।

সকলে গাড়িতে চড়িয়া বসিলেন।

সুরেশবাবু বলিলেন—আপনাদের জলের চিন্তার কথা শুনেই কথাটা আমার মনে পড়ল।

পিছন হইতে রমেন্দ্রবাবু হাঁকিলেন—দাঁড়ান মশাই, দাঁড়ান। বাঃ, আমাকে বাদ দিয়ে গল্প চলবে কি রকম?...বেশ, এইবার কি বলছিলেন বলুন। একটু উচ্চকণ্ঠে কিন্তু।

সুরেশবাবু বলিলেন—যে রাস্তাটায় চলেছি আমরা, এ রাস্তাটার নাম জানেন? এইটেই অতীতের বিখ্যাত বাদশাহী সড়ক। এ রাস্তায় কোন পথিক কোন দিন জলের জন্য চিন্তা করেনি। ক্রোশ-অন্তর দীঘি আর ডাক-অন্তর মসজিদ এ-পথের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত নির্মিত হয়েছিল। দীঘিগুলি এখনও আছে—

বাধা দিয়া রজতবাবু প্রশ্ন করিলেন—ডাক-অন্তর মসজিদটা কি ব্যাপার?

—ডাক-অন্তর মসজিদের অর্থ হচ্ছে এক মসজিদের আজানের শব্দ যত দূর পর্যন্ত যাবে তত দূর বাদ দিয়ে আর একটি মসজিদ তৈরী হয়েছিল। এক মসজিদের আজান-ধ্বনি অপর এক মসজিদ থেকে শোনা যেত। একদিন ভাবুন —দেশদেশান্তরব্যাপী সুদীর্ঘ এই পথখানির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একসঙ্গে আজান-ধ্বনি ধ্বনিত হয়ে উঠত। ওই—ওই দেখুন, পাশের ওই যে ইটের স্তূপ—ওটি একটি মসজিদ ছিল। আর প্রতি ক্রোশে একটি দীঘি আছে। তাই বলছিলাম এ-রাস্তায় কেউ কখনও জলের ভাবনা ভাবেনি।

রমেন্দ্রবাবু কহিলেন—বাদশাহী সড়ক যখন তখন কোন বাদশাহের কীর্তি নিশ্চয়। কিন্তু কোন্ বাদশাহের কীর্তি মশাই ?

—ঠিক বুঝতে পারা যায় না। ঐতিহাসিকেরা বলতে পারেন। তবে এ বিষয়ে সুন্দর একটি কিংবদন্তী এদেশে প্রচলিত আছে। শোনা যায় নাকি কোন বাদশাহ বা নবাব দিগ্‌বিজয়ে গিয়ে ফেরবার মুখে এক সিদ্ধ-ফকীরের দর্শন পান। সেই ফকীর তাঁর অদৃষ্ট গণনা ক'রে বলেন—রাজধানী পৌঁছেই তুমি মারা যাবে। বাদশাহ ফকীরকে ধরলেন—এর প্রতিকার ক'রে দিতে হবে। ফকীর হেসে বললেন—প্রতিকার ? মৃত্যুর গতিরোধ করা কি আমার ক্ষমতা ?... বাদশাহও ছাড়েন না। তখন ফকীর বললেন—তুমি এক কাজ করো, তুমি এখান থেকে এক রাজপথ তৈরী করতে করতে যাও তোমার রাজধানী পর্যন্ত। তার পাশে পাশে ক্রোশ-অন্তর দীঘি আর ডাক-অন্তর মসজিদ তৈরী করো।

সুরেশবাবু নীরব হইলেন। রজতবাবু ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন—তারপর মশাই, তারপর ?

হাসিয়া সুরেশবাবু বলিলেন—তারপর বুঝুন না কি হ'ল। আজকাল গল্প সাজেস্‌টিব্ হওয়াই ভাল। বাদশাহ রাজধানী পৌঁছেই মারা গেলেন। কিন্তু কত দিন তিনি বাঁচলেন অনুমান করুন। এই পথ, এই সব দীঘি, এতগুলি মসজিদ তৈরী করতে করতে যতদিন লাগে ততদিন তিনি বেঁচে ছিলেন।

রজতবাবু বলিলেন—হাম্‌বাগ্—বাদশাহটি একটি ইডিয়েট ছিলেন বলতে হবে। তিনি ত পথটা শেষ না করলেই পারতেন—আজও পর্যন্ত তিনি বেঁচে থাকতে পারতেন।

রমেন্দ্রবাবু গাড়ি হইতে নামিবার উদ্যোগ করিয়া কহিলেন—দাঁড়ান মশাই—এ-পথের ধুলো আমি খানিকটে নিয়ে যাব, আর মসজিদের একখানা ইট।

সুরেশবাবু কহিলেন—আর একটা কথা শুনে তারপর। পথ ত ফুরিয়ে যায়নি আপনার।

রজতবাবু তাগাদা দিলেন—সেটা আবার কি?

—এদেশে একটা প্রবচন আছে—সেটার সঙ্গে আপনার পরিচয় থাকা সম্ভব। পুলিস রিপোর্টে সেটা আছে—

রমেন্দ্রবাবু অসহিষ্ণু হইয়া বলিলেন—চুলোয় যাক মশাই পুলিস রিপোর্ট। কথাটা বলুন ত আপনি।

—তাড়া দেবেন না মশাই। গল্পের রস নষ্ট হবে। কথাটা হচ্ছে, 'আখ্ড়াইয়ের দীঘির মাটি, বাহাদুরপুরের লাঠি, কুলীর ঘাঁটি।' এই তিনের যোগাযোগে এখানে শত শত নরহত্যা হয়ে গেছে। রাত্রে এ-পথে পথিক চলত না ভয়ে। বাহাদুরপুরে বিখ্যাত লাঠিয়ালের বাস। কুলীর ঘাঁটিতে তারা রাত্রে এই পথের উপর নরহত্যা করত। আর সেই সব মৃতদেহ গোপনে সমাহিত করত আখ্ড়াইয়ের দীঘির গর্ভে।

রজতবাবু বলিয়া উঠিলেন—ও, তাই নাকি? এই সেই জায়গা!

সুরেশবাবু উত্তর দিলেন—তার কাছাকাছি এসেছি আমরা।

রজতবাবু কহিলেন—এখনও পুজোর আগে এখানে চৌকীদার রাখবার ব্যবস্থা আছে।

—আর তার দরকার নেই বোধ হয়। এখন এরা শাসন মেনে নিয়েছে।

রমেন্দ্রবাবুর গাড়িখানা এই সময় একটা গর্তে পড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়া পড়িয়া গেল। রমেন্দ্রবাবু লাফ দিয়া কোনরূপে আত্মরক্ষা করিলেন। সকলেই গাড়ি হইতে নামিয়া আগাইয়া আসিলেন। গাড়িখানা তুলিয়া রমেন্দ্রবাবু বলিলেন—যন্ত্র বিকল। এখন ইনিই আমার ঘাড়ে চেপে যাবার মতলব করেছেন। একখানা চাকা ধাক্কায় বেঁকে টাল খেয়ে গেছে। আমাদের হাতের মেরামতের বাইরে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিতেছিল, রজতবাবু অস্পষ্ট সম্মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—এ যে মহাবিপদ হ'ল সুরেশবাবু?

—কি করা যায়?

হাসিয়া সুরেশবাবু বলিলেন—পথপার্শ্বে বিশ্রাম। মালপত্র নিয়ে পেছনের গো-যান না এলে উপায় বিশেষ দেখছি নে।

আপনাকে বিপদের হেতু ভাবিয়া রমেন্দ্রবাবু একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি তখনও গাড়িখানা লইয়া মেরামতের চেষ্টা করিতেছিলেন। রজতবাবু কহিলেন—ঘাড়ে তুলুন মশাই বাহনকে। তবু একটা বিশ্রামের উপযুক্ত স্থান দেখে নেওয়া যাক।

বাইসিক্লে ঝুলান ব্যাগ হইতে টর্চটা বাহির করিয়া সুরেশবাবু সেটার চাবি টিপিলেন। তীব্র আলোক-রেখায় সম্মুখের প্রান্তর আলোকিত হইয়া উঠিল। অদূরে একটা মাটির উঁচু স্তূপ দেখিয়া সুরেশবাবু কহিলেন—এই যে সম্মুখেই বোধহয় আখ্ড়াইয়ের দীঘি। চলুন ওরই বাঁধাঘাটে বসা যাবে।

রজতবাবু বলিলেন—হ্যাঁ, অতীত যুগের কত শত হতভাগ্য পথিকের প্রেতাত্মার সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথাবার্তা অতি উত্তমই হবে।

এতক্ষণে হাসিয়া রমেন্দ্রবাবু কথা কহিলেন—আর বাহাদুরপুরের দু-একখানা লাঠির সঙ্গে যদি সাক্ষাৎ হয় সে উত্তমের পরে অযোগ্য মধ্যম হবে না, কি বলেন?

কোমরে বাঁধা পিস্তলটায় হাত দিয়ে রজতবাবু কহিলেন—তাতে রাজী আছি।

প্রকাণ্ড দীঘিটা অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়া আছে। শুধু আকাশের তারার প্রতিবিম্বে জলতলটুকু অনুভব করা যাইতেছিল। চারি পাড় বেড়িয়া বন্য লতাজালে আচ্ছন্ন বড় বড় গাছগুলিকে বিকট দৈত্যের মত মনে হইতেছিল। চারিদিক অন্ধকারে থম-থম করিতেছে। দীঘিটার দীর্ঘ দিকের মধ্যস্থলে সে-আমলের প্রকাণ্ড বাঁধাঘাট। প্রথমেই সুপ্রশস্ত চত্বর। তাহারই কোল হইতে সিঁড়ি নামিয়া গিয়াছে জলগর্ভে। সিঁড়ির দুই পার্শ্বে দুইটি রাণা। একদিকের রাণা ভাঙিয়া পাশেরই একটা সুগভীর খাদের মধ্যে নামিয়া গিয়াছে।

ঘাটের চত্বরটির মধ্যস্থলে তিনজনে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এক পাশে বাইসিক্ল তিনখানা পড়িয়া আছে। ছোট একখানা শতরঞ্চি রামেন্দ্রবাবুর গাড়ির পিছনে গুটান ছিল, সেইখানা পাতিয়া রামেন্দ্রবাবু বসিয়াছিলেন। পাশেই সুরেশবাবু আকাশের দিকে চাহিয়া শুইয়া আছেন। রজতবাবু শুধু চত্বরটায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন।

সুরেশবাবু বলিলেন—সাবধানে পায়চারী করবেন রজতবাবু। অন্যমনস্কে খাদের ভেতরে গিয়ে পড়বেন না যেন। দেখছেন ত খাদটা?

হাতের টর্চটা টিপিয়া রজতবাবু বলিলেন—দেখেছি।

আলোক-ধারাটা সেই গভীর গর্তে তিনি নিক্ষেপ করিলেন। সুগভীর খাদটার গর্ভদেশটা আলোকপাতে যেন হিংস্র হাসি হাসিয়া উঠিল। রজতবাবু কহিলেন—উঃ, এর মধ্যে পড়লে আর নিস্তার নেই। ভাঙা রাণাটার ইটের ওপর পড়লে হাড় চুর হয়ে যাবে।

তিনি এদিকে সরিয়া আসিয়া নিরাপদ দূরত্ব বজায় করিলেন। আলোক নিবিবার পর অন্ধকারটা যেন নিবিড়তর হইয়া উঠিল। ওদিকে পশ্চিম দিক্‌প্রান্তে মধ্যে মধ্যে বিদ্যুদ্দীপ্তি চকিত হইয়া উঠিতেছিল। সুরেশবাবু নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন—কে কি ভাবছেন বলুন ত?

রমেন্দ্রবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—ওদিকে কি যেন একটা ঘুরে বেড়াচ্ছে ব'লে বোধ হচ্ছে। কি বলুন ত?

সঙ্গে সঙ্গে দুইটা টর্চের শিখা দীঘির বুক উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। রজতবাবু কহিলেন—কই?

রমেন্দ্রবাবু কহিলেন—ওপারে ঠিক জলের ধারে। লম্বা মত—মানুষের মত কি ঘুরে বেড়াচ্ছিল বোধ হ'ল।

সুরেশবাবু হাসিয়া বলিলেন—দীঘির গর্ভের কোন অশান্ত প্রেতাত্মা হয়ত। কিম্বা বাহাদুরপুরের লাঠিয়াল কেউ।

রজতবাবু কহিলেন—সে হলে ত মন্দ হয় না, একটা য়্যাডভেঞ্চার হয়, সময় কাটে। কিন্তু তার চেয়েও ভয়ংকর কিছু হলেই যে বিপদ। যাদের সঙ্গে কথা চলে না মশাই—সাপ বা জানোয়ার। ওটা কি!

সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাঁ হাতের টর্চটা জ্বলিয়া উঠিল। ডান হাত তখন পিস্তলের গোড়ায়, সচকিত আলোয় দেখা গেল সেটা একগাছা ছিন্ন দড়ি।

সুরেশবাবু বলিলেন—গুড্ লাক্!—রজ্জুতে সর্পভ্রমে লজ্জা আছে, বিপদ নেই, কিন্তু সর্পে রজ্জুভ্রম প্রাণান্তকর।

সকলেই হাসিলেন। কিন্তু সে হাসি মৃদুমন্থর। আনন্দ যেন জমাট বাঁধিতেছিল না।

আবার সকলেই নীরব।

অকস্মাৎ দীঘির ওদিকের কোণে জল আলোড়িত হইয়া উঠিল। শব্দে মনে হয় কেহ যেন জল ভাঙিয়া চলিয়াছে। টর্চের আলো অতদূর পর্যন্ত যায় না; আলোক-ধারার প্রান্তমুখে অন্ধকার সুনিবিড় হইয়া উঠে, কিছু দেখা গেল না।

রমেন্দ্রবাবু কহিলেন—এখনও বলবেন আমার ভ্রম!

সুরেশবাবু কথার উত্তর দিলেন না। তিনি নিবিষ্টচিত্তে শব্দটা লক্ষ্য করিতেছিলেন। শব্দটা নীরব হইয়া গেল।

সুরেশবাবু আরও কিছুক্ষণ পর বলিলেন—ভ্রমই বোধ হয়! জলচর কোন জীবজন্তু হবে।

গরম বাতাসের প্রবাহটা ধীরে ধীরে বন্ধ হইয়া চারিদিক একটা অশান্তিকর নিস্তব্ধতায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

সুরেশবাবু আবার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—নাঃ, শুধু রমেন্দ্রবাবুকে দোষ দেব কেন—আমরা সকলেই ভয় পেয়েছি। সিগারেট খাওয়া পর্যন্ত ভুলে গেছি মশাই। নিন্ একটা ক'রে সিগারেট খাওয়া যাক।

রজতবাবু বলিলেন—না মশাই, একেই আমি ওতে অভ্যস্ত নই, তার উপর খালি পেটে শুক্নো গলায় সহ্য হবে না, থাক।

—আসুন তবে রমেনবাবু—আমরা দু-জনেই··· ও কি?

মানুষের মৃদু কণ্ঠস্বরে তিনজনেই চকিত হইয়া উঠিলেন।

কে যেন আত্মগত ভাবেই মৃদুস্বরে বলিতেছিল—তারা, তারাচরণ। এইখানেই ত ছিল। কোথা গেল?

রজতবাবুর হাতের টর্চটা প্রদীপ্ত রশ্মিরেখায় জ্বলিয়া উঠিল।

রমেনবাবু ত্রস্ত স্বরে বলিলেন—এদিকে, এদিকে, ভাঙার রাণাটার পাশে জলের ধারে, ওই, ওই। কিন্তু দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলছে কি? চোখ কি?—ওই—ওই—

দীর্ঘ রশ্মিধারা ঘুরিল। সঙ্গে সঙ্গে সুরেশবাবুর টর্চটাও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। জলের ধারে দীর্ঘাকৃতি মনুষ্যমূর্তি দাঁড়াইয়া ছিল। আলোকচ্ছটার আঘাতে চকিত হইয়া সে রশ্মির উৎস লক্ষ্য করিয়া মুখ ফিরাইল। রমেন্দ্রবাবু অস্ফুট চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেলেন। সুরেশবাবুর হাতের টর্চটা নিবিয়া গিয়াছিল। অদ্ভুত, অতি ভীতিপ্রদ সে মূর্তি।

দীর্ঘ বিবর্ণ চুল, দীর্ঘ দাড়ি-গোঁফে সমস্ত মুখখানা আচ্ছন্ন, অস্বাভাবিক দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ দেহখানা কর্দমলিপ্ত। কোটরগত জ্বলন্ত চোখ দুইটিতে আলো পড়িয়া ঝকঝক করিতেছিল। সে মূর্তি ধরণীর সজীবতার সর্বমাধুর্যবর্জিত, মাটির জগতের বলিয়া বোধ হয় না।

রজতবাবু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তবুও তিনি কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন করিলেন—কে? কে তুমি! উত্তর দাও! কে তুমি? নিথর নিস্তব্ধ মূর্তির মুখের পেশীগুলি ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল, একটা অদ্ভুত ভঙ্গীতে অধর-রেখা ভিন্ন হইয়া গেল। সে ভঙ্গিমা যেমন হিংস্র তেমনি ভয়ংকর।

রজতবাবু আকাশ লক্ষ্যে পিস্তলটার ঘোড়া টিপিলেন। সুগভীর গর্জনে নিবিড় অন্ধকার চমকিয়া উঠিল। বৃক্ষনীড়াশ্রয়ী পাখির দল কলরব করিয়া উঠিল।

সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত আর একটা গর্জনে চারিদিক কাঁপিয়া উঠিল। একটা বিকটা হিংস্র গর্জন করিয়া সে বিকট মূর্তি লাফ দিয়া ছুটিয়া আসিল। সে মূর্তি তখন জানোয়ারের চেয়ে হিংস্র—উন্মত্ত। রজতবাবুর বাঁ-হাতের টর্চটা হাত হইতে পড়িয়া গেল। ডান হাতে পিস্তলটা কাঁপিতেছিল। অন্ধকারের মধ্যে গুরুভার কিছু পতনের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আহত পশুর মত একটা আর্তনাদ ধ্বনিয়া উঠিল।

রজতবাবু কহিলেন—সুরেশবাবু, শীগ্‌গির টর্চটা জ্বালুন। আমারটা কোথায় পড়ে গেছে।

সুরেশবাবুর হাতের আলোটা জ্বলিয়া উঠিল।

রজতবাবু কহিলেন—এখানে আসুন—খাদের মধ্যে।

খাদের মধ্যে আলোকপাত করিতেই রজতবাবু বলিলেন—মানুষই, কিন্তু মরে গেছে বোধ হয়। ঘাড় নীচু ক'রে পড়েছে! ঘাড় ভেঙে গেছে!

সুরেশবাবু ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন—ভগ্ন ইষ্টক-স্তূপের মধ্যে হতভাগ্যের মাথাটা অর্ধ-প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। যন্ত্রণার আক্ষেপে ঊর্ধ্বমুখে সমগ্র দেহখানা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। উপর হইতে রমেন্দ্রবাবু সভয়ে কাহাকে প্রশ্ন করিলেন—কে? ওকি? কিসের শব্দ?

ক্ষণিক মনোযোগ সহকারে শুনিয়া সুরেশবাবু কহিলেন—গাড়ি। গরুর গাড়ির শব্দ।

গন্তব্য থানায় পৌঁছিতে বাজিয়া গেল বারোটা।

তিনটি বন্ধুতেই নীরব। একটা বিষণ্ণ আচ্ছন্নতার মধ্যে যেন চলাফেরা করিতেছিলেন। শবদেহটা গাড়িতে বোঝাই হইয়া আসিয়াছে।

সেটা নামান হইলে রজতবাবু সাব্-ইন্সপেক্টরকে বলিলেন—লোকটাকে এখানকার কেউ চিনতে পারে কিনা দেখুন ত।

মুখাবরণ মুক্ত করিয়া দারোগা চমকিয়া উঠিলেন।

রজতবাবু প্রশ্ন করিলেন—চেনেন আপনি?

—না। কিন্তু একি মানুষ?

জমাদার পাশে দাঁড়াইয়াছিল, সে কহিল—আমি চিনি স্যর। এ একজন দীপান্তরের আসামী। আজ দিন দশেক খালাস হয়ে বাড়ী এসেছে। সেদিন এসেছিল থানায় হাজিরা দিতে। বাহাদুরপুরের লোক, নাম কালী বাগ্দী।

—বেশ! তাহ'লে রিপোর্ট লেখ। একটা গামছায় বাঁধা কোমরে ওর কি কতকগুলো ছিল—দেখ ত সেগুলো কি?

অনুসন্ধানে বাহির হইল একখানা কাপড়, ছোট ঘটি একটা, কয়খানি কাগজ। কাগজগুলি একটা মোকদ্দমার নথি ও রায়। নথিগুলিতে বহরমপুর জেলের ছাপ মারা—জেল-গেটে জমা ছিল। সঙ্গে একখানি চিঠি, হাইকোর্টের কোন উকীলের লেখা—এরূপভাবে দণ্ডাদেশের গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য আপীল করা অস্বাভাবিক ও আমাদের ব্যবসায়ের পক্ষে ক্ষতিজনক। সেইজন্য ফেরত পাঠান হইল।

রজতবাবু নথিটা পড়িয়া গেলেন—সেসন্স কোর্টের নথি। ১৯০৮ সালের ৫নং খুনী মামলার ইতিহাস। সম্রাট বাদী—আসামী কালীচরণ বাগ্দী—

অভিযোগ: আসামী তাহার পুত্র তারাচরণ বাগ্দীকে হত্যা করিয়াছে। সাক্ষী তিনজন। প্রথম সাক্ষী মোবারক মোল্লা। এই ব্যক্তি বাহাদুরপুরের নানকাদার, অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। এই ব্যক্তিকে সরকার পক্ষের উকীল প্রশ্ন করেন—কালীচরণ বাগ্দীকে আপনি চেনেন?

উত্তর—হ্যাঁ। এই আসামী সেই লোক।

—কি প্রকৃতির লোক কালীচরণ?

—দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল।

—আপনার সঙ্গে কি কালীচরণের কোন ঝগড়া আছে?

—না। সে আমার ওস্তাদ। আমি তার কাছে লাঠিখেলা শিখেছি।

—তারাচরণ বাগ্‌দীকে আপনি জানতেন ?

—হ্যাঁ। ওস্তাদ কালীচরণেরই ছেলে সে।

—আচ্ছা, এটা কি ঠিক যে, কালীচরণ তারাচরণকে ভাল দেখতে পারত না ?

—না। তবে ছেলেবেলায় তারাচরণ খুব রুগ্ন দুর্বল ছিল ব'লে ওস্তাদের ছেলেতে মন উঠত না। বলত, বেটাছেলে যদি বেটাছেলের মত না হয়, তবে সে-ছেলে নিয়ে কি করব ?

—তারপর, বরাবরই ত সেই রকম ভাব ছিল ?

—না। তারাচরণ বারো-তের বছর বয়স থেকে সেরে উঠে জোয়ান হতে আরম্ভ হলে ওস্তাদের চোখের মণি হয়ে উঠেছিল সে।

—কালীচরণ কি তারাচরণকে আখ্‌ড়ায় মারত না ?

—হ্যাঁ, ভুল করলে ওস্তাদের হাতে কারও রেহাই ছিল না, নিজের ছেলে ব'লে দাবির ওপর—

—থাক ওকথা। আচ্ছা, আপনি কি জানেন, কুলীর ঘাঁটিতে রাত্রে পথিক খুন হয় ?

—জানি। শুনেছি বহুকাল থেকে—বোধহয় একশো বছর ধ'রে এ কাণ্ড ঘটে আসছে।

—কারা এ-সব করে জানেন ?

—না।

—শোনেন নি ?

—বহুজনের নাম শুনেছি।

—আপনাদের গ্রামের বাগ্‌দীদের নাম—এই কালীচরণ, তার পূর্ব-পুরুষ—এদের নাম শুনেছেন কি ?

—শুনেছি।

সরকার পক্ষের উকীল সাক্ষীকে জেরা করিতে ইচ্ছা করেন না।

দ্বিতীয় সাক্ষী এলোকেশী বাগ্‌দিনী। মৃত তারাচরণ বাগ্‌দীর স্ত্রী। বয়স আঠারো বৎসর।

প্রশ্ন—এই আসামী কালীচরণ তোমার শ্বশুর ?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা বাপু, তোমার স্বামীর সঙ্গে কি তোমার শ্বশুরের ঝগড়া ছিল ?

—না।

—কখনও ঝগড়া হ'ত না ?

—ঝগড়া হ'ত বই কি! কতদিন টাকা-পয়সা নিয়ে ঝগড়া হ'ত। কিন্তু তাকে ঝগড়া থাকা বলে না।

—কিসের টাকা-পয়সা নিয়ে ঝগড়া ?

—খুনের, ডাকাতির। আমার শ্বশুর, আমার স্বামী মানুষ মারত। ডাকাতিও করত।

—কেমন ক'রে জানলে তুমি ?

—বাড়িতে শাশুড়ীর কাছে শুনেছি, আমার স্বামীর কাছে শুনেছি, এদের বাপ-বেটার কথাবার্তায় বুঝেছি। আর কতদিন রক্তমাখা টাকা গয়না জলে ধুয়ে পরিষ্কার করেছি!

—তোমার স্বামী তারাচরণকে কে খুন করেছে জান ?

—জানি। আমার শ্বশুর খুন করেছে। আমি নিজে চোখে দেখেছি।

বিচারক প্রশ্ন করেন—তুমি নিজের চোখে খুন করা দেখেছ ?

—হ্যাঁ, হুজুর, সমস্ত দেখেছি।

বিচারক আদেশ করেন—কি দেখেছ তুমি, আগাগোড়া বলো দেখি।

সরকার পক্ষের উকীলকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা বন্ধ করতে আদেশ দেওয়া হইল।

সাক্ষীর উক্তি :—

হুজুর, শ্রাবণ মাসের প্রথমেই আমি বাপের বাড়ি গিয়েছিলাম। শ্রাবণের সাতাশে আমার ছোট বোনের বিয়ে ছিল। আমার স্বামী পঁচিশ তারিখে সেই বিয়ের নিমন্ত্রণে এখানে আমার বাপের বাড়িতে আসে। আরও অনেক কুটুম্বসজ্জন এসেছিল। জাত বাগ্দী আমরা হুজুর, সকলেই আমাদের লাঠিয়াল। আর ছোটজাতের আমোদ-আহ্লাদে মদই হ'ল হুজুর প্রধান জিনিস। আর বড় বড় জোয়ান সব দিবারাত্র মদ খেয়েছে আর ঘাটি-খেলা খেলেছে।

বিচারক প্রশ্ন করেন—ঘাটি খেলা কি ?

—হুজুত, ডাকাতি করতে গিয়ে যেমনভাবে লাঠি খেলে, গেরস্তর ঘর চড়াও ক'রে বাইরের লোককে আটকে রাখে, সেই খেলার নাম ঘাটি-খেলা। সেই খেলা খেলতে আমার স্বামীর সঙ্গে আমার দাদার ঝগড়া হয়। তিন তিন বার আমার স্বামী দাদার ঘাটি ভেঙে দিয়ে বলেছিল—এ ছেলে-খেলা ভাল লাগেনা বাপু, যদি মরদ তোদের কেউ থাকে, তবে নিয়ে আয়। সেই নিয়ে ঝগড়া। মনের রাগে দাদা রাত্রে খাবার সময় আমার স্বামীর কুলের খোঁটা তুলে অপমান করে। আমার ননদ নীচ জাতের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিল—সেই নিয়ে কুলের খোঁটা। স্বামী আমার তখনই উঠে প'ড়ে সেখান থেকে চ'লে আসে। আমার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করেনি হুজুর—তাহ'লে তাকে আমি সেই অন্ধকার বাদল রাতে বেরুতে দিতাম না। আমি যখন খবর পেলাম তখন সে বেরিয়ে চ'লে গেছে। আমিও আর থাকতে পারলাম না—থাকতে ইচ্ছাও হ'ল না। যে মরদ স্বামীর জন্যে আমার সমবয়সীরা আমাকে হিংসে করত তার অপমান আমার সহ্য হ'ল না। আর আমাকে সে যেমন ভালবাসত—

সাক্ষী এই স্থলে কাঁদিয়া ফেলে। কিছুক্ষণ পর আত্মসম্বরণ করিয়া আবার বলিল—অন্ধকার বাদল রাত্রি সেদিন—কোলের মানুষ নজর হয় না এমনি অন্ধকার। পিছল পথে বার-বার পা পিছলে প'ড়ে যাচ্ছিলাম। গ্রামের বাইরে এসে আমি চীৎকার ক'রে ডাকলাম—ওগো ওগো! ঝিপ্ ঝিপ্ ক'রে বৃষ্টির শব্দ আর বাতাসের গোঙানীতে সে শব্দ সে বোধ হয় শুনতে পায় নাই। শুন্‌লে সে দাঁড়াত—নিশ্চয় দাঁড়াত হুজুর। তবে আমি তার গলা শুনতে পাচ্ছিলাম। বাতাসটা সামনে থেকে বইছিল। সে গান করতে করতে যাচ্ছিল, বাতাসে সে-গান পিছু দিকে বেশ ভেসে আসছিল।

সাক্ষী আবার নীরব হইল।

কিছুক্ষণ পরে সাক্ষী আবার আরম্ভ করিল—

আমি প্রাণপণে যাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পিছল পথে তাড়াতাড়ি চলবার উপায় ছিল না। সামনে থেকে জলের ফোঁটা কাঁটার মত মুখ-চোখে বিঁধছিল। হঠাৎ একটা চীৎকারের শব্দ কানে এসে পৌঁছুল—বাবা, বাবা! শেষটা আর শুনতে পেলাম না। চিনতে পারলাম আমার স্বামীর গলা, ছুটে এগিয়ে যেতে গিয়ে পথে প'ড়ে গেলাম। উঠে একটু দূর এগিয়ে যেতেই দেখি একজোড়া আঙরার

মত চোখ ধক্ ধক্ ক'রে জ্বলছে। এই চোখ দেখে চিনলাম সে আমার শ্বশুর। আমার শ্বশুরের চোখের তারা বেড়ালের চোখের মত খয়রা রঙের, সে চোখ আঁধারে জ্বলে। অন্ধকারের মধ্যে চ'লে চ'লে চোখে তখন অন্ধকার সয়ে গিয়েছিল, আমি তখন দেখতেও পাচ্ছিলাম। দেখলাম আমার শ্বশুর একটা মানুষকে কাঁধে ফেলে আখ্ড়াইয়ের দীঘির পাড় দিয়ে নেমে গেল। বুক ফেটে কান্না এল—কিন্তু কাঁদতে পারলাম না। গলা যেন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, চোখে যেন আগুন জ্বলছিল। আমিও তার পিছন নিলাম।

সাক্ষীকে বাধা দিয়া বিচারক প্রশ্ন করিলেন—তোমার ভয় হ'ল না?

সাক্ষী উত্তর দিল—হুজুর, আমরা বাগ্দীর মেয়ে। আমাদের মরদে খুন করে, আমরা লাশ গায়েব করি। হুজুর, আমার হাতে যদি তখন কিছু থাকত তবে ঐ খুনেকে ছাড়তাম না।

সাক্ষী অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া কাঠগড়া হইতে বাহির হইয়া পড়িয়া আসামীকে আক্রমণের চেষ্টা করে। তাহাকে ধরিয়া ফেলা হয় ও তাহার উত্তেজিত অবস্থা দেখিয়া সেদিনকার মত বিচার স্থগিত রাখিতে আদেশ দেওয়া হয়। সাক্ষী কিন্তু বলে যে, সে বলিতে সমর্থ এবং আর সে এরূপ আচরণ করিবে না।

সে কহিল—তারপর দীঘির গর্ভে দেহটাও পুঁতে দিলে সে আমি দেখলাম। তখন পশ্চিম আকাশে কাস্তের মত এক ফালি চাঁদ মেঘের আড়ালে উঠেছিল। অন্ধকার অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে। সেই আলোতে পরিষ্কার চিনতে পারলাম খুনী আমার শ্বশুর। সে বাড়ির দিকে হন হন ক'রে চ'লে গেল। আমি পিছু ছাড়ি নাই।

বাড়িতে এসে লাফ দিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে সে বাড়ি ঢুকল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। অল্পক্ষণ পরেই কে বুক ফাটিয়ে কেঁদে উঠল, চিনলাম সে আমার শাশুড়ীর গলা, কিন্তু একবার কেঁদেই চুপ হয়ে গেল—

এই সময় আসামী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—আমি তার মুখ চেপে ধরেছিলাম। হুজুর, আর সাক্ষী-সাবুদে দরকার নাই। আমি কবুল খাচ্ছি। আমিই আমার ছেলেকে খুন করেছি। হুকুম পেলে আমি সব ব'লে যাই।

বিচারক এরূপ ক্ষেত্রে বিবেচনা করিয়া আসামীকে স্বীকারোক্তি করিবার আদেশ দিলেন।

আসামী বলিয়া গেল—হুজুর, আমরা জাতে বাগ্দী, আমরা এককালে নবাবের পল্টনে কাজ করতাম। আজও আমাদের কুলের গরব লাঠির ঘায়ে, বুকের ছাতিতে। কোম্পানীর আমলে আমাদের পল্টনের কাজ যখন গেল তখন থেকে এই আমাদের ব্যবসা। হুজুর চাষ আমাদের ঘেন্নার কাজ; মাটির সঙ্গে কারবার করলে মানুষ মাটির মতই হয়ে যায়। মাটি হ'ল মেয়ের জাত। জমিদার বড়লোকের বাড়িতে এককালে আমাদের আশ্রয় হ'ত। কিন্তু কোম্পানীর রাজত্বে থানা পুলিসের জবরদস্তিতে তারাও সব একে একে গেল। যারা টিঁকে থাকল তারা শিং ভেঙ্গে ভেড়া ভালমানুষ হয়ে বেঁচে রইল। তাদের ঘরে চাকরি করতে গেলে এখন নীচ কাজ করতে হয়, গাড়ু বইতে হয়, মোট মাথায় করতে হয়, জুতো খুলিয়ে দিতেও হয় হুজুর। তাই আমরা এই পথ ধরি। আজ চার পুরুষ ধ'রে আমরা এই ব্যবসা চালিয়ে এসেছি। জমিদারের লগ্দীগিরি লোক-দেখান পেশা ছিল আমাদের। রাত্রির পর রাত্রি চামড়ার মত পুরু অন্ধকারে গা ঢেকে কুলীর ঘাঁটিতে ওত-পেতে ব'সে থেকেছি। মদের নেশায় মাথার ভেতরে আগুন ছুটত। সে নেশা ঝিমিয়ে আসতে পেত না। পাশেই থাকত মদের ভাঁড়। সেই ভাঁড়ে চুমুক দিতাম। অন্ধকারের মধ্যে পথিক দেখতে পেলে বাঘের মত লাফ দিয়ে উঠতাম। হাতে থাকত 'ফাব্ড়া'—শক্ত বাঁশের দু-হাত লম্বা লাঠি, সেই লাঠি ছুঁড়তাম মাটির কোল ঘেঁষে। সাপের মত গোঙাতে গোঙাতে সে লাঠি ছুটে গিয়ে পথিকের পায়ে লাগলে আর তার নিস্তার ছিল না। তাতে পড়তেই হ'তে। তারপর একখানা বড় লাঠি তার ঘাড়ের ওপর দিয়ে চেপে দাঁড়াতাম, আর পা দু'টো ধ'রে দেহটা উল্টে দিলেই ঘাড়টা ভেঙ্গে যেত।

এই সময় একজন জুরী অজ্ঞান হইয়া পড়ায় আদালত সেদিনকার মত বিচার বন্ধ রাখিতে আদেশ দিলেন।

পরদিন বিচারক ও জুরীগণ আসন গ্রহণ করিলে আসামী বলিতে আরম্ভ করিল—

—কত মানুষ যে খুন করেছি তার হিসেব আমার নেই। সে-সময় কোন কথা কানে আসে না হুজুর। তাদের কাতরানি যদি সব কানে আসত, মনে থাকত হুজুর, তাহ'লে সত্যি পাথর হয়ে যেতাম। মনে পড়ে শুধু দু'টি মানুষের কথা। যেদিন আমার বাপের কাছে আমি হাতে-খড়ি নিই, আর আমি আমার ছেলে

তারাচরণকে যেদিন হাতে-খড়ি দিই, এই দু'দিনের কথা মনে আছে। সরল বাঁশের কোঁড়ার মত দীঘল কাঁচা জোয়ান তখন তারাচরণ। অন্ধকার রাত্রে শিকারের গলায় দাঁড়িয়ে বললাম—দে পা দু'টো ধ'রে ধড়টা ঘুরিয়ে দে। সে থর থর ক'রে কেঁপে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আমিই শিকার শেষ করলাম, কিন্তু মনটা কেমন সেদিন হিম হয়ে গেল। মনে প'ড়ে গেল প্রথম দিন আমিও এমনি ক'রে কেঁপেছিলাম। তারপর হুজুর, অভ্যেসে সব হয়—ক্রমে ক্রমে তারা আমার হয়ে উঠল গুলিবাঘ। পালকের মত পাতলা পা—পাথরের মত শক্ত ছাতি—শিকার পথের উপর পড়লে আমি যেতে-না-যেতে সে গিয়ে কাজ শেষ ক'রে রাখত। ঘটনার দিন হুজুর—

আসামী নীরব হইল। সে পানীয় জল প্রার্থনা করিল। জল পান করিয়া সে কহিল—সে দিনের সে ভুল তারাচরণের, আমার ভুল নয়। তবে সে আমার ভাগ্যের দোষ। আর নয়ত যাদের খুন করেছি তাদের অভিসম্পাতের ফল। তবে এ যে হবে এ আমি জানতাম—আমার বাবা বলেছিল—আমাদের বংশ থাকবে না—নির্ব্বংশ হতেই হবে।

আবার আসামী নীরব হইল। আসামী কাতর হইয়া পড়িয়াছে বিবেচনা করিয়া আদালত কিছুক্ষণ সময় দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু আসামী তাহা চাহে না। সে কহিল—আর শেষ হয়েছে হুজুর। তবে আর একটু জল। পুনরায় জল পান করিয়া সে বলিয়া গেল—

সেদিন তারার আসবার কথা নয়। কুটুম্ববাড়িতে বিয়ের নেমন্তন্নে গিয়ে বিয়ের রাত্রেই সে চ'লে আসবে, এ ধারণা আমি করতে পারি নাই হুজুর। সেদিন অন্ধকার রাত্রি। ঝিপ্‌ ঝিপ্‌ ক'রে বাদলও নেমেছিল। আমার বৌমার কাছে শুনেছেন আমার চোখ অন্ধকারে বেড়ালের মত জ্বলে। আমার চোখেও আমি সেদিন ভাল দেখতে পাচ্ছিলাম না। সর্বাঙ্গ ভিজে হিম হয়ে যাচ্ছিল। আমি ঘন ঘন মদের ভাঁড়ে চুমুক দিচ্ছিলাম। দু-পহর রাত পর্যন্ত শিকার না পেয়ে বিরক্ত হয়ে উঠে আসছি—এমন সময় কার গানের খুব ঠাণ্ডা আওয়াজ শুনতে পেলাম। বাতাস বইছিল আমার দিক থেকে। আওয়াজটা বাতাস ঠেলে উজানে ঠিক আসছিল না। সেদিন হাতে পয়সা-কড়ি কিছু ছিল না। মানুষের সাড়া পেয়ে মদের ভাঁড়ে চুমুক মেরে অভ্যেস মত লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। অন্ধকারে

চলন্ত মানুষ নড়ছিল,—মারলাম ফাবড়া। লাশ পড়ল। চীৎকার ক'রে সে কি বললে কানে এল না। ছুটে গিয়ে গলায় লাঠি দিয়ে উঠে দাঁড়াব—শুনলাম—বাবা—বাবা—আমি—

কথাটা কানেই এল, কিন্তু মনে গেল না, তার গলা চিনতে পারলাম না। লাঠির ওপরে দাঁড়িয়ে বললাম—এ সময়ে বাবা সবাই বলে।

আসামী নীরব হইল। আবার সে বলিল—পেয়েছিলাম আনা ছয়েক পয়সা—আর তার কাপড়খানা।

আবার সে নীরব হইল। কিন্তু মিনিটখানেকের মধ্যেই সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল!

রায়ে বিচারক দণ্ডাদেশের পূর্বে লিখিয়াছেন—যুগ যুগান্তরের সাধনায় মানুষ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া ন্যায়-অন্যায়ের সীমারেখার নির্দেশ করিয়াছে। তাঁহারই নামে সৃষ্টি ও সমাজের কল্যাণে অন্যায় ও পাপের বোধ হেতু দণ্ডবিধির সৃষ্টি হইয়াছে। ঈশ্বরের প্রতিভূ-স্বরূপ বিচারক সেই বিধি অনুসারে অন্যায়ের শাস্তি-বিধান করিয়া থাকেন। এই ব্যক্তির যে অপরাধ, বর্তমান রাষ্ট্রতন্ত্রের দণ্ডবিধিতে তাহার যোগ্য শাস্তি নাই। এক্ষেত্রে একমাত্র চরম দণ্ডই বিধি। আমার স্থির বিশ্বাস, সেইজন্যই সমগ্র বিশ্বের অদৃশ্য পরিচালক তাহার দণ্ডবিধান স্বয়ং করিয়াছেন। চরমদণ্ড এক্ষেত্রে সে-গুরুদণ্ডকে লঘু করিয়া দিবে। ঈশ্বরের নামে বিচারকের আসনে বসিয়া তাঁহার অমোঘ বিধানকে লঙ্ঘন করিতে পারিলাম না। যাবজ্জীবন দীপান্তর বাস ইহার শাস্তি বিহিত হইল।

রায় শেষ হইয়া গেল।

তিনজনেই নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। মনের বিচিত্র চিন্তাধারার পরিচয় বোধ হয় প্রকাশ করিবার শক্তি কাহারও ছিল না।

অকস্মাৎ রমেন্দ্রবাবু কহিলেন—একটা কথা বলব সুরেশবাবু?

মৃদুস্বরে সুরেশবাবু বলিলেন—বলুন।

—পুলিস এক্‌জিকিউটিভ, আপনারা দু জনেই ত এখানে রয়েছেন, দেহটা আর মর্গে পাঠাবেন না। ও আখড়াইয়ের দীঘির গর্ভেই ওকে শুয়ে থাকতে দিন।

তাসের ঘর

অমর শখ করিয়া চায়ের বাসনের সেট কিনিয়াছিল। ছয়টা পিরিচ-পেয়ালা, চা-দানি ইত্যাদি রঙ-চঙ করা সুদৃশ্য জিনিস, দামও নিতান্ত অল্প নয়,—চার টাকা। চার টাকা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে অনেক।

অমরের মায়ের হুকুম ছিল, সেটটি যত্ন ক'রে তুলে রেখো বউমা, কুটুম্বসজ্জন এলে, ভদ্রলোকজন এলে বের কোরো।

কলিকাতা-প্রবাসী হরেন্দ্রবাবুরা দেশে আসিয়াছেন, আজ তাঁহাদের বাড়ির মেয়েরা অমরের বাড়িতে বেড়াইতে আসিবেন; তাহারই উদ্যোগ-আয়োজনে বাড়িতে বেশ সমারোহ পড়িয়া গিয়াছে।

মা বলিলেন, চায়ের সেটটা আজ বের কর্ তো গৌরী।

গৌরী বাড়ির মেয়ে—অমরের অবিবাহিতা ভগ্নী। মা চাবির গোছাটা গৌরীর হাতে দিলেন। গৌরী বাসনের ঘর খুলিয়া জার্মান-সিল্‌ভারের ট্রে-সমেত সেটটি বাহির করিয়া আনিয়া বলিল, পাঁচটা কাপ রয়েছে কেন মা, আর একটা কাপ কি হ'ল? এই দেখ বাপু, সবে এই আমি বের ক'রে আনছি, আমার দোষ দিও না যেন।

বিরক্ত হইয়া মা বলিলেন, দেখ্‌ না ভাল ক'রে খুঁজে, ঘরেই কোথাও আছে। পাখা হয়ে উড়ে তো যাবে না।

গৌরী সেটটা সেইখানে নামাইয়া আবার ভাল করিয়া ঘর খুঁজিয়া আসিয়া বলিল, পাখাই হ'ল, না কেউ খেয়েই ফেলল, সে আমি জানি না বাপু, তবে ঘরের মধ্যে কোথাও নেই।

দুমদাম করিয়া মা ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন, তোমার দোষ কি মা, আমার কপালের দোষ। তোমরা চোখ কপালের ওপর তুলে কাজ কর, নীচের জিনিস দেখতে পাও না।

গৌরীর চোখ হয়তো কপালের উপরেই উঠিয়া থাকে, কিন্তু এক্ষেত্রে গৌরীর অপরাধ প্রমাণিত হইল না।—পেয়ালাটা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

মা হাঁকিলেন, বউমা, বউমা!

বউমা—অমরের স্ত্রী শৈল—উপরে তখন ঘর-দুয়ার ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া অতিথিদের বসিবার স্থান করিতেছিল, সে নীচে আসিয়া শাশুড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, আমায় ডাক্‌ছেন?

শাশুড়ী বাসন-অন্ত-প্রাণ, সিন্দুকের চাবি পুত্রদের দিয়া বাসনের ঘরের চাবি লইয়াই বাঁচিয়া আছেন। পেয়ালাটার খোঁজ না পাইয়া ফুটন্ত তৈলে নিক্ষিপ্ত বার্তাকুর মত সশব্দে জ্বলিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, হ্যাঁ গো রাজার কন্যে, নইলে 'বউমা' ব'লে ডাকা কি ওই বাউড়ীদের, না ডোমেদের?

শৈল নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিল, উত্তর করা তার অভ্যাস নয়।

শাশুড়ী বলিলেন, একটা পেয়ালা পাওয়া যাচ্ছে না কেন, কি হ'ল?

একটু নীরব থাকিয়া বধূ ব'লিল, ওটা আমিই ভেঙ্গে ফেলেছি মা।

শাশুড়ী কিছুক্ষণ বধূর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, বেশ করেছ মা, কি আর বলব বলো!

সত্য কথা, এমন অকপটভাবে অপরাধ স্বীকার করিলে অপরাধীকে মার্জনা করা ছাড়া আর উপায় থাকে না। সশব্দে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া শাশুড়ী বলিলেন, ও পাঁচটাকেও ফেলে দেব আমি চুরমার ক'রে ভেঙ্গে।

রাগ গিয়া পড়িল চায়ের সেটটার উপর।

শৈল সবই নীরবে সহ্য করে, সে নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিল। শাশুড়ী বলিলেন, ভেঙ্গেছ বলা হ'ল, বেশ হ'ল, আবার চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও, ওপরের কাজ সেরে এসো, জলখাবারগুলো করতে হবে।

শৈল উপরে চলিয়া গেল, কিছুক্ষণ পরেই হাসিমুখে আসিয়া রান্নাঘরে শাশুড়ীর কাছে দাঁড়াইল।

শাশুড়ীর মনের উত্তাপ কমিয়া আসিয়াছিল, বলিলেন, নাও, তোমাদের দেশের মত খাবার তৈরি করো।

শৈল খাবারের সাজ-সরঞ্জাম টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিল, সমস্তর ভেতরেই মাছের পুর দোব ত মা?

—অ্যাঁ, মাছের পুর? হ্যাঁ, তা দেবে বইকি, বিধবা ত কেউ আসছে না।

ময়দার ঠোঙার ভিতরে মাছের পুর দিতে দিতে শৈল বলিল, জানেন মা, এর

সঙ্গে যদি একটুখানি হিঙ দেওয়া হ'ত—ভারী চমৎকার হ'ত। বাবার আমার হিঙ ভিন্ন কোন জিনিস ভাল লাগে না। আর যে-সে হিঙ আমাদের বাড়িতে ঢুকতে দেন না; আফ্‌গানিস্থান থেকে কাবুলী সব আসে. তারাই দিয়ে যায়।

শাশুড়ী বলিলেন, পশ্চিম ভাল জায়গা মা, আমাদের পাড়াগাঁয়ের সঙ্গে কি তুলনা হয়, না সে সব জিনিস পাওয়া যায়?

শৈল বলিল, পশ্চিমেও সে হিঙ পাওয়া যায় না মা। কাবুলীরা সে সব নিজেদের জন্যে আনে, শুধু বাবাকে খুব খাতির করে কিনা, টাকাকড়ি অনেক সময় নেয়—তাই সে জিনিস দেয়। শুধু কি হিঙ, যখন আসবে তখন প্রত্যেকে আঙ্গুর, বেদানা, নাসপাতি, বাদাম, হিঙ—এ-সব ছোট ছোট ঝুড়ির এক এক ঝুড়ি দিয়ে যায়। পাঁচজনের মিলে সে হয় কত! কাঁচা জিনিস অনেক প'চেই যায়।

ও ঘরের বারান্দা হইতে ননদ গৌরী মৃদুস্বরে বলিল, এই আরম্ভ হ'ল এইবার।

অর্থাৎ বাপের বাড়ির গল্প আরম্ভ হইল। সত্য কথা, শৈলর ওই এক দোষ; বিনীত, নম্র, মিষ্টমুখী, সুন্দরী বউটি প্রত্যেক কথায় তাহার বাপের বাড়ির তুলনা না দিয়া থাকিবে না।

পাশের বাড়িতে তুমুল কোলাহল উঠিতেছিল, শাশুড়ী এবং বধূতে কলহ বাধিয়াছে।

শৈলর শাশুড়ী বলিলেন, যা হবে, তাই হোক মা। আমার বউ ভাল হয়েছে, উত্তর করতে জানে না; দোষ করলে বকব কি, মুখের দিকে চাইলে মায়া হয়।

শৈল বলিল, ওঁর ছেলে স্ত্রীকে শাসন করেন না কেন? জানেন মা, আমার দাদা হ'লে আর রক্ষে থাকত না। সঙ্গে সঙ্গে বউকে হয়ত বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। একবার বউদি কি উত্তর করেছিলেন মায়ের সঙ্গে, দাদা তিনমাস বউদির সঙ্গে কথা কননি। শেষে মা আবার ব'লে ক'য়ে কথা বলান। তবে দাদার আমার বড্ড বাতিক—খদ্দর পরবে হাঁটু পর্যন্ত, জামা সেই হাতকাটা—এতটুকু। তামাক না, বিড়ি না, সিগারেট না,—সে এক বাতিকের মানুষ।

শাশুড়ী বোধ হয় মনে মনে একটু বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, নাও নাও, তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে নাও; দেখো, যেন মাছের কাঁটা না থাকে।

শৈল বলিল, ছোট মাছ—কাঁটা বাছতেই হাত চলছে না মা; তবে এই হয়ে গেল।

কড়ায় এক ঝাঁক সিঙাড়া ছাড়িয়া দিয়া, সে আবার বলিল, মা আমার কক্ষনো ছোট মাছ বাড়িতে ঢুকতে দেন না। দু-সেরের কম মাছ হলেই সঙ্গে সঙ্গে ফেরত দেবেন। কুচো মাছের মধ্যে ময়া, আর কাঠমাছের মধ্যে মাগুর।

শাশুড়ী বাধা দিয়া বলিলেন, নাও নাও, সেরে নিয়ে চুল-টুল বেঁধে ফেলো গে।

কেশ-প্রসাধন অন্তে শৈল কাপড় ছাড়িতেছিল।

ননদ গৌরী প্রশংসমান দৃষ্টিতে ভ্রাতৃজায়ার দিকে চাহিয়া বলিল, উঃ, রঙ বটে তোমার বউদি! তুমি যা পরবে, তাতেই তোমাকে সুন্দর লাগবে, আর আমাদের দেখ না, যেন কাঠ পুড়িয়ে—

শৈল বলিল, এ যে দেবার নয় ভাই, নইলে তোমাকে দিতাম। আমার কি রঙ দেখছ! বাবা মা দাদা আমার অন্য বোনেদের যদি দেখতে, তবে দেখতে রঙ কাকে বলে; ঠিক একেবারে গোলাপফুল।

গৌরী বিস্মিত হইয়া বলিল, বল কি বউদি, তোমার চেয়েও ফরসা রঙ?

—হ্যাঁ ভাই, বাড়ির মধ্যে আমিই কালো।

শাশুড়ী আসিয়া চাপা-গলায় বলিলেন, আর কত দেরি বউমা, ওঁরা যে সব এসে গেছেন।

শৈল তাড়াতাড়ি মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া বলিল, এই যে মা, হয়ে গেছে আমার।

ধনী কলিকাতা-প্রবাসিনীদের মহার্ঘ উজ্জ্বল সজ্জা ভূষণ রূপ সমস্তকে লজ্জা দিয়া শৈল আবির্ভূতা হইল—নক্ষত্রমণ্ডলে চন্দ্রকলার মত।

প্রবাসিনীর দল মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছিল, শৈল হাসিমুখে প্রণাম করিল।

ও বাড়ির গিন্নী বলিলেন, এ যে চাঁদের মত বউ হয়েছে তোমার দিদি! লেখাপড়াটড়াও জানে নাকি?

শৈল মৃদুস্বরে বলিল, স্কুলে তো পড়িনি, বাবা স্কুলের শিক্ষা বড় পছন্দ করেন না। বাড়িতে পড়েছি, ম্যাট্রিক স্টাণ্ডার্ড শেষ হয়েছিল, তারপরই—

কথাটা অসমাপ্ত থাকিলেও ইঙ্গিতে সমাপ্ত হইয়া গেল।

ও বাড়ির গিন্নী ব'লেন, কে জানে মা, আজকাল কি যে হাল হ'ল দেশের, মেয়েদের আর কলেজে না পড়লে বিয়ে হচ্ছে না। আমার বউরা ত কলেজে পড়ছিল সব; বিয়ের পর আমি ছাড়িয়ে দিলাম।

শৈল উত্তর দিল, কলেজের কোর্স আমিও কিছু পড়েছি। তবে আমার বোনেরা সব ভাল ক'রে পড়েছে; বাড়িতে দাদাই পড়ান, পড়াশোনায় দাদার ভয়ানক বাতিক কিনা, জানেন—বছরে পাঁচ সাতশো টাকার বই কেনেন—বাংলা, ইংরিজী! বিলেত থেকে ইংরিজী বই আনাবেন। কাজকর্ম যদি করতে বলবেন মা,—কাজকর্ম অবিশ্যি বাবারই বিজ্‌নেস আছে—সেই বিজ্‌নেস দেখতে বলেন ত বলবেন, সম্মুখে জ্ঞানসমুদ্র মা, চোখ ফেরাবার আমার অবকাশ নেই।

—কোথায় তোমার বাপের বাড়ি?

—এলাহাবাদ। এলাহাবাদ গেছেন নিশ্চয়ই, আমাদের সেখানে তিনপুরুষ বাস হয়ে গেল। বাবা সেখানে কণ্ট্রাক্টারি করেন।

—কি রকম পান-টান?

—আমি তো ঠিক জানি না। তবে মেজো ভাই বলেন মাঝে মাঝে, এরকম ক'রে আর চলবে না মা, তুমি বাবাকে বলো। পাকা বাড়িগুলো ভাড়া দিয়ে নিজে সেই খোলার বাড়িতে থাকবেন, টোঙায় চ'ড়ে কাজ দেখে বেড়াবেন, মোটর কিনবেন না, এ ক'রে চলবে না। বাবা বলেন, এ আমার পৈতৃক বাড়ি, যেমন আছে তেমনই থাকবে, ভাঙবও না, অন্য কোথাও যাবও না। আর গাড়ি, গাড়িও আমি কিনব না, ছেলেরা বিলাসী হবে। আমি রোজগার করছি, তারা যদি না পারে! জানেন, লোকে বলে—মহেন্দ্রবাবু এক হিসেবে সন্ন্যাসী!

শৈল কথা শেষ করিয়া মৃদু মৃদু মিষ্টি হাসি হাসে।

প্রবাসিনী গিন্নী এবার শৈলর শাশুড়ীকে বলিলেন, তাহ'লে ছেলের তোমার বেশ বড় ঘরেই বিয়ে হয়েছে দিদি। তোমাদের চেয়ে অনেক বড় ঘর। তত্ত্ব-তল্লাস করেন কেমন বেয়াইরা?

বিচিত্র সংসার, বিচিত্র মানুষের মন, কোন্ কথায় কে যে আঘাত পায়, সে বোঝা, বোধ করি বিধাতারও সাধ্য নয়। তোমাদের চেয়ে অনেক বড় ঘর—এই কথাটুকুতেই অমরের মা আহত হইয়া উঠিলেন, তিনি মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, কে জানে দিদি, বড় না ছোট, সে জানি না। তবে বউমাই বলে, বাপেদের এই,

বাপেদের ওই; কিন্তু তত্ত্ব-তল্লাসও দেখি না, আজ দু'বছর ওই দুধের মেয়ে এসেছে, নিয়ে যাওয়ার নাম পর্যন্ত নেই।

শৈল মুহূর্তে বলিয়া উঠিল, জানেন তো মা, বাবার আমার অদ্ভুত ধরন! তিনি বলেন, যে বস্তু আমি দান করলাম, সে আবার আমি কেন আমার ব'লে ঘরে আনব! তবে যাকে দান করলাম—সে যদি স্বেচ্ছায় নিয়ে আসে, তখন তাদের আদর করব, সম্মান করব, আমার বলব। আর তত্ত্ব-তল্লাস এত দূর থেকে করা সম্ভব হয়ে ওঠে না; কিন্তু টাকা তো চাইলেই দেন তিনি, যখন চাইবেন তখনই দেবেন।

শাশুড়ী বলিয়া উঠিলেন, কি বললে বউমা, তোমার বাবা আমাদের টাকা দেন—কখন, কোন্ কালে?

শৈল বলিল, আপনাদের কথাতো বলিনি মা; আপনি জিজ্ঞেস ক'রে দেখবেন, একশো পঞ্চাশ আশী—চাইলেই তিনি দেন, কেন দেবেন না?

শাশুড়ীর মুখ কালো হইয়া উঠিল। শুধু স্বগ্রামবাসী নয়, উপস্থিত মহিলাবৃন্দ প্রবাসিনী—দেশ-দেশান্তরে এ সংবাদ রটিয়া যাইবে। অমরের মায়ের মাথা যেন কাটা গেল।

তিনি বলিলেন, ভাল, অমর আসুক, আমি জিজ্ঞাসা করব। কই, ঘুণাক্ষরেও ত আমি জানিনি!

ও বাড়ির গিন্নী বলিলেন, তোমায় হয়ত বলেনি অমর। দরকার হয়েছে, শ্বশুরের কাছে নিয়েছে।

অমরের মা বলিলেন, সে নেবে কেন ভাই? সে নেওয়া যে তার অন্যায়—নীচ কাজ। ছিঃ, শ্বশুরের কাছে হাত পাতা, ছিঃ!

অমর কাজ করে কলিকাতায়, সেখানে সে অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা করিয়া থাকে। ব্যবসা হইলেও ক্ষুদ্র তার আয়তন, সঙ্কীর্ণ তার পরিধি, তবুও সে স্বাধীন; তাই মাসে দুইবার করিয়া বাড়ি সে আসিয়া থাকে। অমরের মা রোষকষায়িত নেত্রে পুত্রের আগমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ধনী কলিকাতা-প্রবাসিনীদের সম্মুখে যে অপমান তাঁহার হইয়াছে, সে তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছেন না। শুধু তাঁহার সংসারের অসচ্ছলতাই নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করে নাই, তাঁহাকে মিথ্যাবাদিনী সাজিতে হইয়াছে। এ কয়দিন

বধূর সঙ্গেও একরূপ বাক্যালাপ করেন নাই। শৈল অবশ্য সে বিষয়ে দোষী নয়, সে সদাসর্বদাই মুখে হাসিটি মাখিয়া শাশুড়ীর আজ্ঞার জন্য তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

সংসারের নিয়ম—কাল অগ্নির উত্তাপও হরণ করিয়া থাকে, মনের আগুনও নিবিয়া আসে। কিন্তু শৈলর দুর্ভাগ্য, শাশুড়ীর মনের অগ্নি-শিখা হ্রস্ব হইতে না হইতে ইন্ধনের প্রয়োগে দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। পাড়ায় ঘরে ঘাটে এই লইয়া যে কানাকানি চলিতেছিল, সেটা ভালভাবেই ক্রমশ জানাজানি হইয়া গেল।

সেদিন সরকারদের মজলিসে একদফা প্রকাশ্য আলোচনার সংবাদ অমরের মা স্বকর্ণেই শুনিয়া আসিলেন।

দিন দশেক পরেই কিসের একটা ছুটি উপলক্ষ্যে অমর বাড়ি আসিবার কথা জানাইয়া দিল। শৈলর মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কথাটা মিথ্যা, বার বার সংকল্প করিয়াও সে এবিষয়ে স্বামীকে কোনকথা লিখিতে পারে নাই—কোন অনুরোধ জানাইতে কেমন যেন লজ্জাবোধ হইয়াছে। তাহার হাত চলে নাই, ঠোঁট কাঁপিয়াছে, চোখে জলও দেখা দিয়াছে; সে চিঠির কাগজখানা জড়ো করিয়া মুড়িয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে। শৈল আপনার শয়নকক্ষে স্তব্ধ প্রতীক্ষায় স্বামীর জন্য বসিয়া রহিল, অমর আসিলেই সে তাহার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িবে।

অকস্মাৎ অমরের উচ্চ ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে সে চমকিয়া উঠিল, অন্ধকারের আবরণের মধ্যে চোরের মত নিঃশব্দে বাহিরে আসিয়া সে আশ্বস্ত হইল। ক্রোধের প্রসঙ্গ তাহাকে লইয়া নয়, অমর বচসা জুড়িয়া দিয়াছে কুলীর সহিত।

—এই আধ মাইল—মালের ওজন আধ মণ পঁচিশ সের, তোকে দু'আনা দিলাম—আবার কত দোব?

লোকটাও ছাড়িবার পাত্র নয়। সে বলিতেছিল, তখন আপনি চুকিয়ে নেন নাই কেন মশাই? তখন যে একেবারে হুকুম ঝাড়লেন—এই, ইধার আও। আমাদের রেট তিন আনা ক'রে, স্যান্, দিতে হবে।

—নিকালো বেটা হারামজাদা, নিকালো বলছি—এই নে পয়সা, কিন্তু এখুনি নিকালো সামনে থেকে বলছি।

পয়সা ফেলিয়া দিয়া অমর ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে বাড়ি ঢুকিল।

—দেখ না, লোকসান যে দিন হয়, সে দিন এমনই করেই হয়। পঞ্চাশটা

টাকা মেরে দিয়ে একজন পালাল, তারপর ট্রেন ফেল, আবার বাড়ি এসেও চারটে পয়সা লোকসান।

মাও বোধ করি প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি শান্ত অথচ শ্লেষতীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিলেন, তার জন্য আর তোমার চিন্তা কি বাবা? বড়লোক শ্বশুর রয়েছেন, তাঁকে লেখ, তিনি পাঠিয়ে দেবেন।

অর্থ না বুঝিলেও শ্লেষতীক্ষ্ণ বাক্যশর আঘাত করিতে ছাড়ে নাই। অমর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, তার মানে?

মা বলিলেন, সেই জন্যেই তো তোমার পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি বাবা। আমি শুনব—তুমি আমাকে তোমার রোজগারের অন্ন খাওয়াও, না তোমার শ্বশুরের দানের অন্নে আমাকে পিণ্ডি দাও? তুমি নাকি তোমার শ্বশুরের কাছ থেকে টাকা চাও, আর শ্বশুর তোমায় টাকা পাঠিয়ে দেন—একশো পঞ্চাশ আশী, যখন তোমার দরকার হয়?

ক্লান্ত তিক্তচিত্ত অমরের মস্তিষ্কে মুহূর্তে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিয়া উঠিল, কে, কোন্ হারামজাদা হারামজাদী সে কথা বলে?

মা ডাকিলেন, বউমা!

শৈলর চক্ষের সম্মুখে চারিদিক যেন দুলিতেছে—কি করিবে, কি বলিবে, কোন নির্ধারণই সে স্থির করিতে পারিল না।

শাশুড়ী আবার বলিলেন, চুপ ক'রে রইলে কেন, বলো, উত্তর দাও?

শৈল বিহ্বলের মত বলিয়া ফেলিল, হ্যাঁ, বাবা দেন তো।

অমর মুহূর্তে উন্মত্তের মত দেয়ালে মাথা কুটিতে আরম্ভ করিল।

মা তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।

অমর বলিল, ও বাড়িতে থাকলে আমি জলগ্রহণ করব না।

মা বলিলেন, আমার মাথা কাটা গেল—হরেনবাবুর বাড়ির মেয়েদের কাছে। এমন বউ নিয়ে আমিও ঘর করতে পারব না বাবা।

বিচারক যেখানে বিধিবদ্ধ বিধানের মধ্যে আবদ্ধ নয়, সেখানে বিচার হয় না, বিচারের নামে ঘটে—স্বেচ্ছাচার। তাই ওইটুকু অপরাধে শৈলর অদৃষ্টে গুরু দণ্ড হইয়া গেল, সেই রাত্রেই তাহার নির্বাসনের ব্যবস্থা হইল

রাত্রি বারোটার ট্রেনে শৈলর দেবর তাহাকে লইয়া এলাহাবাদ রওনা হইয়া গেল।

শৈলকে দেখিয়াই তাহার মা আনন্দে বিস্ময়ে আকুল হইয়া বলিলেন, এ কি শৈল, তুই যে এমন হঠাৎ ?

শৈল ঢোঁক গিলিয়া বলিল, কেন মা, আমাকে কি আসতে নেই ? তোমরা তো আনলে না, কাজেই নিজেই এলাম।

মেয়েকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া মা বলিলেন, ওরে, আনতে কি অসাধ, না আমার মনেই ব্যথা হয় না, কিন্তু কি করব, বল্ ?

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিলেন, বাবুর রোজগার ক'মে গেছে, বাজার নাকি বড় মন্দা। তার ওপর হেমির বিয়ে এসেছে—খরচ যে করতে পারছি না মা।

শৈল অবকাশ পাইয়া অঝোরঝরে কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিল।

মা বলিলেন, সঙ্গে কে এসেছে শৈলী, জামাই ?

শৈল বিবর্ণ মুখে বলিল, না। আমার দেওর এসেছে।

—কই সে—ওমা বাইরে কেন সে ?—ঘরের ছেলে। ওরে দাই, দেখ্ ত, বড়দি'র দেওর বাইরে আছেন, ডাক্ ত। বল্, মা ডাকছেন। শৈলর বুক দুরদুর করিতেছিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি অমরের আদেশ ছিল, সে যেন এখানে জলগ্রহণ না করে। কঠিন শপথ দিয়া আদেশ দিয়াছে অমর।

দাই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কই, কেউ ত নেই !

মা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, সে কি ? কোথায় গেল সে ?

শৈল বলিল, তাকে ট্রেন ধরতে হবে মা, সে চ'লে গেছে।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়ে মা যেন অভিভূত হইয়া গেলেন। ট্রেন ধরতে হবে—চ'লে গেছে—সে কি ?

শৈল বলিল, তাকে সিমলা যেতে হবে মা—একটা খুব বড় কাজের সন্ধান করতে যাচ্ছে ; যে ট্রেনে আমরা নামলাম এই ট্রেনই সে গিয়ে ধরবে, থাকার তার উপায় নেই।

মা আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, ফেরবার সময় নামতে ব'লে দিয়েছিস্ ত ?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শৈল বলিল, ব'লে ত দিয়েছি মা, কিন্তু নামতে

বোধহয় পারবে না, খুব জরুরী কাজ কিনা। সিমলে থেকে কলকাতায় যাবে কার একটা চিঠি নিয়ে, সময়ে পৌছুতে না পারলে ত সব মিছে হবে।

এই সময়েই শৈলর জ্ঞানান্বেষী বড়দাদা বাড়ি ঢুকিল। পরনে তাহার খদ্দর সত্য, কিন্তু জরিপাড় শৌখিন খদ্দরের ধুতি, গায়েও শৌখিন খদ্দরের পাঞ্জাবী, মুখে একটা গোল্ডফ্লেক সিগারেট; হাতে কতকগুলি মাছ ধরিবার উপকরণ।

শৈলকে দেখিয়াই সে বলিল, আরে, শৈলী কখন, অ্যাঁ?

হাসিমুখে শৈল বলিল, এই সকালে দাদা, ভাল আছেন আপনি?

—হাঁ্যা। তা বেশ, কই, তুই নতুন লোক, খাস বাংলা দেশের মানুষ—কই, দে ত এই চারগুলো তৈরী ক'রে, দেখি, তোর হাতের কেমন পয়! মাছ ধরতে যাব আজ দেহাতে—এক জমিদারের তালাওয়ে।

শৈল উপকরণগুলি হাতে লইয়া বলিল, চলুন না দাদা, একবার আমাদের ওখানে, কত মাছ ধরতে পারেন একবার দেখব!

—তোদের ওখানে পুকুরে খুব মাছ, না রে?

—আমাদেরই পুকুরে খুব বড় বড় মাছ;—আধমণ, পনরো সের, পঁচিশ সের এক-একটা মাছ। জানেন দাদা, তখন প্রথম গেছি, একটা আঠারো সের কাতলা মাছ এনে দেওর বললে, বউদিকে কুটতে হবে। ওরে বাপরে, সে যা আমার ভয়! এখন আর ভয় হয় না—আধ মণ, পঁচিশ সের মাছ দিব্যি কেটে ফেলি।

যাবার ইচ্ছে ত হয় রে, হয়ে ওঠে না। কলকাতা যাই, তাও অমরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে সময় হয় না। আবার তুই অবিশ্যি যদি কলকাতায় থাকতিস, তবে নিশ্চয় যেতাম।

শৈল বলিল, আচ্ছা দেখব, আমাদেরও কলকাতায় বাড়ি হবে এইবার—

অর্ধপথে বাধা দিয়া দাদা বলিল, কলকাতায় তোদের বাড়ি হচ্ছে নাকি?

শৈল বলিল, জায়গা কিনছেন। ধীরে ধীরে হবে এইবার।

মা পুলকিত হইয়া প্রশ্ন করেন, জামাই এখন বেশ পাচ্ছেন, না রে শৈলী?

শৈল মুখ নত করিয়া বলিল, দেশেও দালান করবেন।

মাস দুয়েক পরই কিন্তু শৈলর মা অনুভব করিলেন, কোথাও একটা

অস্বাভাবিক কিছু ঘটিয়াছে, জামাই বা বেয়ান কেহই ত শৈলকে পত্র দেন না, সংবাদ লন না! তিনি স্বামীকে বলিলেন, দেখো, তুমি বেয়ানকে একখানা পত্র লেখো।

মহেন্দ্রবাবু নিরীহ ব্যক্তি, শৈল অন্যের সম্বন্ধে যতই অত্যুক্তি করিয়া থাক, তাহার পিতার উপার্জনকে যতই বাড়াইয়া বলিয়া থাক, পিতার প্রকৃতি সম্বন্ধে অত্যুক্তি সে করে নাই। সত্যই তিনি সাধু প্রকৃতির নিরীহ ব্যক্তি।

মহেন্দ্রবাবু স্ত্রীর কথায় শঙ্কিত হইয়া পরদিনই বেয়ানকে পত্র দিলেন। লিখিলেন—

আমি আপনার অনুগৃহীত ব্যক্তি, শৈলকে চরণে স্থান দিয়া আপনি আমার প্রতি অশেষ অনুগ্রহ করিয়াছেন। আশা করি—প্রার্থনা করি, সে অনুগ্রহ হইতে আমি বা আমার শৈল যেন কখনও বঞ্চিত না হই। আমি বুঝিতে পারিতেছি না, সেখানে কি ঘটিয়াছে, শৈল কি অপরাধ করিয়াছে! কিন্তু অপরাধ যে করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে কোন কথা প্রকাশ করে নাই; তবুও এই দীর্ঘ দুই মাসের মধ্যে কই আপনার কোন আশীর্বাদ ত আসিল না! শ্রীমান অমর বাবাজীবনও ত কোন পত্র দেয় না! দয়া করিয়া কি ঘটিয়াছে আমাকে জানাইবেন; আমি নিজেই শৈলকে আপনার চরণে উপস্থিত করিয়া তাহার শাস্তি দিব।

তারপর শেষে আবার লিখিলেন—

অমর সংবাদ না দিলেও শৈলর নিকট তাহার উন্নতির কথা শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। কলিকাতায় বাড়ি করিবে শুনিয়া পরম আনন্দ হইল। আপনার মেজো ছেলের পরীক্ষার সংবাদ শুনিলাম, কয়েক নম্বরের জন্যে প্রথম হইতে পারে নাই। আশীর্বাদ করি, বি-এ-তে যোগ্য স্থান লাভ করিবে।

পত্রখানা পড়িয়া অমরের মায়ের চক্ষে জল আসিল।

মনে তাঁহার যে ক্রোধবহ্নি জ্বলিতেছিল, ইন্ধনের অভাবে, সময়ক্ষেপে সে বহ্নি নিবিয়া গিয়াছে। প্রতি পদে তাঁহার শৈলর প্রতিমার মত মুখ মনে পড়িত। বলুক সে মিথ্যা, তবু মিষ্ট কথার সুরটি তাঁহার কানে বাজিত। আজ বেয়াইয়ের পত্র পড়িয়া তাঁহার সকল গ্লানি নিঃশেষে বিদূরিত হইয়া গেল। শুধু বিদূরিত হইয়া গেল নয়, পুত্রবধূর উপর মন তাঁহার প্রসন্ন হইয়া উঠিল, পত্রের

শেষভাগটুকু একবার পড়িয়া, আবার তিনি সেখানটা পড়িলেন,—কলিকাতায় বাড়ি, ইত্যাদি।

তিনি অমরকে পত্র দিলেন। বেয়াইকে লিখিলেন—

বউমা আমার ঘরের লক্ষ্মী, লক্ষ্মীর কোন অপরাধ হয়? তবে কার্যগতিকে সংবাদ লইতে পারি নাই, সে দোষ আমারই। শীঘ্র অমর বউমাকে আনিবার জন্য যাইবে।

পত্র পাইবামাত্র শৈল পুলকিত হইয়া স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিল।

অমর আসিয়াছে। দশ বারো সেরের একটা মাছ সে সঙ্গে আনিয়াছে। শৈল তাড়াতাড়ি সেটা কাটিতে বসিল।

বলিল, বড় জাতের মাছ বোধহয় ধরা পড়েনি। এগুলো মাঝলা জাত।

ওদিক হইতে ভ্রাতৃজায়া বলিল, এই আরম্ভ হ'ল। শ্বশুরবাড়ির অবস্থা ভাল আর কারও হয় না!

রাত্রে অমরের নিকট শৈল নতমুখে দাঁড়াইয়াছিল। অমর একখানা পত্র বাহির করিয়া দেখাইয়া ব'লিল, এ সব কি বলো ত?—'একটি বড় মাছ যেমন করিয়াই হউক আনিবে, এখানে আমি আমাদের অনেক মাছ আছে বলিয়াছি।' বেশ, আমাদের ষোলআনা একটাও ত পুকুর নেই, অথচ—ছিঃ! আর 'এখানে মুক্তার গহনার চলন হইয়াছে, আমার জন্য ঝুটা-মুক্তার মালা একছড়া—' ও কি, —ও কি, কাঁদছ কেন, শৈল, শৈল?

শৈল বিছানায় মুখ গুঁজিয়া আকুল হইয়া কাঁদিয়া উপাধান সিক্ত করিয়া তুলিল। সে কথা যে তাহার অমরকে মুখ ফুটিয়া বলিবার নয়!

মাটি

উত্তর কলকাতার অধিবাসীদের অন্ততঃ সিকি লোক লোকটিকে বোধ হয় চেনে, অর্ধেক লোক ওর কণ্ঠস্বর শুনেছে, এবং শুনলেই চিন্‌তে পারে—এ সেই কণ্ঠস্বর। ষোলআনা লোকই ওর কণ্ঠস্বর চেনে বলতে দ্বিধা করতাম না, কিন্তু মধ্য দ্বিপ্রহর ছাড়া অন্য কোন সময়ে লোকটির হাঁক শোনা যায় না। মধ্য-দ্বিপ্রহরের একটা অবসাদ আছে, মহানগরীও কিছুক্ষণের জন্য পাখির রাজ্যের মত ঝিমিয়ে পড়ে। রাজপথে লোক বিরল হয়, ট্রামে বাসে সিট খালি পড়ে, গতিও যেন মন্থর হয়, ড্রাইভারের হাতের মুঠি বোধ হয় আলগা হয়ে আসে: দোকানে খরিদ্দার কমে যায়, কর্মচারীরা কেউ পেন্সিল ঠোঁটে চেপে জনবিরল পথের দিকে চেয়ে থাকে। ব'সে ব'সেই অনেকে ঘুমোয়, অফিস অঞ্চলেও এ সময়টায় কাজকর্ম ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকে; টেলিফোনের রিসিভার তুলে সাড়া পেতে দেরি হয়। ফুটপাতে জুতো-পালিশওয়ালারাও ঢোলে ঝিমোয়: বাড়িতে দরজা বন্ধ থাকে, মেয়েরা হয় ঘুমোয় নয় আস্তে ধীরে কিছু বোনে বা সেলাইয়ের কল চালায়। রেডিওতে গান বক্তৃতা বেজেই চলে; এ সময় আকাশের দিকে তাকালে ক্বচিৎ দু'একটা চিল বা শকুন উড়তে দেখা যায়, নইলে আকাশটাও খাঁ খাঁ করে। আমার পাশের বাড়িতে আছে একটা এ্যালশেশিয়ান, সেটাও এ সময়ে চোখ বন্ধ ক'রে জিভ বের ক'রে হাঁপায়, তার মাথার উপরে বারান্দার কড়িতে পায়রাগুলো পা ভেঁজে বুকে ভর দিয়ে শুয়ে থাকে, কিন্তু কুকুরটা ধরবার জন্য লাফায় না। পথে খাবার প'ড়ে থাকে, কাক দেখা যায় না।

এরই মধ্যে অকস্মাৎ উত্তর কলকাতার কোন-না-কোন পথে বা গলিতে অদ্ভুত তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে ওঠে—মাটি চা—ই, মা—টি।

কণ্ঠস্বরই শুধু তীক্ষ্ণ নয়, লোকটির হাঁকের ভঙ্গীও বিচিত্র, শেষের মাটি শব্দটার 'মা' পর্যন্ত চীৎকার ক'রে হেঁকে 'টি'র শেষে হ্রস্ব 'ই' টাকে বেপর্দায় খাদে নামিয়ে দেয়, তার প্রতিক্রিয়া হয় অদ্ভুত, সমস্ত শরীরের স্নায়ুমণ্ডলী কেমন যেন চমকে শিউরে ওঠে। তীক্ষ্ণকণ্ঠে এই বিচিত্র ভঙ্গিমার উচ্চারণে স্নায়ুর উপর

ধ্বনির প্রভাব সার্বজনীন কিনা জানি না, তবে আমি এ প্রভাব অনুভব করেছি এবং আমার বাড়ির একটি শিশুকে চমকে উঠে ঠোঁট ফুলাতে দেখেছি। গ্রীষ্ম-দ্বিপ্রহরে আমার ঘুমের আমেজ ভেঙ্গে গিয়েছে, বন্ধ-দুয়ার-জানালা, অন্ধকার ঘরে মধ্যে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে কতদিন মনে হয়েছে—আমি শুয়ে আছি আমার দেশের বাড়িতে, বাড়ির পিছনেই তালগাছ-ঘেরা খিড়কীর পুকুরের কোন তালগাছের মাথায় ব'সে রৌদ্রশ্রান্ত চিল তীক্ষ্ণ করুণ স্বরে ডাকছে চি-লো-চি-ল-অ। শেষে অকারটা ঠিক এমনি বেপর্দায় নরম স্বরে নেমে এসে থেমে যায়। চিলটার ঠোঁটের নীচে গলার কাছটা ধুক্ ধুক্ ক'রে কাঁপে।

উত্তর কলকাতায় বাসা করার প্রথম সপ্তাহেই ওর ডাক শুনেছিলাম। তখন বৈশাখ মাস। মনে আছে বাসা পেতেছিলাম ৬ই বৈশাখ। গলির মোড়ে সেদিন ওর হাঁক উঠতেই দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। খাঁ-খাঁ করছে গলি-পথ, পিচের উপর মোটর-টায়ারের ও নাল-মারা জুতোর দাগ ফুটে উঠছে, বাতাস ঝলসাচ্ছে, বাড়ির গায়ে এক টুক্‌রো কোণাচে জায়গায় একটা কনকচাঁপা গাছের লম্বা পাতাগুলি অবসন্ন হয়ে ঝুলে পড়েছে। আকাশের দিকে চোখ তোলা যায় না, হাপর থেকে বের করার কয়েক মুহূর্ত পরে নীল হয়ে যাওয়া ধাতুপাত্রের মত উত্তাপ বিকীর্ণ করেছে। সে উত্তাপ চোখে এসে লাগছে। এরই মধ্যে ওর এই হাঁক উঠছে—মাটি চাই—মাটি-ই।

তাকিয়ে রইলাম পথের দিকে। আবার হাঁক উঠলো—মাটি চাই—মাটি-ই। হাঁকটা এবার দূরে চ'লে গেল।

মাটি চা—ই মা—টি—ই। এবার আরও দূরে। বাঁকের ওপারে আমাদের গলি থেকে একটা অত্যন্ত অপ্রশস্ত গলি এঁকে বেঁকে চ'লে গেছে দক্ষিণ মুখে, সম্ভবতঃ লোকটা সেই গলি-পথে ঢুকে চ'লে গেছে। কিন্তু লোকটার কণ্ঠস্বর, তার ওই হাঁকের বেসুরা সমাপ্তি মনটাকেই শুধু অশান্তিতে ভ'রে দিয়ে গেল না, শরীরেও একটা চকিত চাঞ্চল্য বইয়ে দিয়ে গেল।

কিছুদিন পর ওকে দেখলাম। সেদিন দুপুরেই বেরিয়েছিলাম কাজে। ফড়েপুকুর স্ট্রীটে ঢুকে খানিকটা অগ্রসর হতেই ওই তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরের বেসুরা হাঁক কাছেই কোথায় ধ্বনিত হয়ে উঠলো। এক মুহূর্তে যে কৌতূহল স্তিমিত হয়ে

পড়েছিল সে দীপ্ত হয়ে উঠলো, ঐ হাঁকটা যেন ফুৎকার দিয়ে জাগিয়ে তুললো—দপ্ ক'রে জ্বালিয়ে দিল। দিক অনুমান ক'রে এগিয়ে গেলাম।

—মাটি—চা-ই—মা—টি-ই।

থমকে দাঁড়ালাম। হাকটা পিছনে প'ড়ে গেছে। পিছন ফিরলাম—দেখলাম পিছনে একটা পাশের গলি থেকে মাটিওলা বেরিয়ে আসছে। বিচিত্রদর্শন উলঙ্গপ্রায় মানুষ। পরনে শুধু একটা নেংটি; সর্বাঙ্গ কাদায় আবৃত। সন্ন্যাসীরা যেমন ভস্মে সর্বাঙ্গ আবৃত করে, তেমনিভাবে কাদায় মাখা লোকটির সর্বাঙ্গ। সময়টা তখন বোধ হয় আষাঢ় মাস। রৌদ্রের প্রখরতা বৈশাখের চেয়ে কম নয়, উপরন্তু বাতাসে সঞ্চারিত হয়েছে সজলস্পর্শ, মাটিও হয়েছে সরস সিক্ত, তার ফলে একটা গুমোট তাপানিতে ভ'রে উঠেছে বাংলা দেশ, জ্বালার বদলে ঘেমে মানুষ সারা হয়ে গেল। লোকটার গায়ের ধুলো কাদা হয়ে উঠেছে, সেই কাদা ঘামে গলছে। ঘামের ধারা গড়িয়ে গড়িয়ে দেহখানাকে যেন বিচিত্রিত ক'রে তুলেছে। আমি অবাক্ হয়ে ওকে দেখলাম। কাদা এবং ঘামের ধারার রং ও রেখার বৈচিত্র্য নয়—অবাক হলাম লোকটার দেহের গঠন-বৈচিত্র্য দেখে। একজন সুস্থ সহজ মানুষের দেহ এমনভাবে বিকৃত হয়ে যায়? লম্বা একটি মানুষ বোঝা ব'য়ে খাটো হয়ে যায় এমনভাবে? পা থেকে কোমর পর্যন্ত শরীরের নীচের দিকটা সহজ স্বাভাবিক সরল সোজা পা, প্রতিটি পেশী সুগঠিত; কিন্তু উপরের দিকটা—কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত অংশটা বিপুল চাপ দিয়ে কেউ যেন দেহের কাঠামোটা পর্যন্ত ভেঙে-চুরে বিকৃত ক'রে খাটো ক'রে দিয়েছে। চওড়া বুকটা উঁচু হয়ে ঠেলে উঠেছে; পেটটা গিয়েছে ভিতরে ঢুকে—সেখানে দড়ির মত গোটা তিনেক পেশী দাঁড়িয়ে গেছে, সেগুলি এখন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসে কাঁপছে। ঘাড়ে মাটির বস্তার জন্য ওর মুখখানা আমি দেখতেই পাচ্ছি না, মাটির দিকে মুখ ক'রে লোকটা হেঁটে চলেছে, আমি দেখতে পাচ্ছি ওর মাথার একটা দিক; কদমফুলি ছাঁটে ছাঁটা কাঁচা-পাকা চুলে-ভরা প্রকাণ্ড মাথাটার একটা দিক। একটু দ্রুত হেঁটে এগিয়ে গেলাম। এবার নজরে পড়ল—কাদার প্রলেপের মধ্যে দেখতে পেলাম—ছোট বড় কাটা দাগ,—সংখ্যায় অনেক।

একটা বাড়ি থেকে কেউ ওকে ডাকলে—এই মাটিওলা।

লোকটা ঘুরল সেই দিকে; আমি তার পিছনে পড়লাম। এবার আমার

বিস্ময় উঠলো চরমে। ঘাড়ের নীচেই একটা কুঁজ। কুঁজের উপরে একটা খাঁজ তৈরী হয়ে গিয়েছে, তারই উপরে মাটির বস্তা চাপিয়ে লোকটা ভারী পায়ে পা ফেলে; কিন্তু চলার ভঙ্গী সহজ—কাঁধে ভার চেপেছে ব'লে দ্রুত চলছে না, বেশ সহজ চালে চলছে। মাটির বস্তা ব'য়ে ঘাড়ে ওর খাঁজ তৈরী হয়েছে—ওর সবল সহজ দেহ ভেঙে-চুরে পিঠে কুঁজ ঠেলে উঠেছে, বুকটা ফুলে ঠেলে বেরিয়েছে—পেটটা ঢুকে গেছে।

ঠিক এই মুহূর্তেই লোকটা ঘাড়ের বস্তা দাওয়ার উপরে নামিয়ে মাটি বেচতে বসল। যুক্তি ও অনুমানের দিক থেকে আশ্চর্য হবার কথা নয়, তবুও আশ্চর্য হলাম, যুক্তি এবং অনুমানের শক্তি বোধ হয় পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলো আমার। ঘাড়ের বস্তা নামিয়ে ও-লোকটি সহজ মানুষের মত সোজা হতে পারলে না। ঘাড় বেঁকেই রইলো—পিঠের কুঁজটা তেমনি উঁচু হয়েই রইল—শুধু মুখটা একটু তুললে মাত্র। নির্বোধ মানুষের মুখে-চোখে স্থুলদৃষ্টি, কিন্তু একটি সুন্দর মানুষের মুখ। মুখের গড়নে বড় বড় চোখের দৃষ্টির মধ্যে একটি শান্ত মধুর সুন্দর মানুষের সন্ধান বিবর্ণ বিজ্ঞাপনের মত যেন ফুটে রয়েছে। বিস্মিত এবং বেদনাহত হয়ে কতক্ষণ তাকে দেখেছিলাম, সেকথা আজ মনে নেই; অনেক চিন্তাও মনের মধ্যে উঠেছিলো, এই যুগের চিন্তাই সে সব, কিন্তু তাও সব আজ স্পষ্ট নয়, পৃথিবীর সমাজব্যবস্থাকে অভিসম্পাত দিয়েছিলাম, কোটি কোটি মানুষকে এইভাবে যারা বঞ্চিত ক'রে রেখেছে শিক্ষা থেকে, সম্পদের ন্যায্য অংশ থেকে, তাদের ধ্বংস-কামনাও করেছিলাম—এতে কোন সন্দেহ নেই। আরও অনেক কথা মনে হয়েছিল; সে সব মনে পড়ছে না আজ। না পড়ুক। তবে এর পর যে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চ'লে গিয়েছিলাম, তা আজও মনে পড়ছে। শুধু তাই নয়, ঐ দিন থেকে ওর সঙ্গে আমার মনের একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসের সম্পর্কই স্থাপিত হয়ে গেছে; যখন মনে হয় ওর কথা—যখনই স্তব্ধ দুপুরের অবসন্ন অবসরে দূরে হোক—কাছে হোক—নগরীর পথে ওর ডাক শুনতে পাই, তখনই একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস আপনি ঝ'রে পড়ে বুক থেকে; শত ব্যস্ততা অথবা একাগ্র চিন্তার মধ্যেও কয়েক মুহূর্তের জন্য সব ভুলে গিয়ে কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। শীতের অরণ্যগর্ভ থেকে ঘনিয়ে-ওঠা কুয়াশা যেমন বনস্পতির পত্র-পুষ্পের সূর্যারাধনাকে আচ্ছন্ন আবৃত করে, তেমনি ভাবেই একটি

উদাসীনতা আমার মনের মধ্যে ঘনিয়ে উঠে সচেতন মনের সকল উদ্যমকে আচ্ছন্ন ক'রে দেয়।

এর পর কতবার ওকে দেখেছি, বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি, বাগবাজার, বউ-বাজার, পোস্তা, টালা, বেলেঘাটায়—ঠিক এমনি দ্বিপ্রহরে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেছি; তীক্ষ্ণস্বরে ওই বেসুরা ভঙ্গীতে ওর হাঁক ভেসে চলেছে—মাটি চাই—মা—টি—ই।

সব দিন দেখতে পাইনি। অনুসরণের স্পৃহা আর নেই। দু'এক দিন চোখে পড়েছে। নুয়ে-পড়া ঘাড় এবং ঠেলে-ওঠা পিঠের কুঁজের মধ্যবর্তী খাঁজে মাটির বস্তা ব'য়ে বিকলাঙ্গ মাটিওয়ালা সর্বাঙ্গে কাদা মেখে হেঁকে চলেছে—মা—টি চা—ই, মা—টিই। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছি আমি। তারপর চ'লে গেছি নিজের পথে।

* * * *

হঠাৎ সেদিন নিতান্ত অসময়ে—একেবারে ভোরবেলা অপ্রত্যাশিতভাবে ওর বাসাও আবিষ্কার করলাম। সবে তখন গ্যাসের আলো নিবেছে, রাস্তায় তখনও জল পড়েনি, আমি অভ্যাসমত প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম; বেড়াবার বাঁধাধরা স্থান ছিল পার্ক অথবা গঙ্গার ধার; সেদিন দিক্ পরিবর্তন ক'রে চ'লে গেলাম একেবারে খালের ধারে। খালের পোল পার হয়ে গেলাম গঙ্গা ও খালটার সংযোগস্থলের গেটটার দিকে। পাম্প লাগিয়ে খালের জল মেরে ফেলা হচ্ছিল, খালটা মজে এসেছে, সংস্কার হবে। কাজ অনেকটা অগ্রসর হয়েছে, দু'ধার জেগে উঠেছে; জল পড়েছে মাঝখানে, তার মধ্যেও মাঝে মাঝে পাঁক দেখা যাচ্ছে। পোল পার হয়ে খালের ধারে ধারে চলেছিলাম। গঙ্গার ওপারে জুটমিলের ইয়ার্ডে এখনও আলো জ্বলছে। হঠাৎ দেখলাম মাটিওয়ালাকে। নুয়ে-পড়া ঘাড়, পিঠে কুঁজ, ঠেলে-ওঠা বুক···দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। গঙ্গায় স্নান ক'রে একখানা গামছা প'রে হাতে একটা জলের ঘটি নিয়ে ফিরছে। আমি থমকে দাঁড়াতেই মাটিওয়ালা সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চাইলে। তারপরই প্রসন্ন বিনয়ে হেসে বললে—আজ্ঞা হাঁ, আমি সেই মাটিওয়ালাই বটে। ভাঙা ভাঙা বাংলায় হিন্দী মিশিয়ে কথাটা বললে—হাঁ, ওহি মাটিওয়ালাই আছে হামি বাবুজী। যেন স্নান ক'রে পরিচ্ছন্ন দেহে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বেচারী লজ্জা পেয়েছে!

আমি প্রশ্ন করলাম—কোথাও যাবে বুঝি আজ ?

তার স্থূলদৃষ্টিতে বিস্ময় জেগে উঠলো আমার প্রশ্নে। বললে—আঁ। যায়েগা ? কাহাঁ যায়েগা ?

—আস্নান ক'রে এলে—এই ভোরে—

—হাঁ। এখন রামজীর নাম নোব, উস্‌কে বাদ—ছুটো চানা খেয়ে নেব, তারপর চলেগা মাট্টি আনতে। আচ্ছা বাবুজী রাম-রাম।

—রাম-রাম ভেইয়া।

সে চলতে শুরু ক'রে দিলে। কয়েক পা গিয়েই কিন্তু ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—খোকী ভাল আছে বাবুজী ? আপনার লেড়কী ?

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না ওর কথা। আমার বাড়িতে তো খুকী নেই।

—আপনের খোকী ! আপ ত বেলিয়াঘাটামে রহেতে হ্যায় ? লাল রঙের কোঠি ?

বুঝলাম, ও আমাকে বেলেঘাটার কোন লাল রঙের বাড়ির বাসিন্দা ব'লে ভুল করেছে। কিন্তু প্রতিবাদ করলাম না। ওরই ভুলের মধ্য দিয়ে পরিচয়ের সুযোগ নিতে চাইলাম। বললাম—হ্যাঁ ভাল আছে।

মুখ ভ'রে হেসে সে বললে—আমি গেলেই ছুটে আসবে। একটি খোলা-ভাঙ্গা বাড়িয়ে দিয়ে বলবে—এক পয়সার মাটি দেও—মাটিওলা। হামি বলে—কি হোবে খোকী ? বলে—চুলহামে মাটি দেনে হোগা, মাটিওলা। ছোটা হাতমে একমুঠি মাট্টি—বাস চলা যায়েগা।

এবার সে হা হা ক'রে হেসে উঠলো। তারপর বললে—য্যায়সা দেখতা হ্যায় না—ওইসাই—ঠিক ওইসাই করেগা উ লোক।

ছোট্ট একটি গিন্নী মেয়ের ছবি আমার চোখে ভেসে উঠলো। অন্তর ভ'রে উঠলো অনাবিল প্রসন্নতায়। সে এবার ঘটিসুদ্ধ হাত তুলে আমাকে নমস্কার ক'রে বললে—আব যাতা হ্যায় বাবুজী ! হাঁ রাম-রাম।

চ'লে গেল সে। আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েই রইলাম তার দিকে চেয়ে। খালের এপারটা অপরিচ্ছন্ন, প্রাচীন আমলের ভাঙ্গা বাড়ি, বস্তি, গোলা আর গুদামে ভর্তি। আবর্জনা এবং আগাছার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চ'লে গেছে বস্তির পথ। সেই পথে চ'লে গেল সে।

*　　*　　*　　*

আবার কয়েকদিন পর ওর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। এবার দেখা হওয়ার পটভূমি একেবারে কল্পনার বাইরে। গিয়েছিলাম পোস্টাপিসে, পোস্টাপিসে একটা লম্বা কিউয়ের মধ্যে দেখি মাটিওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে। পোস্টাপিসে ওকে কিউয়ের মধ্যে দেখবার প্রত্যাশা যেন কল্পনার বাইরে। মুহূর্তের জন্ম আমার কপাল কুঞ্চনরেখায় ভ'রে উঠলো। পরমুহূর্তে নিজেই একটু হাসলাম, ওরও দেশ আছে, ঘর-সংসার আছে, ইটে-কাঠে-পাথরে মাটির ধুলাকে ঢেকে যে মহানগরী গ'ড়ে উঠেছে, তারও ঘরে ঘরে মাটির প্রয়োজন হয়; ওই শিক্ষায় দীক্ষায় বঞ্চিত মাটি-ওয়ালা—ওরও প্রয়োজন হয় ডাকঘরে, এতে বিস্ময়ের কি আছে? কিউটা মনিঅর্ডারের কিউ। টাকা পাঠাচ্ছে দেশে। সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহল উদ্রিক্ত হ'য়ে উঠলো—ঘুমন্ত বাড়ির খোলা দরজার সম্মুখে চোরের উঁকি মেরে দেখবার প্রবৃত্তির মত। কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ও আমার মুখের দিকে চাইলে, চোখে ফুটে উঠল অপরিচয়ের বিস্ময়; শঙ্কিতও হ'ল বোধ হয়, কারণ গামছার খুঁটটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরলে। বুঝলাম একেবারে ভুলে গেছে আমাকে। সেদিনের খোকীর গল্পটা মনে প'ড়ে গেল। বললাম—পছানতে নেহি?

নির্বোধের মত উত্তর দিলে—আঁ?

হেসে বললাম—সেদিন তোমার সঙ্গে খালধারে দেখা হয়েছিল! বেলেঘাটার খোকী—মাটি কেনে তোমার কাছে—!

আশ্বাসের হাসিতে ওর নির্বোধ মুখখানি ভ'রে উঠলো, বললো—হাঁ—হাঁ। কাল গয়া থা আপনাকে কোঠিমে। খোকী কাল হামাকে নেওতা দিয়া।

হেসে আমি বললাম—দেশে টাকা পাঠাবে?

—হাঁ। দেশমে রূপেয়া ভেজবে।

—এ তো অনেক দেরি হবে। এসো আমি তোমার মনিঅর্ডার তাড়াতাড়ি করিয়ে দেব। আমার সঙ্গে আলাপ আছে মাস্টারবাবুর।

—হাঁ! সে অবাক হয়ে গেল আমার প্রতিষ্ঠা দেখে।

—কই, দেখি তোমার মনিঅর্ডার।

একখানা সাদা ফর্ম আমার হাতে দিয়ে সে বললে—তা হ'লে তুমি এটা লিখে দাও বাবুজী। খুশি হয়েই বাইরে একটা দাওয়ার উপর ব'সে গেলাম ওকে নিয়ে।

—লিখিয়ে বাবুজী! রুপেয়া দশঠো। পানেওলী—লছমনিয়া, অকলু মুসহরকে বিটীয়া। আমি লিখতে শুরু ক'রে ওর নামগুলি প্রশ্নের সুরে ব'লে গেলাম, ভুল হলে সংশোধনের সুযোগ পাবে।

—লছমনিয়া।

—হাঁ।

—অকলু মুসহরকে বিটী।

—হাঁ। গাঁও···। গঙ্গাজীর কিনারমে জাহাজী টিশন।

গাঁও পোস্টাপিস মনে নেই আজ, মনে আছে জিলা পাটনা। তারপর বললাম—অব্ তুমহারা নাম-পাতা বোলো।

—হাঁ। লিখিয়ে, মেওয়ালাল।

—মেওয়ালাল মুসহর?

—নোঁহ নেহি। মাট্টিওয়ালা লিখিয়ে।

—আচ্ছা। হাসলাম একটু। বাতাও উস্‌কে বাদ। পত্তা বাতাও।

ব'লে গেল ওর ঠিকানা। বিচিত্র বস্তির সে ঠিকানা।

—অব্—কেয়া লিখনে হোগা বাতাও।

—কুছ্ না।

—কুছ্ না? ইস্‌মে লিখনে কা জায়গা হ্যায়, লিখনে কা একৃতিয়ার ভি হ্যায়—

—নেহি—নেহি—কুছনা। নেহি—নেহি।

সে প্রতিবাদ জানালে। কিছু না। কিছু লিখতে হবে না। আমি ওর মুখের দিকে চাইলাম। ও তখনও ঘাড় নাড়ছিল। আমার চোখে চোখ পড়তেই একটু হাসলে, বিচিত্র সে হাসি। তারপর বললে,—আজকের দিনটা আমার মাটি বাবুজী। কোন কাজ হ'ল না। মাহিনার পহেলা রোজ হামার এই কাজেই যায় বাবুজী। মহাবীর কাহারের মা বলে—বরবাদ, বরবাদ করিস দিনটা তুই মেওয়ালাল!

পরের মাসের পয়লা তারিখটা বিশেষ ক'রে খেয়ালে ছিল। মাটিওয়ালার জন্য নয়, তারিখটিকে স্মরণীয় ক'রে তুলে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার সংসারে আবির্ভূতা হলেন—এক দৌহিত্রী। ধাত্রী ডাক্তার এঁদের বিদায় ক'রে ডায়েরীতে

লিখছিলাম নবজাতার জন্মের তারিখ, সময় ইত্যাদি। ১লা অগ্রহায়ণ…। হঠাৎ খোলা দরজায় এসে দাঁড়াল মেওয়ালাল মাটিওয়ালা। আমি বিস্মিত হয়ে ওর দিকে তাকালাম। আমার বাড়ি ও চিনলে কেমন ক'রে।

একগাল হেসে মেওয়ালাল বললে—পরণাম বাবুজী।

—রাম রাম ভাই।

—আপ্‌কা কোঠি হম পহছান লিয়া বাবুজী! সে হাসতে লাগল। বললে—বেলিয়াঘাটা তোমার বাড়ি নয়। যো রোজ তোমার সঙ্গে পোস্টাপিসে দেখা, তার পরদিন আমি তোমার জন্যে বহুত আচ্ছা গঙ্গাজীর মাটি নিয়ে তোমাকে ভেট দিতে গিয়েছিলাম। টবে ওই মাটি দিয়ে গাছ লাগালে আচ্ছা গাছ হবে। কিন্তু গিয়ে একদম বেওকুব বনে গেলাম। মালিক, ওহি খোকীর বাপ, খোকীর হাত ধ'রে দাঁড়িয়েছিল দরজায়। আমি বাবুজী ওহি বাবুজীকেই বললাম—মালিকবাবুকে একটু ডেকে দেবে হুজুর? এই খোকী মায়ীর পিতাজীকে? বাবুজীকে গোস্‌সা হো গিয়া. আরে—বাপরে বাপ! আঁখ পাকাকে—বলব কি বাবুজী—বলে—কেয়া কাম হ্যায় তুমহারা? খোকীকে পিতাজী ত হাম হ্যায়। হায় রামজী! হম একদম বেওকুব বন গেয়া।

আমি নিজেও একটু অপ্রতিভ হলাম। এইবার যদি ও আমাকে প্রশ্ন করে, বাবুজী, তুমি এমন মিথ্যে পরিচয় কেন দিলে আমাকে?—তবে আমি কি উত্তর দেব। সত্য উত্তর মেওয়ালাল কতখানি বুঝবে? হঠাৎ মনে এসে গেল, আমিও তাই ব'লে বসলাম—আমি তোমার সঙ্গে জুয়াচুরি কিছু করিনি মেওয়ালাল। মনিঅর্ডারের রসিদ পেয়েছ তুমি?

—হাঁ—হাঁ—হাঁ। বার বার স্বীকার করতে চাইলে যেন কথাটা শুধু বাক্যে নয়—ঘাড় নেড়ে সর্বাঙ্গ দিয়ে স্বীকার করলে যেন। এর পর অপরাধীর মত হেসে বললে—তোমার কাছে আমার কসুর লুকাব না বাবুজী। প্রথম দিন—বেলিয়াঘাটায় যেদিন দেখলাম খোকীর বাপ তুমি নও, সেদিন আমার বহুত ডর হয়েছিল। মনে হয়েছিল বাবুজী, কি কোন জুয়াচোর হয়তো আমাকে ঠকিয়ে দশ-দশঠো টাকা আমার মেরে দিয়েছে। মনিঅর্ডারকে বিল্‌টি যেঠো আমাকে দিয়েছে, সেটা হয়তো একদম ভূয়া হবে। পোস্টাপিসে কি ঝুটমুঠ ব'লে একটা বাজে কাগজ আমাকে দিয়েছে। বাবুজী, বেলিয়াঘাটে একদম দৌড়কে-দৌড়কে

বাসায়ে ফিরলাম। বিল্‌টি নিয়ে ছুটে এলাম একঠো ডাগডরখানামে। ডাগডর-বাবুকে বললাম—দেখিয়ে ত হুজুর—ডাগডর সাব, কেয়া লিখা হুয়া হ্যায় ইস বিলটিমে? মেহেরবানী ক'রে গরীবকে ব'লে দাও তো গরীব পরবর! তা ডাগডর সাব পড়লে—দেখলাম—ঠিক ঠিক নাম আওর পতা লেখা রয়েছে। ডাগডর আরও বললে—বিল্‌টি ঠিক্‌ঠাক আছে—ডাংখানার মোহর আছে—মাস্টারবাবুকে সহি ভি আছে। খানিকটা ভরসা হ'ল। তবু বাবুজী, পুরা ভরসা পাইনি। রাত্রে ঘুম হ'ত না! ভাবতাম—কলকাতার জুয়াচুরি—একঠো জাল মোহর বানাতে আর কি লাগে? তারপর একদিন রসিদটা ফিরে এলো। যেমন সঙ্গে সঙ্গে একঠো খত ভি আসে—তাও এল। তখন বার বার মনে মনে বললাম—সীতারামজী—বাবুজীর কাছে আমার কসুর হ'ল—এ পাপের আমি কি করি! তারপর একদিন তোমার বাসা দেখলাম। দেখলাম বহুত ভারী বাবু আমীর লোকের সঙ্গে তুমি কথা বলছ। আবার এক রোজ দেখলাম সাহেব লোগ ব'সে আছে তোমার কাছে। দূর থেকে উঁকি মেরে দেখে ফিরে গিয়েছি। আজ ফিন মাহিনাকে পহেলা রোজ বাবুজী—তুমি আমার মনি-অটারঠো লিখে দাও, আর যদি সেদিনের মত জলদি করিয়ে দাও বাবুজী—

মেওয়ালাল হাত জোড় ক'রে দাঁড়ালো। আমিও একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। সহজ সরল মানুষ—তাই এত সহজে ওর সন্দেহ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি। নইলে এই মিথ্যা পরিচয় দেওয়ার পর এ সততাকে বড় রকমের জুয়া-চুরির ভূমিকা ভাবতে বাধা কোথায় ছিল।

বললাম—দাও ফর্ম। কি নাম যেন? লছমনিয়া—না?

—জী। লছমনিয়া, অকলু মুসহরকে বিটীয়া।

* * * *

লছমনিয়া—অকলু মুসহরকে বিটীয়া—বাড়ি পাটনা জেলার একটা গ্রামে একেবারে গঙ্গাজীর কিনারার উপর।

মেওয়ালালের সঙ্গে সেদিন আলাপ জমে উঠলো। মেওয়ালাল বললে—বাবুজী যে লোক—ডেকে আমার দুঃখ লাঘব ক'রে দিলে; আমীর আদমী, লিখাপড়া জানা লায়েক আদমী হয়ে আমার মত গরীব মাটিওয়ালার সঙ্গে এমন মিষ্টি কথা বললে—তার কাছে কি কিছু লুকুতে আছে? তোমার কাছে বলি। মনের

কথা আমার তুনিয়ায় বলবার লোক পাই না। বহুত রোজ আগে—বলেছিলাম এক সাধুজীর কাছে। গঙ্গাজীর কিনারায় এসে একঠো মন্দিরের দাওয়ায় আসন গেড়েছিলেন—তাঁকে বলেছিলাম। আর বলেছিলাম—মহাবীর কাহারের মাকে, আমাদের বস্তিতে থাকে বুঢ়িয়া, সে আমাকে ভালবাসে আপন বেটার মত; একবার ভারী বেমারী হয়েছিল আমার—ওহি বুঢ়িয়া আমাকে বাঁচিয়েছিল—তাকে বলেছিলাম! আজ তোমাকে বলি!

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে মেওয়ালাল। বাইরে শীতের ঝরঝরে হাওয়া বইছে। বাড়ির পাশের চাঁপা গাছের পাতা ঝরে পড়ছে সে হাওয়ায়।

"মুসহরের বিটী লছমনিয়ার যে গাঁয়ে বাড়ি—ওই একই গাঁয়ে রতনলাল নামে এক···।" বলতে গিয়ে থেমে গেল মেওয়ালাল। একটু যেন সামলে নিয়ে বললে—বাবুজী, রতনলাল নামে একজন খুব ভাল লোক ছিল। লোকে বলত মুন্সীজী। লিখাপঢ়ি জানতো, গোস্বামী মহারাজ তুলসীদাসের রামচরিত কথা পড়ত। গরীব গৃহস্থী, ঘরে তু-তিনটে গাই ছিল—একটা ভঁইসা ছিল, একজোড়া বয়েলও ছিল, আর গঙ্গাজীর কিনারায় পাঁচ বিঘা ক্ষেত। তারই ছেলে আমি—আমার নাম 'জীওনলাল'; ওই অকলু মুসহরকে বিটীয়া—লছমনিয়া আমার নাম দিয়েছিল—মেওয়ালাল। অকলু মুসহর আমার বাপের ক্ষেতিতে কাম করত—কিষাণ মজতুর ছিল। গাই, ভঁইস, বয়েলের সেবা করত ওর বিটী। ওই লছমনিয়া ছেলেবেলা থেকেই আসত আমাদের বাড়ি। পাট কাম করত, ঝুঁটা বর্তন মলাই করত। ওরও মা ছিল না, আমারও মা ছিল না বাবুজী, ছেলেবেলা একসঙ্গে খেলা করতাম আমরা।

রতনলালকে লোকে বলত সুখী মানুষ। কারও সঙ্গে ঝগড়াঝাটি ছিল না। গাঁয়ের লোক সম্ভ্রম করত। ক্ষেতিতে গঁহু, যব, অড়হর হ'ত প্রচুর। ছেলে মেওয়ালাল বার-চৌদ্দ বরিষ উমর থেকেই এমন ক্ষেতির কাম শিখেছিল আর ওই ক্ষেতি নিয়েই চব্বিশ ঘণ্টা এমন খাটত যে, তু'তিনখানা গাঁয়ের মধ্যে এমন বঢ়িয়া 'ক্ষেতি' আর কারুর ছিল না। তাতে আর আশ্চর্য কি বাবুজী! একজন লোক যদি বারো মাহিনা তিরিশ রোজ ওই ক্ষেতিতে সকাল থেকে সন্ধ্যে ইস্তক বুক দিয়ে প'ড়ে থাকে, এক কণা ঘাস বের হ'লে টেনে তুলে মাটিতে পুঁতে দেয়—যাতে ঘাসও যায় আবার জমিও হয় আরও উর্বর; তু'হাতে গঙ্গার কিনারার

দিয়ারা ক্ষেতির মাটি ঘেঁটে ঘেঁটে সামান্ত 'কঙ্কর' কি 'পাথল' থাকলে বেছে ফেলে দেয়; পথে ঘাটে এতটুকু গোবর দেখলে কুড়িয়ে এনে ওই 'ক্ষেতি'-তে ঢালে; খুরপী আর কোদালি নিয়ে হরদম জমির তরিবত করে, তবে এই ক্ষেতির সঙ্গে পাল্লা দিতে অন্য ক্ষেতি পারবে কেন? বাবুজী—দুনিয়াতে সকল মায়ের বুকেই ক্ষীর আছে, কিন্তু যে মা পেট ভ'রে খেতে পায়, ভাল মেওয়া চিজ খায় —সে মায়ের বুকের ক্ষীরের পরিমাণ আর গুণের সঙ্গে অন্য মায়ের বুকের ক্ষীরের পরিমাণ আর গুণ সমান হয়, না—হতে পারে?

একটু থামলে মাটিওয়ালা। আমার মুখের উপর দৃষ্টি তুলে মিষ্টি হাসি হেসে বললে—অকলু মুসহরের বিটী লছমনিয়া এই কথা শুনেই আমাকে ঠাট্টা ক'রে বলতো—মেওয়াখানেওয়ালী জমিনকে মালিক তুমি—তোমার জমিনমে যে ফসল হয় তার মধ্যেও মেওয়ার পোস্টাই—ওহি লিয়ে তোমার নাম দিলাম আমি মেওয়ালাল।

তখন মেওয়ালালের বয়স হবে ষোল-সতর, ফুল ধরবার আগে গঁহু কি যবের ফসল যেমন লকলকে তেজালো ঘন সবুজ হয়ে ওঠে—তেমনি তখন মেওয়ালালের চেহারা। ক্ষেতিতে খেটে খেটে আর কুস্তী ক'রে, গঙ্গাজীতে সাঁতার কেটে, গায়ের জোরও হয়েছে তেমনি। দুনিয়াতে কারুর পরোয়া করে না। কিন্তু লছমনিয়ার এই তামাসায় কেমন শরম লাগত। লছমনিয়া হেসে বলত—আরে বাপরে, গাল কপাল যে আনারের দানার মত টস্‌টসে লাল হয়ে উঠল। এ একেবারে খাস মেওয়ালাল তুমি!

লছমনিয়া মেওয়ালালের চেয়ে বয়সে বছরখানেকের বড়ই হবে। তেমনি কি তার চেহারা! দেখে মনে হ'ত পাঞ্জাব দেশের রহনেওয়ালী। এই লম্বা বাবুজী। বাঁশীর মত নাক, পাঞ্জাবী মেয়েদের মতই চোখ ছোট ছোট। গায়ের রঙ কিন্তু কালো। মেয়েটাকে মুসহররা বলত 'সাপিন্'। সাপিনের মতই লম্বা—তেমনি চোখ—চেহারাতেও যেমন—ভাগ্যের দিক থেকেও তাই;—ছেলেবেলায় বছর তিনেক বয়সে হয় শাদি, বছর না পেরুতেই বর মারা গেল; তারপর দশ বছর বয়সে হ'ল প্রথম সাগাই—বাবুজী, এক মাহিনা যেতে-না-যেতে সে স্বামীও মারা গেল, তারপর ফের সাগাই দিলে ওরে বাপ্—তখন ওর বয়স বারো। সে এক আশ্চর্য কাণ্ড—ওই সাগাইয়ে। রাত্রেই বর মারা গেল; ইয়া জোয়ান, এই ছাতি,

লোকটা হঠাৎ বললে—বুকটা কেমন করছে; ব্যস্ তারপর দু'হাতে খামচে ধরলে কনের মুখ আর কাঁধ—বার কয়েক গোঁ গোঁ ক'রে ঢলে পড়ে গেল। এর পর লছমনিয়াকে কেউ সাগাই করতে সাহস করল না। বললে—সাপিন কন্যা। মেয়েটাও বাপকে বললে—আবারও যদি সাগাইয়ের ব্যবস্থা কর, তবে আমি দরিয়ায় ঝাঁপ দেব, নয় ত জহর মানে বিষ খাব।

বাপ বলেছিল— তবে শেষে তোর হবে কি? আমি যখন মরব—তখন—

লছমনিয়া বাপের কথার মাঝখানেই বলেছিল—তুই থাম বুঢ়োয়া, মনিব বাড়ি রয়েছে, বাবু জীওনলালজীর ক্ষেতি আছে, খাটব খাব। ক্ষেতে খাটবার তাগদ গেলে জীওনবাবুর নাতি হবে পুতি হবে—ওহি লোকের খিদ্‌মদ খাটব—জীওনবাবুজীর বহুজীর সঙ্গে ঝগড়া করব আর বলব আলবৎ খেতে দিতে হবে—দাও খেতে।

এর পর থেকে জোর ক'রে সে বাপ অকলুর সঙ্গে ক্ষেতে খাটতে আসত। সমানে খেটে যেত। অকলু বসত মধ্যে মধ্যে, ক্লান্ত হলেও বসত, না হলেও বসত, মজদুরীর নিয়ম ওটা। তাগদ তোমার যতখানি ততখানি কখনও খাটবে না। খাটতে নাই। যা তোমার আয় তাই যদি তুমি খরচ ক'রে দাও তবে আর তোমার থাকবে কি? তাই মজদুরেরা ঠিক এক একটা সময় অন্তর ব'সে জিরিয়ে নেয় খানিকটা। তবে ফুরানের কাম যদি হয় তবে সে আলগ্, মানে আলাদা কথা। লছমনিয়া কিন্তু বসত না, সে খেটেই চলত উদয়াস্ত। বসতে বললে বাপকে বলত—বাবু জীওনলালের চেয়ে আমাকে কাম বেশী করতে হবে। আমি দেখিয়ে দেব কি বাবুজীর চেয়ে আমার তাগদ বেশী।

খিল খিল ক'রে হাসত সে।

মাটিওয়ালা বললে—তা' ব'লে মনে করো না বাবুজী কি মুসহর মেয়েটার মতলব ছিল কিছু। কি মেওয়ালালের মনে কোন পাপ ছিল। আমি তোমাকে স্বয়ং নারায়ণের হলপ নিয়ে বলতে পারি যে দু'জনেরই ভিতরটা তখন সূর্যের আলোর মতই পরিষ্কার ছিল, গঙ্গাজীর পানির মতই পবিত্র ছিল। আসল ব্যাপারটা ছিল কি জান? এই যে গায়ের জোরের পাল্লা দেওয়া, এটা ওদের দু'জনের সেই ছেলেবেলা থেকেই চ'লে আসছে। লছমনিয়া ছিল বয়সে বড়, মেওয়ালালের ছেলেবেলার সঙ্গী, ফল পাকড়—এটা ওটা—এই ধরো রঙীন

কাঁচের টুকরো, কি গঙ্গাজীর কিনারায় বালুর ভিতরের ঝিনুক—এই নিয়ে বহুবার শক্তির প্রতিযোগিতা হয়ে গিয়েছে, ওটা ওদের খেলা ছিল। নেহাতই খেলা।

একটু থেমে সে বোধ হয় ভেবে নিলে কিছু। তারপর আবার বললে—আর জীওনলালের তখন এ সব খেয়ালই ছিল না। দেখতে অবশ্য সেও তখন জোয়ান হয়ে উঠেছে, হাতের গুলি ফুলে উঠেছে, বুকের দু'পাশে দু'খানা যেন পাথরের চাই দেখা দিয়েছে, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের ঘাসের নতুন ডগার মত গোঁফ দেখা দিতে শুরু করেছে—কিন্তু ও খেয়াল জাগেনি। ওর এক খেয়াল ক্ষেত! ক্ষেত—ক্ষেত আর ক্ষেত। ক্ষেতে কাজ নাই তবু সে ব'সে থাকত খানিকটা মাটি হাতে নিয়ে—আপন মনেই পিষত—আর গঙ্গাজীর জলের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখত।

জীওনলালের বাপ এতে খুশি ছিল না। তার ইচ্ছে ছিল ছেলে 'লিখপঢ়া' শিখে মুন্সীর কাজ করে, আদালত কি জমিদারী কাছারী কি কোথাও কলম চালায়। কিন্তু জীওনলালের মগজ ভাল ছিল না। বাপের অনেক চেষ্টাতেও তার কিছু হয়নি, দশ বছর বয়সেই সে লেখাপড়া ছেড়েছিল—বাপও হাল ছেড়েছিল। মনে দুঃখ থাকলেও সে কথা সে বলত না কারও কাছে। তবে জীওনলাল জানত। এই কারণেই তার বাপ ইদানীং ক্ষেতের ধার দিয়েও হাঁটে না। ব'সে ব'সে তুলসীদাস পড়ে, পূজা-অর্চনা করে, ক্ষেত থেকে ছেলে ঘরে ফিরলে একবার মুখ তুলে চেয়ে একটু হাসে—দুঃখের হাসি—আবার কাজে মন দেয়।

জীওনলালও এতে দুঃখ পায়। সে বুঝতে পারে না বাপের এত আক্ষেপ কেন? কি অন্যায় সে করেছে? দুঃখ যত পায় তত তার ক্ষেতের নেশা বাড়ে। এক একদিন ঘরে ফিরে বাপের ওই হাসি দেখে আবার চ'লে যায় ক্ষেতের দিকে। রাত্রে সে অন্ধকারেই হোক আর জ্যোৎস্নাতেই হোক ব'সে থাকে ক্ষেতের মধ্যে।

বাবুজী, গঙ্গার কিনারায় আমীর জমিদার এরা ব'সে হাওয়া খায়; গঙ্গাজীর বুকে ঢেউ ওঠে, পাল তুলে দিয়ে নৌকা যায়—ব'সে ব'সে দেখে—জ্যোৎস্না রাত্রে দরিয়ার জলে ঝিকিমিকি ওঠে—তাহার বাহার দেখে একদম বিভোর হয়ে যায়। তুমিও ত আমীর লোক, তুমি নিশ্চয় দেখেছ। কিন্তু জীওনলাল ওই ক্ষেতির মধ্যে ব'সে গঙ্গাজীর যে শোভা দেখেছে তা তোমরা দেখনি। যে আরাম পেয়েছে সে তোমরা পাবে না।

তার চোখের সামনে চাঁদের আলো—দরিয়ার জল—এর সঙ্গে মিশে ভাসত

তার ক্ষেতির ফসলের শোভা। একদম দুধবরণ জ্যোৎস্নায় যখন গঙ্গাজীর পানি তার কিনারা দূর—দূর—বহুত দূর—হো-ই আকাশের কিনারাতক ঝল্‌মল করত বাবুজী, যখন লোকের মনে হ'ত ইন্দ্রদেওকে হাতী শুড় দিয়ে চাঁদের কলসী ধ'রে ধরতি মায়ীকে দুধে আস্নান করাচ্ছে, তখন জীওনলাল দেখত শুধু দুধ নয়, দুধের সঙ্গে খুব অল্প সবুজ কিছুর আমেজ যেন মিশে রয়েছে। তার ক্ষেতির ফসলের সবুজ রঙ দুনিয়ার সব কিছুর মধ্যে দেখতে পেত যেন। দেখত আর দু'হাতে মাটি ডলত। আঃ—সে যে কি মোলাম—কি মিঠা—কি ঠাণ্ডা সে তুমি বুঝবে না বাবুজী! কতদিন ওই ক্ষেতির সেই মিঠে মাটির উপর ঘুমিয়ে পড়েছে জীওনলাল। এ একটা নেশা! ওই ক্ষেতি তার ছিল স্বরগ বাবুজী! যেমনই হোক না কেন দুঃখ—ওখানে গেলেই সে দুঃখ জুড়িয়ে যেত!

বাবুজী, রতনলাল যেদিন হঠাৎ মারা গেল সেদিন জীওনলাল দুনিয়ায় একা। মা নাই, ভাই নাই, বহিন নাই—কে তাকে সান্ত্বনা দেবে? জীওনলালকে সেদিন সান্ত্বনা দিয়েছিল তার ওই ক্ষেতির মাটি। বাপের কাজকর্ম সেরে শ্মশান থেকে ফিরে সে বাড়িতে থাকতেই পারলে না, সন্ধ্যার পর এসে ওই ক্ষেতির মধ্যে ব'সে রইল। জুড়িয়ে গেল তার মন। ভুলে গেল সে বাপের কথা। জীওনলালকে মন্দ যদি বলতে চাও এ জন্য বলো, কিন্তু এ কথাটা সত্যি বাবুজী। তার চোখের সামনে ক্ষেতে গঁহুর চারা বের হ'ল, বড় হ'ল, বাতাসে দুলতে লাগল, কৌয়া এল —আরও কত পাখি এল ক্ষেতের ফসল খেতে, সে তাদের তাড়ালে, তারপর ফসল তার চোখের সামনে পেকে উঠল, অকলু, তার বিটী আর জীওনলাল সে ফসল কাটলে, লছমনিয়া মুখ টিপে হেসে বললে—গঁহু নেই, এ ত মেওয়া হ্যায়!

সেদিনের কথা আজও জীওনলালের দিব্যি মনে আছে বাবুজী! সে দিনও মাঝরাত্রে অকলু আর লছমনিয়া এরাই এসে ক্ষেত থেকে ঘরে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আরে বাপরে! আজ তোমার বাপ মারা গেল, তার আত্‌মা এখনও ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কে জানে এই ক্ষেতির চারিপাশে ঘুরছে না?

অকলু শুধু হমু পুরে গেল।—হমু! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সে চোখ বুজে ঘুমুচ্ছিল। রাত্রে সে ঘুম থেকে উঠল—চোখ বন্ধ করেই হাঁটে।

একটু থেমে একটা বিড়ি খেয়ে মেওয়ালাল বললে—বাবুজী, তুমি ত শুনেছি লিখাপঢ়ি করেছ অনেক। এই গলির লোকদের কাছে আমি শুনেছি। তোমাকে

একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। বলো ত এহি দুনিয়ামে কোন্ জিনিসকে জানা সব চেয়ে শক্ত?

প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে চুপ ক'রে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। মেওয়ালাল আমার উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই বললে—মানুষকে বাবুজী। গাছ-পালা জানোয়ার ওদের সঙ্গে সামান্য দিন কারবার করো—ঠিক জেনে যাবে ওদের। ওদের মেজাজ চালচলন সব ধরা-বাঁধা। মানুষ—আরে বাপরে বাপ! নিজেকেই নিজে জানতে পারে না—তা' পরকে জানবে কি করে? এই জানা হয় কি ক'রে—জান? জানা হয় দুঃখের সময়। তোমার যখন খুব দুঃখ হবে বাবুজী—যখন তোমার মনে হবে বুকের ভিতরটা থেকে কলিজা ছিঁড়ে গেল—তখন ঠিক তুমি দুনিয়ার মানুষকে চিনতে পারবে। নিজের মনের খবরও জানতে পারবে সেই দিন। তোমার যে শরীর বাবুজী—এই যে তোমার জনম—এই ত একটা ক্ষেতি। তোমার মন ব'সে ব'সে এতে বীজ ছড়াচ্ছে। কিন্তু বীজ মাটিতে পড়লেই ত গাছ হয় না—ফাটে না! বীজ ফাটে কখন জানো? যখন আকাশে ঘনঘটা আঁধিয়ার ক'রে মেঘ আসে, দুনিয়ার চোখ ঝলসে দিয়ে যখন বিজলী চমকায়, কড়মড় আওয়াজে যখন তিন লোক কাঁপিয়ে দেওতার বজ্জর হেঁকে ওঠে, ঝাপট মেরে ঝড় উঠে যখন সব ওলোট-পালট ক'রে দিয়ে যায়, ধরতি তখন থর থর ক রে কাঁপে—কিন্তু তখনই তার সারা বুকময় মনের আনন্দে ফাটে লাখো লাখো বীজ। যে সব বীজ বাবুজী মাহিনার পর মাহিনা মাটির অন্দরে শুকায়ে ঝলসেছে—কোন পাত্তা কেউ জানত না—ওই যে ঘনঘটা, ওই তার লগন্, ওহি লগন্‌মে তারা নিজেকে ফাটিয়ে বেরিয়ে পড়ে, নিজের পাত্তা জানিয়ে দেয়। তারপর যে বীজের যেমন তেজ,যেমন তার গোড়ায় মাটির সঙ্গে মিল—মিতালী—সে তেমনি বাড়বে।

বাবুজী—অকলু মুসহরের বিটীয়াই বলো আর জীওনলাল কি মেওয়ালালই বলো—দু'জনের কেউ না জানত নিজেকে, না জানত কেউ কাউকে। হঠাৎ একদিন তুফান এল জীওনলালের নসীবে। আর সেই তুফানকে আপনার খেয়ালে মুসহরের বিটীয়া আপনার মাথায় টেনে নিলে।

রতনলালের মৃত্যুর মাস চারেকের পর; সেটা অগহন মাহিনা বাবুজী, আমার ক্ষেতে তখন গম যব আলু মটর ছোলার বীজ একদফা ফেটে মাটির উপর বেরিয়ে পড়েছে, আশপাশের দিয়ারা জমিন তখনও সব সাদা, শুধু চষা হয়েছে মাত্র

আমার জমিনে সবুজ রঙ ফুটেছে। সারা দিন ক্ষেতে পাটকাম ক'রে আমি বাড়ি ফিরে চুলাতে আগুন দিয়েছি, দিনে খেয়েছি সত্তু, রাত্রে দু'টি ভাত পাকাব, থারিতে চাওর ভিজিয়ে দিয়েছি, কিছু আনাজ নিয়ে কুটতে বসেছি, খাওয়া-দাওয়া সকাল সকাল সেরে যেতে হবে জিমিদারের কছহারী। সেখানে বাবুজী মস্ত হাঙ্গামা।

তুমি ত বাবুজী পণ্ডিত আদমী, দেশকে কানুন ত তোমার সব জানাই আছে; বাপজী আমার ফৌত্ হয়েছে—এখন জিমিদারের দপ্তরখানায় বাপজীর নামের বদলে আমার নাম কায়েম করতে হবে; সেলামী লাগবে—কেন না, জমিনের মালেক ত জিমিদার; জিমিদার আমাকে রায়ত মেনে নেবে—সেলামী খাজনা নিয়ে আমাকে দাখিলা দেবে তবে জমিন হবে আমার। তবে জিমিদারেরা বাপের বদলে ছেলেকে রায়ত মানতে না বলে না। ভগোয়ানকে বিধান বাপের স্বভাব পায় ছেলে, চেহারা পায় ছেলে, বাপের রোগ পায় ছেলে, বাপের দেনা শোধ করে ছেলে, তখন বাপের ক্ষেত-খামার এই বা ছেলে পাবে না কেন? জিমিদারেরা এটা মানে। তবে তারা যদি ইচ্ছে করে বাবুজী তবে না মানতেও পারে। আদালত থেকে 'লুটিস' জারি ক'রে হুকুম দিয়ে তোমাকে উচ্ছেদ করতে পারে। 'ওহি লিয়ে' জিমিদারের কছহারীতে যাব, তহশীলদার এসেছেন। কিছু ঘিউ তৈরী ক'রে রেখেছি। তহশীলদারের নজরানা ভি ঠিক ক'রে রেখেছি। আজ রাত্রেই কাজটা সেরে নেব। এর আগে কয়েকবার গিয়েছি। জিমিদারের বাড়ি বিহারশরিফ—তা জিমিদার বলেছেন—হবে। তহশীলদারের সঙ্গেও দেখা সেখানে হয়েছিল, তিনি বলেছেন—হবে।

কুটনো কোটা শেষ ক'রে থালায় ভিজানো চাল ধুয়ে শেষ করেছি, এমন সময় বাবুজী আমার নসিবে তুফানের প্রথম ঝাপ্টা যেন আচমকা মারলে ধাক্কা। হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল লছমনিয়া। আমি চমকে উঠলাম। অকলুর ক'দিন বেমারী হয়েছে। বুড়ো মানুষ আগেই ঘায়েল হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে—ক'দিন। তবে কি—? আমি বললাম—লছমনিয়া!

লছমনিয়া বললে—ঝটসে এসো। আমি আস্নান ক'রে খানা পাকাচ্ছি; মুসহরের বিটী সে কথা খেয়ালেই আনলে না, আমার হাত ধ'রে টানলে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—অকলু—

—নেহি—নেহি। ক্ষেতিমে—। ক্ষেতে—আমাদের ক্ষেতে দু'জন কালা সাহেবলোক—সঙ্গে আর্দালী। সে হাঁপাতে লাগলো—ছোট চোখ দু'টো ঝক্ঝক করতে লাগলো। দম নিয়ে বললে—ক্ষেতের ফসল মাড়িয়ে তেকাঁটার উপর যন্তর চাপিয়ে দেখছে আর জরিপের শিকলি টানছে—ইধরসে উধর। হারামজাদা কুত্তার বাচ্চা আবার—।

দাঁতে দাঁতে সে কিস্‌কিস ক'রে উঠল।

বাবুজী, ওই কালা সাহেবলোকের একজন লছমনিয়াকে মন্দ কথা বলেছে। সে একে মুসহরের মেয়ে, তার উপর সে লছমনিয়া—পাঞ্জাবের রহনেওয়ালীর মত তেজ—সে উত্তরে গাল দিয়েছে। সাহেবটা হাত চেপে ধরতে গিয়েছিল, এক ঝাঁকিতে হাত ছাড়িয়ে সে ছুটে পালিয়ে এসেছে।

খবর শুনে আমার নখ থেকে মাথা পর্যন্ত রক্ত যেন বর্ষার দরিয়ার পানির মত ছুটতে আরম্ভ করলে। অমি লাফ দিয়ে পড়লাম। লছমনিয়া বললে—দাঁড়াও

সে মাচান থেকে দু'গাছা লাঠি পেড়ে নিয়ে বললে—অব চলো।

জমিনের কাছে এসে বাবুজী আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। শুধু সাহেবরা নয়—জমিদারের তহশীলদারও বরকন্দাজ নিয়ে সরজমিনে হাজির হয়ে গেছে ধমক দিয়ে এক হাঁক মারলে তহশীলদার—খবরদার! তারপর বললে—আর এক পাও যদি এগুবি চাষার বেটা, তবে তোকে গুলি ক'রে মেরে এই জমিনের মধ্যে পুতে দেব।

মেওয়ালাল এক লহমায় পাথর ব'নে গেল। লছমনিয়া বলতে গেল—হুজুর —আমাদের ক্ষেত্তের ফসল—

তহশীলদার বললে—নেহি। এ জমি এখন জমিদার সরকারের খাস জমি হয়েছে। সরকার থেকে হুকুম হয়েছে এ জমি জাহাজ কোম্পানিকে বন্দোবস্ত কিয়া যায়েগা। কোম্পানীকে হিঁয়া টিশন বনেগা।

বরকন্দাজেরা ততক্ষণে ক্ষেতের চারিদিকে খুঁটা পুঁতে দখলের লাল নিশান উড়িয়ে দিলে। একটা খুঁটাতে একটা কাগজে লেখা নুটিসও ঝুলিয়ে দিলে।

আমার নসিবের আকাশে চারিদিক ঝলসে দিয়ে বিজলী ঝলকে উঠলো— আমার তামাম দুনিয়া কাঁপিয়ে কড়্‌কড় ক'রে বাজ ডেকে উঠলো। আমার কি

হয়েছিল, আমি তখন কি করেছিলাম জানি না, লছমনিয়াই আমাকে দু'হাতে ধ'রে টেনে তুলে নিয়ে বললে—চ'লে আও!

বাবুজী, ঠিক এই সময়েই তুফানের এই শুরুতেই বোধহয় লছমনিয়ায় বুকের অন্দরে বীজ ফাটল।

বাড়িতে ফিরে আমি যত কাঁদলাম সে তত কাঁদলে। মেওয়ালালের দুঃখে সে আগেও কেঁদেছে; কিন্তু এমন ক'রে ত কাঁদেনি! শাওন, ভাদো মাসের মেঘ যেমন বরখায় বাবুজী, বাতাস না বিজলী না, আওয়াজ না, শুধু ঝির্ ঝির্ ঝিম্ ঝিম্—তেমনিভাবে, শুধু দর্‌দর ক'রে জলই ঝরে পড়ল তার চোখ থেকে, সারা রাত।

গঙ্গাজীর বুকের উপর দিয়ে কলের জাহাজ চালায় যে সব কোম্পানি, তাদেরই এক কোম্পানির জাহাজ চলত আমাদের গাঁওয়ের সামনে দিয়ে। আমাদের গাঁওয়ের দেড় কোশ উপরে ছিল জাহাজ কোম্পানির টিশন ঘাট। ওই টিশন ঘাট আজ কয়েক বছর—বোধহয় পাঁচ ছ' বছর ধ'রে ভাঙতে শুরু করেছে। কোম্পানি বাঁশ কাঠ ইট পাথর বহুত ঢেলে রুখতে চেষ্টা করেছে, গঙ্গাজীর জলের তোড়ের মুখে। কিন্তু হাওয়ার মুখে খড়ের কুটোর মত সে সব ভেসে গিয়েছে। বর্ষার সময়—পনের রোজ, বিশ রোজ বাদ এক একদিন চাঙড় ধ্বসে পড়েছে। এমনিভাবে প্রতি বছরই খানিকটা স'রে স'রে শেষ পর্যন্ত এ বছর টিশন ঘাট সরিয়ে ফেলার মতলবই পাকা করেছে কোম্পানি। এর জন্যে এই বছরে বর্ষার সময় কোম্পানির বড়া-ভারী মগজওলা সাহেবলোক—হর রোজ জাহাজে ক'রে গিয়েছে আর এসেছে। দেখে গিয়েছে, কোন্ জায়গায় নতুন টিশন বানালে পর নিশ্চিন্ত হতে পারবে। এদিকে গঙ্গাজীর কিনারের গাঁওয়ের যত জিমিদার, কোম্পানির সাহেবলোককে বহুত বহুত ভেট পাঠিয়ে, জাহাজের খানা-টেবিলে খানা খাইয়ে, দামী দামী বিলাইতি মদ খাইয়ে, আপন আপন সীমানায় টিশন বানাতে রাজী করবার কোশিস অর্থাৎ চেষ্টা করেছে। শেষ পর্যন্ত জিত হয়েছে মেওয়ালালের জিমিদারের। নসিব, সবই নসিব। মেওয়ালাল এই সার বুঝেছে। নইলে ঠিক যখন টিশন বসাবার উদ্যোগ হচ্ছে—তখনই মেওয়ালালের বাপ ম'রে গিয়ে—একদম

কিনারার পাঁচ বিঘা দিয়ারা—তার খাস হয়ে যাবার সুযোগ হবে কেন বল ? এই জন্যেই এতদিন তারা জমিনটা জীওনলালের নামে পত্তন ক'রে নেয়নি !

দুনিয়া আমার আঁধার হয়ে গেল বাবুজী। ছেলের মা ম'রে গেলে যেমন হয় ঠিক তেমনি। মেওয়ালাল ওই দুঃখটা জানত, ছেলে বয়সে যখন মা তার মারা গেল—তখন ঘরদোর খেলনা-খাওয়া—সব কেমন বিস্বাদ বেরঙ হয়ে গিয়েছিল। কিছু ভাল লাগত না, শুধুই কান্না পেত। আঠার বছরের মেওয়ালালের আবার সেই হাল ফিরে এল। তার জমি—সকাল থেকে সন্ধ্যে ইস্তক যে জমিতে সে ব'সে থেকেছে, ব'সে থেকেছে, ব'সে থেকেছে ; শুধু ইটের টুকরো—পাথরের কুচি বেছে ফেলেছে, কোদাল দিয়ে একবার কেটেছে—আবার কেটেছে, বারবার কেটেছে, মুঠোতে ধ'রে ভুর ভুর ক'রে গুঁড়ো করেছে ;—আঃ বাবুজী, মেওয়ালালের সে স্বর্গ, দুঃখ ভুলবার জায়গা ; বাপ ম'রে গেলে সেখানে গিয়ে ব'সে থেকে সে সান্ত্বনা পেয়েছে, বাবুজী খুব যখন 'শির দুখিয়েছে' মাথার যন্ত্রণায় যখন অস্থির হয়েছে সে—তখন— ।

উপরের দিকে হাত তুলে মাটিওয়ালা বললে—সূরুয নারায়ণের নাম নিয়ে বলছি বাবু—ঝুট বলছি না। মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে মেওয়ালাল ওখানে গিয়ে বসলে—যন্ত্রণার উপশম হ'ত। গঙ্গাজীর হাওয়া ত বটেই কিন্তু তার ক্ষেতের শোভায় চোখ মন তার জুড়িয়ে যেত। ব'সে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়ত সে। ঘুম ভেঙ্গে যখন উঠত—তখন বিশ্বাস করো বাবুজী—মাথার যন্ত্রণা এতটুকু আর থাকত না।

সেই জমি হারিয়ে সে কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে গেল। সমস্ত রাত্রি তার থেকে একটু দূরে ব'সে রইল ওই মুসহরের সাপিন-কন্যা। সেও কাঁদলে অনেক। মধ্যে মধ্যে অনেক সান্ত্বনা দিলে সে। বললে—এমনি ছাড়বে কেন জমিন ? আদালত করো। বলো হাকিমকে—হুজুর, এই জমিন কত কষ্ট ক'রে তোমরা হাঁসিল করেছ। বিলকুল কথা ব'লে—বলো—অব হুজুর বিচার কিজিয়ে—ইয়ে জমিন কিস্‌কা হ্যায় ?

বাবুজী, আমি হাসলাম, কাঁদতে কাঁদতেই হাসলাম। মুসহরের বিটীয়ার কথা শুনে। কি ক'রে জানবে সে কানুনের প্যাঁচ ! ভগোয়ান করলে ধরতির সৃষ্টি, রাজা হাতি ঘোড়া হাতিয়ার পল্টন নিয়ে সেই ধরতির মালিক হ'ল। সে আবার

সেই মাটি দিলে জিমিদারকে। এখন বাপের দাদার রোগই তোমাকে বইতে হোক—আর দেনাই শোধ করতে হোক—আর বাপের চেহারাই তোমার মধ্যে দেখা যাক, তার সঙ্গে মাটির মালিকানির সম্পর্ক কি? রাজার হাতিয়ারে ওখানে বাপ বেটার সম্বন্ধ খচাখচ কেটে দিয়েছে। ও কানুন আলাদা। মুনহুরের মেয়ে সে কানুন তুই বুঝবি না।

লছমনিয়া ভোরবেলা উঠে চ'লে গেল। সমস্তটা দিন এল না। মেওয়ালাল গিয়ে হত্যা দিয়ে প'ড়ে রইল তহশীলদারের কাছারীতে। কিন্তু মিথ্যে প'ড়ে থাকা। ফিরে আসতে হ'ল অনেক গালিগালাজ খেয়ে—বেওকুব! মুরুখ! মুন্সীকে বেটা চাষা! উল্লু কাঁহাকা! আমি কি করব? তুই এতদিন ফেলে রাখলি কেন?

সন্ধ্যায় লছমনিয়া ফিরে এসে বললে—জোড়ো মামলা। জুড়তেই হবে। আমি গিয়েছিলাম কোশভর দূরের গ্রামের এক বুড়া মুকতিয়ারের মুন্সী সাহেবের বাড়ি। সব বলেছি তাঁকে—তিনি বলেছেন আলবৎ জিত হবে।

তাই করলাম। না ক'রেই বা করি কি? মনের ভেতরটা যে খাক হয়ে যাচ্ছিল। আগুন লেগে গিয়েছিল। চোখের ঘুম গিয়েছে সে আগুনে পুড়ে, পেটের খিদে গিয়েছে ছাই হয়ে তাতেই, মনে হ'ত এই আগুন লাগিয়ে দিই জিমিদারের কছহারীতে, তহশীলদারের ঘরে, জিমিদারের পাকা বাড়িতে, জাহাজ কোম্পানির জাহাজে—তামাম দুনিয়ায় আগুন লাগাতে ইচ্ছে করে; কিন্তু তা ত পারি না। কাজেই একটা কিছু ক'রে এ আগুনের দাহ থেকে বাঁচতে হবে। বাড়ির যা ছিল রূপার গহনা বিক্রি করলাম, দায়ের করলাম মামলা।

ওদিকে কোম্পানি এসে আমার ক্ষেতের উপর টিশন তৈয়ারি করবার মাল-মসলা এনে ফেললে। জাহাজের পিছনে বেঁধে টেনে নিয়ে এল একটা একটা টিশন, সেটাকে আমার ক্ষেতের কাছে এনে, ক্ষেতটা কেটে ফেলতে শুরু করলে। নিয়ে এল একটা যন্তর। শিকল দিয়ে বেঁধে নিচে ফেলে দেয়, রাক্ষসের মত হাঁ ক'রে—তেমনি ধারালো লোহার দাঁত নিয়ে নদীর কিনারায় প'ড়ে একেবারে ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি গিলে—হাঁ বন্ধ করে উঠে আসে, ফেলে দেয় পাড়ের উপর। কিনারা গভীর হতে লাগল। ওইখানে এনে লাগাবে ভাসা টিশনটাকে। উপরের জমিন থেকে ফেলে দেবে একটা কাঠের তৈয়ারী সড়কের মত লম্বা সাঁকো। পাড়ের উপরে পাকা ভিত ক'রে তার উপর টিন লাগিয়ে বানাতে শুরু করলে মুসাফেরখানা

আর পুঁতলে মাস্তলের মত লম্বা চার-চারটে শালের লকড়ি, তার মাথায় কপিকল দিয়ে ঝুলিয়ে দিলে মস্ত মস্ত আলো। কিনারা থেকে আধা দরিয়া পর্যন্ত আলো ঝলমল করতে লাগল দিনের মত, সেগুলোকে ঘিরে উড়তে লাগল ঝাঁকে ঝাঁকে পোকা। সিধা সড়কের মত রাস্তা বানিয়ে দিলে কোম্পানি, গঙ্গাজীর কিনারা থেকে গাঁওয়ের ভিতর হয়ে নিয়ে গিয়ে জুড়ে দিলে সরকারী পাকা সড়কের সঙ্গে। কোথা থেকে—কোথা থেকে আসতে লাগল হরেক হরেক চিজের দোকানী। বাবুজী, গাঁওকে বানিয়ে দিলে তিন-চার মাহিনার অন্দরে ছোটাসে একটা গোলাগঞ্জ। গাঁওয়ের আদমীর মুখ বেড়ে গেল, যাদের জমি ছিল দিয়ারায়, তারা দাম পেলে কোম্পানির কাছে। তাদের ত বাপ ফৌত্ হয়নি বাবুজী! তারা ব্যবসা শুরু ক'রে দিলে। অন্য অন্য লোক আনাজ নিয়ে চেপে ব'সে রইল, বিক্রি করতে যেতে হবে না গাঁওয়ের বাইরে। যারা গতরে খাটে, তারা খাটতে লাগল কোম্পানির কারবারে, ইমারতে। বাবুজী মুসহরটুলির পর্যন্ত হাত ফিরে গেল। গায়ে নীল কুর্তা চড়িয়ে মাথায় পাগড়ী বেঁধে তারা হ'ল কুলী। মুসহরদের সর্দার জগন্নুর বেটাকে সাহেব ডেকে কাম দিলে, বানিয়ে দিলে মেট, জগন্নুকে বানালে সর্দার।

শুধু এক মেওয়ালাল—হতভাগা মেওয়ালাল ফকির ব'নে গেল একদিনে। বাবুজী, রাত্রি হ'লে ঘরে থাকতে পারত না সে, বেরিয়ে পড়ত বাড়ি থেকে—গাঁও ছেড়ে দূরে চ'লে যেত গঙ্গাজীর কিনারায় কিনারায়, সেখানে ছিল জঙ্গলের মধ্যে একটা পুরানোকালের পোড়ো ভাঙা ইমারত, কোন্ রাজার নাকি বাড়ি ছিল, একঠো ছোটাসে গড় ভি ছিল, সে সব ভেঙ্গে গিয়েছে—জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছে, সেখানে লোকে কেউ যায় না, বলে পিরেতলোক ওখানে বাস করে, ওখানকার ভাঙ্গা ইমারত পাহারা দেয়, ওখানকার একটা পত্থলের টুকরো যে সরায় তার মুখে লহু উঠে সে মরে যায়; পাছে পায়ে লেগে একটা পত্থল স'রে যায় এক অঙ্গুলি—তাই লোকে যায় না সেখানে; যায় শুধু একদিন—গঙ্গাজীর পূজার দিন সেখানে যায়, সেখানে আছেন গঙ্গাজীর একদম কিনারায় পত্থলের এক-পাঁচিলের মত এক বেদী, সেই বেদীর গায়ে আছেন এক মহাদেওজী, গঙ্গাধর মহাদেও, যিনি নাকি মাথার জটায় ধ'রে আছেন গঙ্গামায়ীকে—সেই ভগোয়ান শিওজীকে পূজা দিতে। পূজা দিতে হয় বাবুজী—ফুল—বেলের পাত্তা—ফলমূল—আর চাপাতে হয় বাবা

মহাদেওজীর পায়ের তলায় জনা হি এক ঝুড়ি গঙ্গাজীর মাটি। সারা বরিষের অন্দরে—আর কোন আদমীর ওখানে যাবার একৃতিয়ার নাই! মেওয়ালালের বুকে আগুন জ্বলে বাবুজী, দুনিয়ায় তার শান্তি নাই, সে ত জানের পরোয়া করে না;—সে গাঁওয়ের ওই আলো ওই বাজারের হাসিহল্লা সইতে না পেরে চ'লে যেত সেখানে। মরণ হয়তো হোক। বিশ্বাস করো বাবুজী, সে বাউরা আদমীর মত ওই গঙ্গাধরজীর আস্তানে—বুক চাপড়ে চাপড়ে কেঁদে বেড়াত—চিৎকার ক'রে কাঁদত।

—হে গঙ্গাধরজী—মেরে জমিন! হে মহাদেওজী—মেরে ক্ষেত! হে দেওতা, মেরে জমিন!—এক এক সময় শুধুই চীৎকার করত—হে ভগোয়ান! হে ভগোয়ান! হে ভগোয়ান!

তার কান্না শুনে গঙ্গার বুকে নৌকার মাঝিরা ভাবত পিরেত কাঁদছে। তার কান্নার আওয়াজে চমকে শেয়ালেরা ছুটে পালিয়ে যেত পাশ দিয়ে, হুড়ার চ'লে যেত গোঁ গোঁ শব্দ ক'রে, মধ্যে মধ্যে আঁধারের মধ্যে দূরে দাঁড়িয়ে দেখত, তাদের চোখগুলো জ্বলত জ্বল জ্বল ক'রে; বুনো বরাগুলো চরের মাটি খুঁড়ে কন্দ্ খেতে খেতে চমকে উঠত, তীরের মত ছুটে চ'লে যেত জঙ্গলের মধ্যে। মেওয়ালাল গ্রাহ্যই করত না সে সব। সে তখন সত্যিই পাগল হয়ে যেত।

মেওয়ালালজী! বাবু মেওয়ালাল!

এক মুসহরের বিটী লছমনিয়া জানত তার এই ঠিকানা—তার কলিজার অন্দরের এই হাল। মেওয়ালালের ক্ষেত-খামার চ'লে গেছে, মেওয়ালালের ঘরের যা কিছু ছিল সে সবও গেছে, এখন লছমনিয়া অন্যত্র চাকরি করে। গোটা গাঁওয়ের লোক কাম করছে জাহাজ কোম্পানির কারবারে, শুধু মুসহরের বিটী ও পথে হাঁটে না, সে চাকরানীর কাম নিয়েছে ভিন গাঁওয়ে, সেই বুঢ়া মুকতিয়ারের মুন্সীবাবুর বাড়ীতে; সকালে উঠে চ'লে যায়, ফেরে রাত্রে। ফিরে মেওয়ালালের বাড়ি এসে খবর দেয় মামলার। বুঢ়া মুকতিয়ারের মুন্সী মামলার ভার নিয়েছে; সে নিজে তদ্বির করে; ওই যে জিমিদার ওর উপর মুকতিয়ারের মুন্সী বুঢ়ার ভারী আক্রোশ, মুকতিয়ারের কেনা এক জমিন মেওয়ালালের জমিনের মতই জিমিদার কেড়ে নিয়েছে কিছুদিন আগে; মুকতিয়ারের মুন্সী বলে—জিমিদারের জিভ আমি নিকালকে ছোড়বে। লছমনিয়া ফেরে সেই সব আশার কথা নিয়ে।

মেওয়ালালকে বাড়িতে পেলে বলে সেই সব কথা। না পেলে—গঙ্গার কিনারায় কিনারায় চ'লে আসে একা পিরেতের মত; মুসহরের বিটীর ভয় নাই, এক ডাণ্ডা হাতে চ'লে এসে ওই গঙ্গাধরজীর জঙ্গলে ভাঙ্গা গড়ের দেওয়ালের উপর দাঁড়িয়ে ডাকে—মেওয়ালালজী! বাবু মেওয়ালাল!

মেওয়ালালের কানে ওর আওয়াজ এলে সে খানিকটা ঠাণ্ডা হয়। মেওয়া-লালের মনে হয় ওই লছমনিয়া যদি দিন-রাত ব'সে থাকে তার পাশে, তবে তার বুকের এই দাহ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু বলতে পারে না সে কথা! লছমনিয়ার আওয়াজ শুনে সে এগিয়ে এসে সাড়া দেয়—লছমনিয়া!

—বাবু মেওয়ালাল। ছি মেওয়ালালজী! তোমাকে কত বারণ করি, তবু তুমি এসেছ এখানে? হররোজ আসছ আমার কথা শুনছ না তুমি? বাবু সাব—এখানে—।

মেওয়ালাল হাউ হাউ ক'রে কাঁদে! লছমনিয়া তার হাত ধ'রে টেনে পাথরের দেওয়ালের উপর বসায়; নিজের আঁচলখানা মেওয়ালালের হাতে দিয়ে বলে—নাও চোখ মোছো। তারপর বলতে শুরু করে মুকতিয়ারের মুন্সীবাবুর কথা। মেওয়ালালকে উঠিয়ে বাড়ি ফেরার কথা ভুলে যায়। বলে—মুকতিয়ার বলে, দেখে লেঙ্গে জিমিদারকে। পিচাশ, ঘড়িয়াল! এত বড় হাঁ মেলে দুনিয়ার রায়তের যথাসর্বস্ব পেটে পুরেও খিদে মেটে না। এবার আমি একটা লোহার শিক তাতিয়ে ওর মুখে পুরে দেব। পুড়িয়ে খাক ক'রে দোব ওর পেট। খিদে ওর খতম ক'রে দোব।

আইনকানুনের কথা মুসহরের বিটী বুঝতে পারে না, সে-সব বলতে পারে না লছমনিয়া। বলে—তোমাকে একদফে যেতে বলেছে বাবুজী!

মেওয়ালাল মুরুখ হলেও মুন্সীর বেটা, সে কানুন বুঝতে পারে কিছু কিছু। দিয়ারা জমির অবস্থা—রায়তি জমির চেয়েও খারাপ। ওর বন্দোবস্তি রায়তি জমির মত—ঐটুকু শক্তও নয়। আর আশা ছিল না। তবে মুকতিয়ারের মুন্সী বলে দেশের হাল নাকি অনেক বদল হয়েছে। হোক না দিয়ারা জমিন। তিন পুরুষ তোরা এই জমিন ভোগ করছিস্, এইটাই হ'ল বড় কথা।

এমন এমন কথা বলে মুকতিয়ারের মুন্সীবাবু যে, মেওয়ালালের ঠাণ্ডা রক্ত চন্‌চন ক'রে ওঠে। তার আশা হয়। নতুন কিছু বেচে আবার টাকা সংগ্রহ ক'রে মুকতিয়ারের মুন্সীর হাতে এনে দেয়।

সেদিন লছমনিয়া মেওয়ালালের হাতে ঝাঁকি দিয়ে বললে—মামলা ফতে হো গেয়া বাবুজী—মেরে মেওয়ালালজী—!

—ফতে হো গেয়া! চিৎকার ক'রে উঠল মেওয়ালাল। ও—হো! হো—হো! হায়! হায়! গঙ্গাজীর বুকের উপর যাচ্ছিল একটা কেরায়া নৌকা, তার উপরে কারা কেঁদে উঠল! বোধ হয় যাত্রীরা ভয় পেয়েছিল! ভাঙা গড়ের পিরেতের কথা ক'দিন থেকে চারিদিকে খুব জোর ছড়িয়ে পড়েছে।

ওদের ভয়ের কান্না শুনে খিল্‌খিল ক'রে হেসে উঠল মুসহরের বিটী। পাঞ্জাবের রহনেওয়ালীর মত চেহারা লছমনিয়ার গলার আওয়াজ তুমি শোননি বাবুজী,—শুনলে বুঝতে পারতে! আঁধিয়ার যেন নেচে উঠল সে হাসির সঙ্গে।

সে বললে—জিমিদারের তহশীলদার আজ নিজে এসেছিল মুন্সীজীর বাড়ি। মামলা যদি আমাদের ফতে না হবে মেওয়ালালজী, তবে তহশীলদার এতটা পথ ভেঙে মুন্সীর বাড়ি আসবে কেন? সে নাচতে শুরু ক'রে দিলে! সেই আঁধিয়ার রাত, কালো লছমনিয়া, মুসহরেরা তাকে বলে সাপিন-কন্যা, বাবুজী, আমার আঁখের উপর আজও ভাসছে সে নাচন—সে আঁধিয়ার—; বাবুজী, আমিও নাচতে লাগলাম। চিৎকার করলাম কত। লছমনিয়া খিল্‌খিল ক'রে হাসলে।

হঠাৎ কিনারা আলোয় ভেসে গেল! জাহাজ আসছিল! আমরা দু'জনে একেবারে জঙ্গলে-ভরা পাথরের যে মহাদেওজীর আস্তান তার পিছনে গিয়ে ঢুকলাম। ওখানে ঢুকতে মানা আছে বাবুজী। মহাদেওজীর 'ভূত-পিচাশেরা' সেখানটা পাহারা দেয়। কিন্তু বাবুজী, মহাদেওজীর মন্দিরের চূড়ার উপরেও বীজ ফেটে গাছ গজায়, বীজ যে তখন ফেটেছে ওদের বুকের মধ্যে এবং তাহার কেন সে মানা! এইখানে সেই ভূত-পিরেতে ভরা ঘন জঙ্গলের মধ্যে সে মেওয়ালালের হাত চেপে ধ'রে হঠাৎ খুব চাপাগলায় বললে—মেওয়ালালজী!

গাছের ফাঁকে ফাঁকে আলোর ছোট একটা টুকরো ছটা তার মুখের উপর পড়েছিল। সে মুখের চেহারা দেখে মেওয়ালালের দিশা হারিয়ে গেল, সে যা করলে বাবুজী—তা তার করা উচিত হয়নি, সে বাবুজী—পাগল হয়ে গেল বোধ হয়, সে লছমনিয়াকে টেনে বুকে জড়িয়ে ধরলে। মুখে শুধু একটি কথা সে বলতে পারলে—পিয়ারী!

অদ্ভুত বাবুজী মেয়ে জাত! লছমনিয়া কথা বললে না—বর্তা বললে না, কাঁদতে লাগল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

সারারাত কেটে গেল। সকাল হয়ে গেল। সুরুয নারায়ণের ছটা ঝলক দিয়ে উঠল সামনে পুরব দিকে। চোখে আলো লেগে জেগে মেওয়ালাল দেখলে লছমনিয়া নাই। সে ভয় পেলে। ভূত-পিরেতের এই আস্তানায় কি হ'ল তার? 'দানা কি দইত' তুলে নিয়ে গেল নাকি?

—মেওয়ালাল! কোথা থেকে ডাকলে লছমনিয়া।

—লছমনিয়া!

দেখো তাজ্জব—চ'লে আও! মাটির ভিতর থেকে আওয়াজ আসছে—লছমনিয়ার।

—কাঁহা—কোথায় তুই?

সামনে দেখো একটা সুড়ঙ্গ, নেমে এসো—

—সুড়ঙ্গ?

সত্যই সুড়ঙ্গ, একখানা পাথর আধখানা হয়ে ভেঙ্গে গিয়েছে; একটা প্রকাণ্ড বটগাছের মোটা ঝুরি—পাথর ফাটিয়ে নেমে গিয়েছে নিচে; অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লছমনিয়া। সুড়ঙ্গ অন্ধকার নয়—স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে লছমনিয়াকে। সে বললে—নেমে এসো বটের ঝুরি ধ'রে।

তাজ্জবই বটে বাবুজী! একটা ফাঁপা সুড়ঙ্গ, জলে কাদায় থিক্-থিক্ করছে; সামনে এক পাথরের দেওয়াল, তা থেকে একটা পাথর আধখানা খ'সে ঝুলছে, সেই ফাঁক দিয়ে আলো এসে লছমনিয়ার উপর পড়েছে। লছমনিয়া দেখালে আঙুল দিয়ে—দেখো।

দেখলাম, সুরুয নারায়ণের আলোর ছটা বাজিয়ে ঝকমক ক'রে বয়ে চলেছে দরিয়ার পানি।

মুসহরের বিটীর চোখও ঝকমক করছে—সে বললে, ভাল ক'রে খুঁজতে হবে, এখানে অনেক টাকা আছে।

মেওয়ালাল শিউরে উঠে বললে—টাকায় কাজ নাই লছমনিয়া, টাকা থাকলেই সেখানে হয় থাকবে অজগর, নয় থাকবে যক্ষ।

সে বললে—যেই থাক—আগে থাকব আমি। আমি ওকে পাকড়াব—তুমি

মারবে মাথায় ডাণ্ডা! তার আগে দেওয়ালের এই আধভাঙ্গা পাথলটাকে ভেঙ্গে, ফেলে দিতে হবে। আলো চাই।

সেই দিন রাত্রেই সে এল দুই গাঁইতিয়া কাঁধে নিয়ে। মেওয়ালালের হাতে একটা দিয়ে বললে—পাকড়ো।

কিন্তু রাত্রের আঁধিয়ারে কাম হয় না। সুড়ঙ্গের অন্ধকারে আলো দপ্ ক'রে নিভে যায়। মুকতিয়ারের মুন্সীর বাড়ির কাম সে ছেড়ে দিলে। ভোরবেলা থেকে পথলে গাঁইতিয়া চলতে শুরু হ'ল। বাপরে—সে কি শব্দ! যেন কামান দাগার শব্দ। কিন্তু আশ্চর্য, সুড়ঙ্গের বাইরে কিছু শোনা যায় না। দশ দিনে খ'সে পড়ল এক পথল, আর একটার আধখানা সরল। সেই আলোতে লছমনিয়া খুঁজতে শুরু করলে—কোথায় টাকা! কিন্তু কোথায় টাকা? শুধু হিম হয়ে যেতে লাগল সর্বাঙ্গ! ওদিকে ভিতরের জল দিন দিন বাড়ছে! বর্ষা শুরু হয়েছে। সর্বাঙ্গে কাদা মেখে উঠে এসে শেষে একদিন লছমনিয়া বললে—নসিব মেওয়ালালজী! মিলল না! চলো ঘর!

গঙ্গায় নেমে আস্নান ক'রে দু'জনে দু'পথে ফিরলাম। গঙ্গায় সেদিন বান ডেকেছে—পাথরের দেওয়ালের ভিতে এসে ঠেকেছে লাল জল, ফেনা—খড়-কুটো।

বাড়ি এসে সবে পৌচেছি বাবুজী—দেখি আদালতকে পিয়াদা এক লুটিস হাতে দাঁড়িয়ে।--কি? কিসের লুটিস? বুকটা ধড়াস ক'রে উঠল বাবুজী!

পিয়াদা বললে—রতনলালের বেটা জীওনলালের এই বাড়ি কোরক্ হ'ল।

—কোরক্? কেন?

—মামলা করেছিল জিমিদারের সঙ্গে। মামলায় হেরে গেছে। তারই খরচার দায়ে কোরক্ করছে—মামলার আগে কোরক্, কেঁও কি—ওর ত আর কিছু নাই, বিক্রি ক'রে পালিয়ে পাছে ফাঁকি দেয়—তাই আদালত এই হুকুম দিয়েছে।

—মামলায় হেরে গিয়েছে জীওনলাল?

হেসে পিয়াদা বললে--উজবুকেরা এমনি করেই হারে। সে ত দশরোজ আগে রায় হয়ে গিয়েছে। মুকতিয়ারের বুঢ়া মুন্সীর সঙ্গে জিমিদারের আপোস হ'ল—ওর কোন্ জমিন জিমিদার নিয়েছিল—ফিরে দিলে—ব্যস্—মুন্সীবুঢ়া একদম গায়েব করলে নিজেকে, উকিল পেলে না টাকা, মামলা হ'ল জিমিদারের মায় খরচা ডিক্রি।

খুব একচোট হাসলে পিয়াদা—হা-হা ক'রে—

জীওনলালও হাসলে—হা-হা-হা-হা ক'রে ওরই সঙ্গে।

ব্যস্—একদম মগজ বিগড়ে গেল! জঙ্গলে ব'সে দিনরাত হাসতে লাগল। হা-হা-হা হা! লছমনিয়া মুসহরকে বিটী ডাকলেও সাড়া দেয় না।

লছমনিয়া সেদিন ওর হাত ধ'রে টানতে শুরু করলে—বললে, হেসো না। এসো। চোখ তার ঝক্‌মক করছে। মুখখানা হয়ে উঠেছে কি এক রকম!

ঝাঁকি খেয়ে মেওয়ালালের খানিকটা সংবিৎ ফিরল—বললে—কি?

—দেখো। আও হামরা সাথ।

বাবুজী, ওই যে সুড়ঙ্গের মুখ—ওই মুখের কাছে এনে—দেখালে, ভিতরটায় জল থৈ থৈ করছে। শব্দ উঠছে হুড়-হুড়—হুড়-হুড়! ওই পাঁচিলের পাথর সরেছে—তারই ভিতর দিয়ে ঢুকেছে দরিয়ার তুফান।

তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। আকাশে মেঘ করছে থম্‌থম, ছাইয়ের মত রঙ। ঝিক্‌মিক ক'রে বিজলী চমকাচ্ছে। মেঘ ডাকছে বাবুজী গুম্-গুম্ ক'রে—যেন পুলের উপর দিয়ে চলেছে ডাকগাড়ি তুফান মেল। দরিয়া তখন চল্‌কে চল্‌কে উঠছে ঢেউয়ে ঢেউয়ে। মেঘের বিজলীর ইসারায় যেন চম্‌কে চম্‌কে উঠছে। মধ্যে মধ্যে উথলে ফেঁপে উঠছে—চল্‌কে পড়ছে যেন। এক এক সময় শব্দ উঠছে—প্রচণ্ড শব্দ! মাটি ধ্বসছে; পাড় ভাঙ্গছে দরিয়া।

সারাটা রাত দু'জনে ব'সে রইলাম সেই গর্তের ভিতর মুখ রেখে। দেখতে কিছু পাই না—শুধু শব্দ শুনি হড়—হড়—হড়—হড়!

ভোর রাত তখন বাবুজী। ঘুমিয়ে পড়েছিল দু'জনে ওই বর্ষার মধ্যেই বটগাছের তলায়। দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধ'রে ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ যেন একটা প্রলয়ের মত আওয়াজ—মনে হ'ল আকাশের মেঘ ভেঙ্গে বোধ হয় নেমে আসছে। চমকে উঠে বসল দু'জনে! মেঘ নয় বাবুজী—ওই গঙ্গাধর মহাদেওজীর পাথরের বেদী—ওর পাঁচিলটা। লছমনিয়া আমাকে জোরে ঝাঁকি দিয়ে টানলে—বললে, জলদি জলদি—ওঠো—গাছের উপর উঠে পড়ো।

গাছের উপর উঠে দেখলাম, তুফানের জলে ভ'রে গেল ওই পুরানো গড়টা, গোটা দরিয়ার বাঁকা মুখ যেন ঘুরে সোজা হয়ে গেল, জল ছুটল তীরের মত। আরে বাপ্‌রে—সে কি জল,—সে কত জল—বাসুকি নাগ যেন লাখো ফণা তুলে

ছোবল মারতে মারতে এগিয়ে চলল—গাঁওয়ের মুখে। ভেসে যাবে গাঁও!—হে ভগোয়ান!

নেহি। চিৎকার ক'রে উঠল লছমনিয়া।—এ ধারে দেখো। হেসে উঠল সে। দেখি ওই পাঁচিল ভেঙে গঙ্গাজীর মুখ ঘুরে গিয়ে জাহাজের টিশনঘাট প'ড়ে গেছে মাঝ দরিয়ায়, আলোর খুঁটিগুলো উপড়ে পড়েছে, মুসাফেরখানার টিনের চালাটা ভেসে যাচ্ছে, ওই যে লোহার জবরদস্ত ভাসা টিশন—তার মোটা শিকল ছিঁড়ে পাক খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে ভেসে চলেছে—কোথায় চলেছে কে জানে!

আমিও এবার হা-হা ক'রে হেসে উঠলাম। আমরা দু'জনে নাচতে লাগলাম ওই বটগাছের ডালে—ভূত আর প্রেতিনীর মত।—

তিন দিন পর পুলিসের নৌকা এসে আমাদের গিরিপতার করলে। আমাদের কাণ্ড জানাজানি হয়ে গেছে বাবুজী! জাহাজ কোম্পানির কলের নৌকা তদন্ত করতে এসে দেখেছে আমাদের, দেখে গেছে ভাঙা পাঁচিল। তার আগেও নাকি আমাদের দেখেছে জাহাজী আলোয়। গঙ্গাধরজীর আস্তানের মুখে মস্ত বাঁক, ওই যে পাথরের পাঁচিল, ওতেই পানি ধাক্কা খেয়ে ঘুরে চলত, পাঁচিলের নিচে একটা চড়া পড়েছিল—পাতলা চড়া, বর্ষা ছাড়া জল ওখানে থাকত না, কিন্তু বর্ষার সময় জল চড়া থেকে পাঁচিলের গায়ে এসে ঠেকত; তখন কোম্পানি চড়ার সীমানা বরাবর পুঁতে দিত খুঁটির নিশানা—সেই নিশানাকে পাশে রেখে জাহাজকে চলতে হ'ত হুঁশিয়ারির সঙ্গে—না হ'লে জাহাজের তলা ঠেকে বেধে যাবে ওই চড়ায়। রাত্রে জোর আলো সামনে ফেলে সারং নিজে দাঁড়িয়ে দেখত জাহাজ ঠিক নিশানাকে পাশে রেখে চলেছে কিনা। বাঁকের মুখে আলোটা এসে বরাবর এসে পড়ত ওই ভাঙা গড়ের জঙ্গলে, সেই আলোয় সারং আমাদের কয়েকদিনই দেখেছিল, খালাসী লোকও দেখেছিল, তারা ভয়ও পেয়েছিল—পিরেত কি দানা-দৈত্যের খেলা। সারং দূরবীন ক'যে আমাদের চিনে হেসেছিল। ভেবেছিল—। যা ভাবে বাবুজী মানুষ—তাই ভেবেছিল। ভাবতে পারেনি—এক জোয়ান আর এক জোয়ানী—দু'জনে এই নিরালা ঠাঁইয়ে এসে গাঁইতিয়া চালিয়ে মহাদেওজীর বেদীর পাথর খসাচ্ছে। তাছাড়া ওই মহাদেওজীর পাথরের বেদী ও পুরানো পাঁচিলের যে এত দাম তাও বুঝতে পারেনি। কোন দিন কেউ ভাবতে পারেনি যে, পাথরের পাঁচিলের পিছনে আছে এমন সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গটা নাকি এ-মাথা থেকে

ও-মাথা পর্যন্ত সিধা টানা ছিল আগে। এত সব যদি কোম্পানি জানত বাবুজী, তবে ওরা হুঁশিয়ার হয়ে যেত। তা'হলে বন্দুক নিয়ে সান্ত্রী বসিয়ে রাখত বাবুজী। নিজে থেকে ওরা ওই পাঁচিলকে মেরামত করত। বড়া-বড়া লালমুখ সাহেব-লোক এসে দেখলে! ওহি যে কালাসাহেব—যে নাকি এসেছিল জরিপ করতে, টিশনের জায়গা দেখতে বাবুজী—ওর নোকরি ওহি কসুর লিয়ে এক কলমমে খতম হয়ে গেল।

আমাদের দু'জনের মেয়াদ হয়ে গেল। বড়া আদালতে জুরী নিয়ে বিচার হ'ল বাবুজী। তামাম দেশ ভেসে গিয়েছে। টিশনের পাত্তা পর্যন্ত নাই। বাবুজী, আমার দিয়ারা জমির বিলকুল মাটি গঙ্গাজী খেয়ে নিয়ে পেটে পুরেছে। সেখানে বিছিয়ে দিয়েছে মিহি বালুকে পথ। তার উপর দিয়ে চলেছে এখন গঙ্গাজী।

আমার সাজা হ'ল পাঁচ বছর। লছমনিয়ার হ'ল দু'বছর। সরকারী উকিলসাব সওয়ালে বললে—যে কাম করেছে তাতে ওদের ফাঁসিতে লটকে দেওয়া উচিত। কেঁও কি, তামাম এক এলাকা বরবাদ ক'রে দিয়েছে—দরিয়ার তুফান।

আমি মনে মনে বলেছিলাম সেদিন—দাও লটকে। কুছ্ আফসোস নেহি। জানো বাবুজী—জিমিদারের কছহারী গিয়েছে তুফানে, টিশন গিয়েছে, আওর বাবুজী—ওই যে মুখতিয়ারের মুন্সী—যে বেইমানি করেছিল তারও বাড়িঘর—তামাম প'ড়ে গিয়েছে। আমার আর ফাঁসিতে লটকাতে আফসোস কি তখন?

আমার উকিল,—সরকার থেকে দিয়েছিল উকিল—আমি দিইনি, সে বললে—কসুর খুব বড় তাতে আর ভুল কি? কিন্তু ওরা ও মতলবে পাথর সরায়নি। ওরা কি ক'রে জানবে—এমন হবে? বড় বড় সাহেবলোকের মগজে যা আসেনি—সে ওদের মগজে আসবে কি ক'রে? ওরা সুড়ঙ্গ দেখে—সেখানে খুঁজতে গিয়েছিল টাকা।

জজ বাহাদুর আর জুরীলোক মানলে সে কথা। আর মেনে নিলে—লছমনিয়ার কসুর এতে কম। ভাবলে তারা—আমিই তাকে ভুলিয়ে এ কামে সঙ্গে নিয়েছি। ওকে দিলে দু'বছর। আমি খুব খুশি হলাম। ভগোয়ানকে বললাম—এদের তুমি মঙ্গল করো। পরণাম করলাম—গঙ্গামাইকে। পরণাম—তোমাকে লাখো পরণাম মাইজী! আমার উপর অবিচারের তুমি সাজা দিয়েছ। হাসতে হাসতে

চলে গেলাম ফাটকে। মগজ আমার সাফ হয়ে গেল বাবুজী। পাঁচ বরিষ কোথা দিয়ে কেটে গেল জানতে পারলাম না!

কি ক'রে জানতে পারব বলো? তখন যে আমি পেয়েছি। মিল গিয়া হামারা —কি বলছ বাবুজী? কি পেয়েছি? লছমনিয়াকে—পেয়েছি আমি। থাক না কেন সে আলাদা জেলে, তবু তাকে পেয়েছি। এ এক মজার পাওয়া বাবুজী। কি ক'রে পায় তা জানি না, তবে পায়। দিনরাত ও আমার আঁখের সামনে থাকত। রাত্রে বাবুজী—আঁধিয়ারের মধ্যে ওর সঙ্গে সত্যি সত্যি কথা কইতাম আ ম। অন্য অন্য কায়েদীলোক—আমাকে বলত, পাগল—বাউরা। আমি হাসতাম। হাসতে হাসতে একরোজ বেরিয়ে এলাম জেল থেকে।

* * *

হঠাৎ মাটিওয়ালার চেহারা পাল্‌টে গেল। ভুল বললাম। চেহারা ওর আগেই পাল্‌টে গিয়েছিল। গল্প বলতে বলতেই পাল্‌টে গিয়েছিল। ওর বাঁকা ঘাড়টা যেন সোজা হয়ে উঠেছিল, ধনুকের মত মেরুদণ্ডটা এক অস্বাভাবিক শক্তির টানে যেন ছিঁড়ে সোজা হয়ে কাঁধের কুঁজটাকে প্রায় অর্ধেকেরও বেশী মিলিয়ে দিয়েছিল পিঠের সঙ্গে; ঠেলে বেরিয়ে-আসা বুক—স্বাভাবিক চেহারা নিয়ে চওড়া দেখাচ্ছিল যেন,—একজন শক্তিশালী প্রচণ্ড মানুষ—যেন ওর ওই ভাঙ্গাচোরা বিকৃত দেহ কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে কথা বলছিল এতক্ষণ। চোখ দু'টোয় দৃষ্টির মধ্যে যে শান্ত শিষ্ট মানুষটি—অহরহ ভেসে থাকে জলের মধ্যে সমাধিস্থ সন্ন্যাসীর মত—তার অস্তিত্বই ছিল না। গল্প বলতে বলতে সে দুই হাতে আমার তক্তপোশের শতরঞ্জি চাদর খামচাচ্ছিল অবিরাম।

সেই চেহারা আবার পাল্‌টে গিয়ে—ফিরে এল পূর্বের চেহারা। সেই ভাঙ্গা মানুষ। জীওনলাল যেন আমার চোখের সামনেই হয়ে গেল মাটিওয়ালা মেওয়া-লাল। মাটির বস্তা মাথায় ব'য়ে—মাটির ভিতরের—কাচা-পাথরের কুচিতে কেটে —ক্ষতচিহ্নে ভ'তি হয়ে গেল, ঘাড়ে বস্তা ব'য়ে ব'য়ে ক্রমশঃ ঘাড়ের পেশী বেঁকে, জমে —বেঁকে গেল, বুকটা ঠেলে বেরুল, বুকের পাঁজরা বেরুল, কাঁধের নীচে হাড় উঁচু হয়ে উঠে কুঁজ তৈরী হ'ল। সুদীর্ঘকাল বৎসরের পর বৎসর মাটি ব'য়ে ক্ষেতের মালিক জীওনলাল হয়ে গেল মাটিওয়ালা মেওয়ালাল। চোখের দৃষ্টিও গেল পাল্‌টে। হয়তো এই মহানগরে এই দীন কাজ ক'রে ক'রে—সেখানেও লাগল মাটির প্রলেপ

—খোলা চোখে—দীনতা-ভরা দৃষ্টি উঠল ফুটে ; যাকে আমার মনে হচ্ছে—শান্ত শিষ্ট এবং সুন্দর।

মেওয়ালাল বললে—ফাটক থেকে বেরিয়ে এলাম বাবুজী, মনে ঠিক দিয়ে নিলাম কি—গাঁওয়ে ফিরেই মুসহরের বিটীয়াকে নিয়ে দুনিয়াতে ভেসে পড়ব। গাঁওয়ে থাকব না, থাকতে পারব না, চ'লে যাব ওকে নিয়ে। জাতে ধরমে জলাঞ্জলি আগেই দিয়েছি—এবার ওর ঘরে—ওর রান্না—ওর থারিয়াতে—এক সঙ্গে খেয়ে আমিও হয়ে যাব মুসহর। দুনিয়াতে ওই মুসহরের বিটীয়াই ত আমার সত্যি—আর সব ত আমার কাছে ঝুট! ওকে পেলেই আমি পেয়ে যাব তামাম দুনিয়ার মালিকানি! কিন্তু বাবুজী—।

—কি? কি হ'ল লছমনিয়ার? আমি প্রশ্ন করলাম।

—সেও তখন আলগ দুনিয়া পেয়েছে আমারই মত। মুসহরের সর্দার—জগন্নু—, সে হেসে বললে—তোহার লছমনিয়া সাহেবের বেটার মা হয়েছে। মেমসাহেব বন্ গিয়েছে। তার আগে ব'লে নি' বাবু দু'টো কথা। গাঁওয়ের কথা। দেখলাম বাবু, নতুন গাঁও ব'সে গিয়েছে শহরের মত। সব ওই জাহাজ কোম্পানির দৌলতে বাবু। জাহাজ কোম্পানি আবার গড়েছে নয়া টিশন। বড়া ভারী টিশন হয়েছে এবার। বুঝেছ বাবুজী—মহাদেওজীর আস্তানকে আবার গড়েছে, লোহা দিয়ে—আর কঙ্কর বিলাইতি মাটি দিয়ে, তার কোলে—লোহার জাল দিয়ে বেঁধে বিছিয়ে দিয়েছে বড় বড় পত্থলের চাঁই! টিশনের কিনারা আগাগোড়া—পাক্কা ক'রে বাঁধিয়ে দিয়েছে! এবার চারটে আলো নয়, শালের লকড়ী নয়, লোহার খুঁটি পুঁতেছে দশ-দশঠো, তাতে জ্বলছে বড় বড় আলো। কি টেলিগিরাপ ব'সে গিয়েছে। বাজার ব'সে গিয়েছে—শহরের মত; চা-পানিকে দুকান সমেত ব'সে গিয়েছে দু'তিনটে। বললাম—ভাল—ভাল, ভগোয়ান মালিক; উনকে মর্জি! জীওনলাল—তোর কসুর ভগোয়ান শুধরে দিয়েছেন! ভাল হয়েছে।

দেখতে দেখতেই চ'লে গেলাম—ওই মহাদেওজীর আস্তানার দিকে। ওখানে ওই যে নয়া বাঁধ হয়েছে—সেখানে এক বাংলা ব'নে গিয়েছে—এই টিশন—এই বাঁধ—তদারকের জন্যে সেখানে থাকে কোম্পানির এক অপ্‌সর, এক কালা 'সাহেব'। এইখানেই থাকে মুসহরের বিটীয়া লছমনিয়া।

মুসহরদের সাপিন-কন্যা—পাঞ্জাবের রহনেওয়ালীর মত লম্বা। বাংলা থেকে বেরুবামাত্র আমি চিনলাম। কিন্তু কাছে যখন এল তখন আমি অবাক হয়ে গেলাম। সে কি তার সাজপোশাক! রঙ্গীন ছিটের ঘাগরা কাঁচুলী রং ধপ্‌ধপে সাদা কাপড়—ধপ্‌ধপে সাদা জামা, খস্‌খসে চুলে লম্বা বেণী। সাহেবলোকের আয়া! সাহেবের মেম ম'রে গিয়েছে—তার দুই ছেলেকে সে মানুষ করে।

সে বললে—তারও বেশী মেওয়ালাল! এসো আমার সঙ্গে। বাগানের এক পাশে ছোট ঘর—সেখানে নিয়ে গিয়ে দেখালে বছর খানেকের এক বাচ্চা। বুকে জড়িয়ে ধ'রে বললে—আমার জীওনকে আঁধিয়ারা রাত্তের চাঁদ, মেওয়ালালবাবু।

এমন মিষ্টি হাসলে লছমনিয়া যে, সে তোমাকে কি বলব! তারপর বললে—বলতে তার এতটুকু শরম হ'ল না—বললে—সাহেব আমাকে দিয়েছে। আমার নিজের ছেলে।

তারপর বললে—তুমি সে সব ভুলে যাও জীওনলালবাবু।

আমি আর কিছু বললাম না তা'কে। কি বলব? আগেই আমার দু'চোখ জলে ভ'রে গিয়েছিল ওর কথা শুনে। চ'লে এলাম। দুখ হ'ল না এমন নয়—হ'ল তবু খুশি হয়েই চলে এলাম। ওর খুশি মুখ দেখে খুশি হয়ে চলে এলাম। ঝুট বাত নয় বাবুজী, সূরুয নারায়ণ গঙ্গামাইজীর নাম নিয়ে বলছি আমি। একথা সাধুকে বলেছিলাম, সাধুজী খুব ঘাড় নেড়েছিলেন—সীয়ারামজীর জয় দিয়েছেন। মহাবীর কাহারের মা শুনে আমাকে ঘেন্না করেছিল, লছমনিয়াকে খারাপ কথা বলেছিল। তুমি কি বলবে আমি জানি না। লছমনিয়া খুশি মুখে আমার—চোখের উপর ভাসছে।

খুশি হয়েই চ'লে এলাম। চ'লে এলাম বাবুজী কলকাতায়। ওখানে থাকতে মন চাইল না। আর ওখানের লোকে আমার উপর ভয়ানক চটা। চটবেই ত বাবুজী। আমি ত অনেক কষ্ট ওদের দিয়েছি। কলকাতা এলাম, ভাবলাম—মজুর খাটব কিংবা কোন চাকরি-বাকরি পেলে করব। খাটব খাব। মুসহরের বিটীকে ভাবতে ভাবতেই আমার জীবন কেটে যাবে। কিন্তু হয়ে গেল অন্য রকম। গঙ্গামাইজী তা হতে দিলেন না। প্রথম রোজই বাবুজী, হাওড়া টিশনে নেমে কলকাতায় ঢুকে—কোথা যাব ঠিক করতে না পেরে গঙ্গাজীর ঘাটে বসলাম। আকাশ-পাতাল ভাবছিলাম, গাড়ি ঘোড়া লোক, এত বড় বড় বাড়ি

দেখে কান্না পাচ্ছিল। কেন এলাম এখানে? রাস্তায় ঘাটে—কোথাও এতটুকু মাটি নাই, পাথরের—ইটের—লোহার—পিচের উপর পা ফেলে শরীর কেমন শিউরে উঠছিল বাবুজী। গঙ্গাজীর ঘাটে ব'সে থাকতে থাকতে ওসব ভুলে গেলাম। মনে হ'ল—এই ত সেই গঙ্গাজী! গঙ্গাজীর এই যে এখানে ঘোলা জল, ওই জলেই ত আছে আমার সেই ক্ষেতির মাটি! ভাবছি, এমন সময় ভাটি পড়ল গঙ্গায়। আমাদের দেশে ভাটি নাই, জোয়ার নাই। আমি অবাক হয়ে দেখলাম। জেগে গেল দু'পাশে কাদা-মাটি, চিক্‌চিকে বালি মেশানো মিহি পলি। ঠিক আমার ক্ষেতির মাটি। কি মনে হ'ল—তুলে নিলাম খানিকটা মাটি, দু'হাতে ঘাঁটলাম, পিষলাম, নাকের কাছে এনে গন্ধ শুঁকলাম। মনে হ'ল অবিকল সেই মাটি। দু'হাত ভ'রে মাটি আমি তাল বেঁধে তুলে নিলাম—বাউরার মত। স্নান ক'রে সেই মাটি নিয়ে ঘাট থেকে উঠে এলাম। একটা আস্তানা কোথাও দেখে নিতে হবে। কাদার তালটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়ব দুপহর বেলা। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। চলেছি আমি। হঠাৎ, একটা কোঠির দাওয়ায় খেলছিল এক খোকী—সে আমাকে ডাকল—এই। এই মাটিওয়ালা। এই!

সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির দোর খুলে বেরিয়ে এলেন এক মাইজী। বললেন—বাঁচলাম, দাও ত বাবা মাটি।

গোটা তালটাই নামিয়ে দিলাম আমি। মাইজী বললেন—এতনা নেহি! চার পয়সার।

বাবুজী, এই শুরু হয়ে গেল আমার ব্যবসা। গঙ্গাজী আমার গচ্ছিত ধন আমাকে দিয়েই চলেছেন। আমি নিয়ে তাই বেচি আর খাই। খেয়ে-দেয়েও বাঁচে বাবুজী। তাই থেকে দশটি ক'রে টাকা আমি লছমনিয়াকে ভেজে দিই। লছমনিয়া পেয়েছে তার ছেলেকে—আমার ত মুসহরের বিটীই সব। ওকে পাঠিয়েও আমার থাকে। যা থাকছে—তাও সব মরবার আগে মুসহরের বিটীয়াকে পাঠিয়ে দেব।

একটু ঘাড় নেড়ে বললে—সে অনেক হবে, হ্যাঁ—অনেক হবে। এই এত পয়সা। আনি দু'আনি আর পয়সা। মরবার আগে লছমনিয়াকে ভেজে দেব। লছমনিয়া—মুসহরকে বিটীয়া, পাঞ্জাবের রহনেওয়ালীর মত লম্বা। সে ওর লেড়কাকে দেবে।

অভিভূত হয়ে ভাবছিলাম। চমক ভাঙল ওরই হাঁকে!

অপরাহ্ণের প্রারম্ভকালের মাধুর্যটুকু যেন অকস্মাৎ চমকে উঠল তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরের বেসুরাভঙ্গীর হাঁকে।

—মাটি—চা—ই, মাটি—ই।

মেওয়ালাল? না—এ আর একজন! এমনি ভাঙা-চোরা দেহ। এমনি করেই হেঁকে চলেছে। এও হয়তো মাটি হারিয়ে—মহানগরীতে মাটি কুড়িয়ে—বেচে বেড়াচ্ছে দোরে দোরে—মাটি—চা—ই!

ব্যাঘ্রচর্ম

যাহাকে বলে 'অজ পাড়াগাঁ'; মজিদপুর এই 'অজ পাড়াগাঁ।' পায়ে চলা পথ ভিন্ন এখনও এ গ্রামে প্রবেশের জন্য গাড়ির পথ তৈয়ারী হয় নাই। জামা গায়ে, জুতা পায়ে কোন বিদেশী গ্রামে প্রবেশ করিলে গ্রামের পথচারী কুকুরগুলো লাঙ্গুল গুটাইয়া চিৎকার করিতে করিতে দূরে পলাইয়া যায়; পথের উপর খেলায় নিবিষ্ট দিগম্বর বালকের দল সভয়ে সসম্ভ্রমে তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিয়া এক পাশে দাঁড়ায়, তারপর পথিকের পিছনে পিছনে গ্রামপ্রান্ত পর্যন্ত অনুসরণ করিয়া ফিরিয়া আসে। অল্প কিছুদিন আগে এখানে একটি সরকারী ইঁদারা তৈয়ারী হইয়াছে বটে, কিন্তু সে জল পর্যন্ত লোকে এখনও খায় না; বলে, ইঁদেরার জল লোনা,—খেলে পেটে লোনা ধরবে। এমনি পাড়াগাঁ এই মজিদপুর।

এ গ্রামে ইট তৈয়ারি করিতে নাই, কয়লা পোড়াইতে নাই, পান ছাড়া অপর কোন প্রয়োজনে চুন ব্যবহার করিতে নাই; শেয়ালে ছাগল ধরিয়া লইয়া গেলেও তাড়া করিতে নাই—কারণ শেয়াল নাকি সাক্ষাৎ ভগবতী। এমনই ক্ষুদ্র গ্রামখানা অকস্মাৎ একদিন বিপুল চাঞ্চল্যে আলোড়িত হইয়া উঠিল। ঠিক যেন ঘনপল্লবে আচ্ছন্ন কোন একটা ছোট ডোবায় আকাশ হইতে কে একটা বিশ মণ ওজনের পাথর ফেলিয়া দিল। তরঙ্গের পর তরঙ্গের আঘাতে পঙ্কিল শীতল বদ্ধ জল ভয়ে বাঁধ ভাঙ্গিয়া বাহিরে যাইতে চায়, কিন্তু পারে না। গ্রামের লোকগুলির ঠিক সেই অবস্থা, উপায় থাকিলে তাহারা হয়ত পলাইয়া যাইত।

তাহাদের দোষ নাই—তরুণ এম-এ পাশ করা জমিদার আসিয়াছেন। সঙ্গে রাত্রির অন্ধকারের মত কালো রঙের দুইটা গ্রে-হাউণ্ড—টম ও টেবি, আর গাদাখানেক বই। জমিদার তাহাদের ভয়ের বস্তু হইলেও অপরিচিত জন নয়। তাহারা জমিদার ইহার পূর্বে দেখিয়াছে—প্রকাণ্ড বড় বড় পাগড়ী বাঁধা চাপরাসী, ফুরসী, গড়গড়া, বোতল বোতল কারণ, অকারণ গর্জন, এ সবের সঙ্গে তাহাদের অপরিচয় নাই। কিন্তু গাদাখানেক বই ও কুকুরপ্রিয় হেমাঙ্গবাবুর মত জমিদার তাহাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত; তাহার উপর যেদিন গোমস্তা ঘোষণা করিয়া দিল

যে, বাবু কাহারও সহিত দেখা করিবেন না, কাহারও নজরানা লইবেন না, খাজনার কথাও বলা চলিবে না,—সেদিন তাহাদের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। কিন্তু বিস্ময়ের অপেক্ষা ভয় হইল আরও বেশী।

হেমাঙ্গবাবু শখ করিয়া মহলে বিশ্রাম লইতে আসিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে কিছু পড়াশুনা করিবারও অভিপ্রায় আছে। হেমাঙ্গবাবু কাছারীর প্রাঙ্গণে পদচারণা করেন—দূর হইতে প্রজারা দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখে। ছেলেরা আঙুল দেখাইয়া বলে, হুই দেখ বাবু!

বয়স্ক ব্যক্তিরা ছেলেটার হাতখানা টানিয়া নামাইয়া দিয়া বলে, এ্যাঃ-ই খবরদার! কেহ চুপি চুপি বলে, কি রকম ভাই, আমি ত কিছু বুঝতে লারচি। মোড়ল মাতব্বর যাহারা, তাহারা কেহ কেহ সাহস করিয়া যায়, কিন্তু কাছারীর সীমানার বাহিরেই থমকিয়া দাঁড়াইয়া দেখে—লিকলিকে কালো আঁধার কুকুর দুইটা কোথায়।

যে গলার ডাক—সত্যই মানুষের ভয় হয়।

সেদিন কুকুর দুইটা কাছারীর পিছনের দিকে বাঁধা ছিল, তাই সাহস করিয়া ইন্দ্র মণ্ডল কাছারীতে আসিয়া ঢুকিয়া পড়িল। হেমাঙ্গবাবু তেল মাখিতেছিলেন, সে হাত জোড় করিয়া বলিল—আজ্ঞে, চরণে ত্যাল দিয়ে দিই আমি।

হেমাঙ্গবাবু হাসিয়া বলিলেন—না, থাক।

ইন্দ্র মণ্ডল অবাক হইয়া গেল, তবু সে বলিল—আজ্ঞে, আমি আপনার পেজা!

হেমাঙ্গবাবু লোক খারাপ্ নন, তিনি মিষ্টি স্বরেই বলিলেন—কি নাম তোমার?

ইন্দ্র উৎসাহিত হইয়া বলিল, আজ্ঞে, ইন্দ্রচন্দ্র মণ্ডল, হুজুরের মণ্ডল আমি; পুণ্যেপাত্ত।

—বেশ বেশ, কিরকম ফসল হ'ল এবার?

ইন্দ্র কাতর কণ্ঠে বলিল, ভগমানেই মেরে দিলে হুজুর, মানুষের আর অপরাধ কি!

অকস্মাৎ পিছনের দিকে কুকুর দুইটা গম্ভীর ক্রুদ্ধ চিৎকারে স্থানটাকে ভয়সংকুল করিয়া তুলিল। কুকুরের ডাক ত নয়, যেন বাঘের ডাক।

সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কণ্ঠস্বরও পাওয়া গেল, ওরে বাপ্‌রে, ই যে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে মানুষকে।

হেমাঙ্গবাবু চাকরটাকে বলিলেন, কোন লোক দেখে চেঁচাচ্ছে। গিয়ে ঠাণ্ডা কর ত তুই। কে আসছে, চ'লে আসতে বল, দাঁড়িয়ে থাকলে বেশী চিৎকার করবে। চাকরটা চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই একজন অসাধারণ লম্বা জোয়ান আসিয়া কাছারীর প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আভূমি নত হইয়া অত্যন্ত ক্ষিপ্র ভঙ্গিমায় এক সেলাম বাজাইয়া কহিল—সেলাম হুজুর!

হেমাঙ্গবাবু বিস্মিত হইয়া লোকটার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ছয় ফুট, সাড়ে ছয় ফুট লম্বা এক জোয়ান; তেমনি পরিপুষ্ট দেহ, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, চোখ দুইটা করমচার মত রাঙা, লোকটার হাতে তাহারই দৈর্ঘ্যের অনুরূপ দীর্ঘ একগাছা লাঠি। কপালে প্রকাণ্ড একটা কাটা দাগ।

লোকটি হাসিয়া বলিল—আমাদের রুটি মেরে দিলেন হুজুর। আচ্ছা কুকুর পুষেছেন। বন থেকে বাঘ ধ'রে আনবে ও কুকুরে—লেলিয়ে দিলে লোকের টুঁটি ছিঁড়ে ফেলাবে।

হেমাঙ্গবাবু বলিলেন—হ্যাঁ, ও কুকুর শিকার করবার জন্যেই পোষে।

লোকটি বলিল—তা পুষেছেন বেশ করেছেন কিন্তুক—গোলামের মত কুকুর ও লয়। এক লাঠিতেই—গোলাম ও দু'টোকেই সাবড়ে দেবে। লোকটাকে দেখিয়া কথাটা অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয় না।

হেমাঙ্গবাবু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—কি নাম তোমার?

আবার একটা সেলাম করিয়া সে বলিল—গোলামের নাম রতন হাড়ি। হুজুরের গোলাম আমি। এ চাকলায় সকলেই আমাকে চেনে। বলো না গো গোমস্তাবাবু।

হেমাঙ্গবাবু এবার মুখ ফিরাইয়া উপস্থিত ব্যক্তি কয়টির দিকে চাহিলেন। দেখিলেন—গোমস্তা, ঠাকুর, লগদী, ইন্দ্র মণ্ডল, স্থানীয় ব্যক্তি কয়টির সকলেই ভয়ে যেন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

হেমাঙ্গবাবু প্রশ্ন করিলেন—লোকটি কে হে রাধাচরণ?

রাধাচরণ গোমস্তা বলিল, আজ্ঞে রতন হাড়ি, এ চাকলার বড় লাঠিয়াল একজন। জমিদারদের কাজকর্ম পড়লে কাজটাজ করে।

রতন বলিল—হুজুরদের কাছারীতে আমার বাঁধা বিত্তি আছে। সব জমিদারদের কাছারীতেই আছে। দাঙ্গা-দখল, পেজ্ঞা শাসন যখন যা দরকার হয় আমি হুজুরদের গোলাম আছি-ই।

তারপর কপালের কাটা দাগটা দেখাইয়া বলিল, মুর্শিদাবাদে ফতেসিং পরগণায় জমিদারদের এক দাঙ্গায় এই দেখেন মারলে কপালে তরোয়াল দিয়ে—এক কোপ। গল্ গল্ ক'রে তাজা রক্ত—গরম কি সে রক্ত—চাল দিলে ভাত হয় হুজুর—বেরিয়ে মুখ ভেসে গেল। তবু আমিও ছাড়ি নাই, সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় বসিয়ে দিলাম লাঠি—ব্যাস্, ডিমের খোলার মত চুর হয়ে গেল। সেও পড়ল—আমিও পড়লাম। কিন্তু ঐ লাশ পড়তেই ও তরফের সব ভাগলো। আর কখনও সে সীমানায় পা দেয় নাই, তবে আমাকে ছ'মাস বিছানায় প'ড়ে থাকতে হয়েছিল।

ইন্দ্র মণ্ডল ধীরে ধীরে কাছারী হইতে বাহির হইয়া গেল।

হেমাঙ্গবাবু বলিলেন—পুলিস ধরলে না তোমাকে? হাসিয়া রতন বলিল—তবে আর হুজুররা আছেন কেন? এস্তা গোলমাল ক'রে দিলেন যে, পুলিস পাত্তাই পেল না। জলের মত টাকা খরচ করেছিলেন মালিকেরা। মামলাতেও জিতে গেলেন আমারই হুজুর। সে সীমানায় এখন বাবুদের হাজার টাকা আয় বেড়ে গিয়েছে।

একটা সিগারেট ধরাইয়া হেমাঙ্গবাবু প্রশ্ন করিলেন—এখন কোথায় কাজ করো তুমি?

আবার একটা সেলাম করিয়া রতন বলিল—সবারই কাজ করি আমি হুজুর, যার যখন দরকার পড়ে; তলব করলেই গোলাম 'হাজির' হয়; বাঁধি কাজ আমি করি না কোথাও।

—হুঁ, এখন কোথায় এসেছিলে?

—এই হুজুরের দরবারে। হুজুরকে সেলাম দিতে। শুনলাম হুজুর এসেছেন, তাই এলাম। বকশিশের হুকুম হয়ে যাক হুজুর। ওই কুকুর দুটোকে রোজ দুধ ভাত দিচ্ছেন—আমাকেও আজ কিছু হুকুম হোক।

হেমাঙ্গবাবু গোমস্তাকে ইশারা করিলেন, সে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর হইতে একটা টাকা আনিয়া রতনের হাতে দিয়া বলিল—নাও।

রতন পুনরায় অভিবাদন করিয়া বলিল—যখন দরকার হবে হুজুর, কুকুর

পাঠিয়ে তলব দিবেন, গোলাম হাজির হবে। যা হুকুম করবেন তাই আমি পারি। হুজুরের যদি কেউ দুশমন থাকে, হুকুম দিলে—। সে ইশারা করিয়া বুঝাইয়া দিল তাহাকে সে খুন করিতে পারে।

তারপর আবার আরম্ভ করিল—এই এরা সব জানেন—এ চাকলায় কাশীদাস ব'লে এক হারামজাদা চাষা ছিল। এ চাকলা তার ভয়ে কাঁপত। বেটার পয়সাও ছিল, আর বুকের ছাতিও ছিল। আজ এর জমি কেড়ে নিত, কাল ওর পুকুর ছেঁকে মাছ ধরিয়ে নিত, ওকে ধ'রে খত লিখিয়ে নিত। শেষে চাকলায় জমিদার-দের সঙ্গে লাগলো ঝগড়া। গোলামের ওপর ভার হ'ল শেষে। এই বছর দুয়েক আগে কালীপূজার দিন, মাঠের মধ্যে কাশীদাস হয়ে গেল। পা, হাত, মুণ্ডু—সব আলাদা হ'য়ে প'ড়ে ছিল মাঠের মধ্যে।

হেমাঙ্গবাবু তাহার অবয়ব এবং সপ্রতিভ ভঙ্গিমার দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন—কাজ করবে তুমি? আবার সেলাম করিয়া রতন বলিল, হুকুম করলেই পারি।

—না, সে রকম কোন কাজ নয়। আমার কাছে চাকরি করবে তুমি?

—গোলামের পেটটা একটু বড় হুজুর। বলিয়া হাসিয়া রতন পেটে হাত বুলাইল।

—আমার ওই কুকুর দু'টো পাকী তিন সের চালের ভাত খায়, এক সের ক'রে দুধ!

—শখের বলিহারি যাই হুজুরের। হুজুর ইচ্ছে করলে আমার মত বিশটে লোক পুষতে পারেন। তা আমি বলব কাল এসে। রতন অভিবাদন করিয়া বিদায় হইয়া গেল।

গোমস্তা এবার সভয়ে বলিল—ওর মত লোককে ঘরে ঢোকাবেন না হুজুর।

পাচক ব্রাহ্মণটি আবার সাধুভাষায় কথা বলে, সে বলিল—সাক্ষাৎ ব্যাঘ্র হুজুর।

হেমাঙ্গবাবু হাসিয়া বলিলেন—বাঘও ত লোকে শখ করিয়া পোষে! দেখি না দিন কতক পুষে।

পাচকটি কাতর হইয়া বলিল—কি করবেন ওকে রেখে হুজুর? হুজুরের সুনাম তো দেশময়। কোথাও তো—

বাধা দিয়া হেমাঙ্গবাবু বলিলেন, ওই কুকুর দু'টো পুষেছি—কাউকে ত লেলিয়ে

দেবার জন্যে নয়, দু'টো বন্দুকও আমার আছে, কিন্তু মানুষকে ত গুলি করিনে। ভয় কি! দেখি না।

গোমস্তা বলিল—ও কি কাজ করবে হুজুর, বাঁধা কাজ করবার ওর দরকারই হয় না। এই সব কাজে রোজগারও করে; আর তাছাড়া যার বাড়িতে গিয়ে দাঁড়ালো, তারই ঘরে সেদিনের খোরাকটা ক'রে নিয়ে গেল। কেউ ত 'না' বলতে পারে না। ওকে দেখলেই লোকে ভয়ে কাঁপে—যা চায় দিয়ে বিদায় ক'রে বাঁচে।

পাচকটি বলিল—তবু দেখুন গিয়ে হতভাগ্যের চালে খড় নাই, পত্নীর পরিধানে ছিন্নবস্ত্র। পাপের ধন কর্পূরের মত উড়ে যায়। সেই যে বলে পাপ সঞ্চিত ধন, আর বন্যার জল—এ কখন থাকে না।

গোমস্তার অনুমান কিন্তু সত্য হইল না। পরদিন প্রাতঃকালেই রতন আসিয়া দাঁড়াইল। সেদিন সে আর সেলাম করিল না, হেমাঙ্গবাবুর পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, হুজুরের পায়েই আশ্চয় নিলাম আজ থেকে।

* * * *

দিন কয়েক পর হেমাঙ্গবাবুর বইয়ের উপর বিরক্তি ধরিয়া গেল। তিনি বন্দুক ও কুকুর দুইটাকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। বড় শিকার এখানে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না, তবে খরগোশ ও পাখি এখানে অজস্র। হরিয়াল, তিতির, সরাল পাখি ঝাঁক বাঁধিয়া উড়িয়া বেড়ায়। বন্দুকের শব্দও তাহাদের নিকট অপরিচিত। গোমস্তা বলিল—রতন, তুমি বাবুর সঙ্গে যাও।

রতন বলিল—হুজুরের সঙ্গে চলেছে দুই বাঘ—হাতে বন্দুক, রতন আর ও পাখ-পাখুড়ী কুড়োতে কোথা যাবে! ওই শম্ভুকে পাঠিয়ে দাও। সে বেশ মশগুল করিয়া তামাক সাজিতে বসিল।

হেমাঙ্গবাবু গ্রাম পার হইয়া মাঠে একটা বনফুলের ঝোপের কাছে আসিতেই কি একটা জানোয়ার লাফ দিয়া বাহির হইয়া মাঠে ছুটিল—খরগোশ!

তিনি বন্দুক তুলিয়া ধরিয়া গুলি ছুঁড়িলেন। খরগোশটা একটা প্রচণ্ড লাফ দিয়া উঠিয়া পড়িয়া গেল; কিন্তু পরমুহূর্তেই উঠিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ছুটিতে আরম্ভ করিল। তখন টম ও টেবি ছুটিয়াছে। দেখিতে দেখিতে টম আসিয়া নিরীহ জানোয়ারটার ঘাড়ের উপর ঝাঁপ দিয়া পড়িল। নিস্তব্ধ প্রান্তর করুণ

চিৎকারে সকরুণ হইয়া উঠিল। হেমাঙ্গবাবুর মনে হইল, কোন ছাগল-ছানাকে কুকুরটা ভুল করিয়া বোধ হয় আক্রমণ করিয়াছে, ঠিক এমনি চিৎকার। তিনি ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, ছাগল নয়—খরগোশ। খরগোশের চিৎকার কখনও তিনি শোনেন নাই। টম আরও গোটা দুই ঝাঁকি দিতেই জীবটা নীরব হইয়া গেল।

মানুষের বুকের হিংস্রবৃত্তি যখন পাশবিক উল্লাসে জাগিয়া উঠে, তখন মানুষ আর একরকম হইয়া যায়। একবার হত্যা করিয়া কৃতকার্য হইলে আর রক্ষা নাই, হত্যার পর হত্যা করিবার জন্য মানুষ পাগল হইয়া উঠে। প্রথমেই এমন একটি শিকার করিয়া হেমাঙ্গবাবু মাতিয়া উঠিলেন। শিকার শেষে এক বোঝা পাখি লইয়া যখন কাছারীতে ফিরিলেন, তখন বেলা গড়াইয়া অপরাহ্ণ হইয়া আসিয়াছে।

স্নান আহার শেষ করিয়া একখানা বই লইয়া বসিয়াছিলেন, এমন সময় গোমস্তা আসিয়া ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া বলিল—খরগোশটার পেটে চারটে বাচ্চা ছিল।

হেমাঙ্গবাবু অনেক শিকার করিয়াছেন, মরা পাখির পেটে ডিম অনেকবার পাইয়াছেন, সুতরাং এ সংবাদে তিনি বিস্মিত হইলেন না। বরং কৌতুহলপরবশ হইয়া উঠিয়া বলিলেন—তাই নাকি? কই চলো ত দেখি কেমন?

সত্যই লম্বা একটা চামড়ার থলির মধ্যে পরিপূর্ণ অবয়ব চারিটি শাবক রহিয়াছে, স্পষ্ট দেখা গেল। হেমাঙ্গবাবু বলিলেন, একটু অন্যায় হয়ে গেল। যাক্‌গে। বাচ্চা চারটে দিয়ে দাও ওই কুকুর দু'টোকে।

রাত্রে আহারের সময় হেমাঙ্গবাবু দেখিলেন, লোকজন সকলেই খাইতে বসিয়াছে, কেবল রতন নাই। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন—রতন কই?

গোমস্তা বলিল—সে খাবে না বলেছে, তার শরীর ভাল নাই।

চাকরটা মৃদু স্বরে বলিল—সমস্ত সন্ধ্যেটা সে কেঁদেছে।

—কেন?

—ঐ খরগোশটার পেটের বাচ্চাগুলোকে দেখে।

হেমাঙ্গবাবু অবাক হইয়া গেলেন। একটা নরঘাতী; মানুষের উপর কোন অত্যাচার করিতেও যে ইতস্ততঃ করে না, সে তুচ্ছ একটা পশুর জন্যে কাঁদে!

পরক্ষণেই তিনি আবার হাসিলেন। সবই অভ্যাস—যে মানুষ পশুহত্যা ক'রে, সে নরহত্যা করিতে পারে না; যে নরহত্যা করে, সে পশুহত্যা দেখিয়া কাঁদে।

একবার ভাবিলেন, লোকটাকে বিদায় করিয়া দেওয়াই ভাল, পরক্ষণেই মনে হইল, থাক।

রতন হেমাঙ্গবাবুর কাছেই থাকিয়া গেল, সপরিবারে উঠিয়া আসিয়া সে হেমাঙ্গবাবুর এলাকা মধ্যেই বসবাস করিল। হেমাঙ্গবাবুই তাহার সব করিয়া দিলেন। সে এখন খায় দায় আর হেমাঙ্গবাবুর কাছারীতে আসিয়া বসিয়া থাকে। ঐ কুকুর দুইটার সঙ্গে তাহার বড় সদ্ভাব—সে-ই এখন তাহাদের তদ্বির তদারক করে।

হেমাঙ্গবাবু একটু খেয়ালী মানুষ, দুর্দান্ত ভয়ংকর জানোয়ারের উপর তাঁহার অহেতুক আকর্ষণ আছে, নতুবা মানুষ তিনি খারাপ নন, জমিদার হিসাবেও তাঁহাদের পুরুষানুক্রমিক প্রজাপালক শিষ্ট জমিদার বলিয়া খ্যাতি আছে। সুতরাং রতনকে এখনও তাহার গুণপনার পরিচয় দিতে হয় নাই। কর্মচারীরা কিন্তু বড় বিরক্ত হয়, ঐ এমন ধারা ভয়ংকর একটা লোককে দেখিয়া তাহাদের আতঙ্কও হয়—আবার রতনের মোটা বেতনের জন্য হিংসাও হয়। তাছাড়া রতন ইহাদের উপর অত্যাচার করে। এক একদিন এক একজনের কাছে গিয়া সেলাম বাজাইয়া বলে—আজ মদের ইনেমটা কিন্তুক আপনার কাছে পাওনা গোমস্তা মশাই।

যমের কাছে অনুনয়-বিনয় চলে, কিন্তু যমদূতের নিকট অনুনয় করিলে ফল হয় না; তাহারা কেহ একটা আনি, কেহবা একটা দু'আনি ফেলিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে।

রতন অকৃতজ্ঞ নয়; সে আবার একটা সেলাম করিয়া বলে—বাবুর গোলাম আমি আপনারও গোলাম। যখন যা কাজ পড়বে হুকুম দেবেন।

নিরীহ কর্মচারী কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলে, আমাদের আবার কাজ কি রতন? রতন বুঝাইয়া বলে—হুজুর,—মানুষ হলেই কাজ আছে। আপনার দুশমন নাই? যে যেমন মানুষ তার তেমন দুশমন, তার তেমন কাজ। এই দেখেন—রজত-পুরের জমিদারের এক সরকার; বুঝলেন, তার ঝগড়া লাগল তার গাঁয়ের মাতব্বরের সঙ্গে। মশাই, এক বেটা সেঁকরা গোটাকতক পয়সা ক'রে যেন সাপের পাঁচ-পা দেখলে। সরকার আমাকে ধরলে, রতন, আমাকে বাঁচাতেই হবে নইলে মান ইজ্জৎ ত আর রইল না। পঁচিশ টাকা ঠিকে হ'ল। তিনদিন না যেতেই বুঝলেন—ছুটে গেল বেটার চালে চালে লাল ঘোড়া।

কর্মচারীটা সভয়ে বলিয়া উঠিল—আগুন!

অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে রতন বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, লাল ঘোড়া আগুনকেই বলে। তা আপনার একবার নয়, তিন তিন বার। শেষে বেটা সেঁকরা টিন দিলে ঘরে। তখন একদিন করলাম কি জানেন, গাঁয়ের সদর রাস্তার উপর বেটা দাঁড়িয়ে ছিল, বেটার কানটা ধ'রে গাঁয়ের এধার থেকে ওধার পর্যন্ত ঘৌড় দৌড় ক'রে দিলাম।

কর্মচারীটা চুপ করিয়া রহিল, সে আর কথা বাড়াইতে নারাজ, রতনের হাত হইতে রেহাই পাইলেই সে বাঁচে। রতন কিন্তু রেহাই দিল না, সে তাহার ভয়ংকর মুখ আরো বীভৎস করিয়া কৌতুকের হাসি হাসিতে হাসিতে বলিল—লাল ঘোড়া ত খুব সস্তা হুজুর। এক দেশলাইয়ের কাঠি হলেই—ব্যাস্। এক টাকা দিলে ঘরের এক কোণে দিতাম, দু'টাকা দিলে দু'কোণে, তিন টাকায় তিন কোণে, চার টাকায় বেড়াজাল—একেবারে ইধার-উধার পর্যন্ত!

কর্মচারীটি এবার বিরক্ত হইয়া বলিল—কিন্তু যমের ঘরে তো জবাবদিহি করতে হবে রতন।

হি হি করিয়া হাসিয়া রতন বলিল—সে দিন আর কাউকে পয়সা লাগবে না হুজুর, রতন নিজের গরজেই যমের দালানে আগুন লাগাবে। বলিয়া সে এবার উঠিয়া চলিয়া গেল।

* * * *

একদিন রতনের কাজ আসিয়া উপস্থিত হইল।

সম্প্রতি হেমাঙ্গবাবু একখানি নূতন মৌজা খরিদ করিয়াছেন, সেইখানে প্রজাদের সহিত বিরোধ বাধিয়া উঠিল। হেমাঙ্গবাবুকেও দোষ দিতে পারা যায় না, তিনি বিরোধ করিতে চাহেন নাই। বিরোধ করিল প্রজারাই। নজর, সেলামী বা কোন আবওয়াবই হেমাঙ্গবাবু দাবী করেন নাই, তিনি দাবী করিলেন, আইনসঙ্গত প্রাপ্য খাজনা। কিন্তু তাও প্রজারা দিবে না।

তাহারা বলে—খাজনা কিসের? মাঠ চষা—তার আবার খাজনা কিসের? হেমাঙ্গবাবু নালিশ করিলেন। প্রজারা তাঁহার কাছারীতে আগুন দিল। একদিন পথে তাঁহার গোমস্তাকে ধরিয়া কান মলিয়া অপমান করিয়া ছাড়িল। গোমস্তা আসিয়া হেমাঙ্গবাবুর পায়ে গড়াইয়া পড়িতেই হেমাঙ্গবাবু জলিয়া উঠিলেন তিনি

রতনকে তলব করিলেন। রতন আসিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন—এত দিন ব'সে ব'সে খেলি, হাতীর মত তোকে পুষলাম, এইবার কাজ দেখাতে হবে।

রতন তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হেমাঙ্গবাবু বলিলেন—নতুন মৌজা পলাশবুনি পোড়াতে হবে।

রতন প্রশ্ন করিল—পলাশবুনি?

—হ্যাঁ, একধার থেকে আর একধার পর্যন্ত—যেন একখানি ঘরও না বাঁচে, বুঝলি? যদি কেউ দেখতেই পায়, কি বাধাই দেয়—তবে তাকে শেষ ক'রে দিয়ে আসবি।

—খুন? রতন হুকুমটা বোধকরি বেশ করিয়া সমঝাইয়া লইতে চাহিল।

—হ্যাঁ, খুন। হেমাঙ্গবাবু সকম্পিত কণ্ঠস্বরেই পুনরায় আদেশ দিলেন।

রতন আর কোন কথা বলিল না, চলিয়া গেল।

হেমাঙ্গবাবু উৎকণ্ঠিত চিত্তে রতনের প্রত্যাবর্তনের পথ চাহিয়া ছিলেন। দ্বিতীয় দিনে তাঁহার মনে হইল, উত্তেজনাবশতঃ এ হুকুম তিনি না করিলেই পারিতেন। কিন্তু রতন কি সে কাজ ফেলিয়া রাখিয়াছে! তৃতীয় দিন তিনি রতনের জন্যই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন, রতন ধরা পড়িল না ত! চতুর্থ দিন তিনি অন্য একজন পাইককে ডাকিয়া বলিলেন—রতনের বাড়িটা খোঁজ ক'রে আয় ত।

পাইকটা ফিরিয়া আসিয়া বলিল—আজ্ঞে, কারও দেখা পেলাম না। তার পরিবার কোথা গিয়েছে। ঘরে শেকল লাগান রয়েছে।

কিন্তু রতন ত ফেরে নাই। চিন্তিত হইয়া হেমাঙ্গবাবু পলাশবুনিতেই লোক পাঠাইলেন। কিন্তু তাহার পূর্বেই সব সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল। অপরাহ্ণেই জানা গেল, রতন দ্বিতীয় দিন রাত্রে তাহার স্ত্রীকে লইয়া এখান হইতে পলাইয়া গিয়াছে। ঘরে তৈজসপত্রের মধ্যে পড়িয়া আছে কয়েকটা ভাঙ্গা হাঁড়ি। পলাশবুনি হইতে সংবাদ আসিল, গ্রামও পোড়ে নাই—রতনও ধরা পড়ে নাই।

হেমাঙ্গবাবু স্তব্ধ বিস্ময়ে বসিয়া রহিলেন। নায়েব গোমস্তারা বলিল—এই লোকের ঐ ধারাই বটে। বেটা সেখানে কিছু টাকা খেয়ে পাঁয়তারা করেছে আর কি?

হেমাঙ্গবাবু সেদিন সমস্তদিন কুকুর দুইটার পরিচর্যায় মত্ত হইয়া রহিলেন।

*　　*　　*　　*

বৎসর খানেক পর হেমাঙ্গবাবু তাঁহার এক বন্ধুর নিমন্ত্রণে গেলেন হুগলী

জেলার একখানা গ্রামে। বন্ধুও তাঁহার অবস্থাপন্ন জমিদার। সেইখানে সহসা নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই তাঁহার রতনের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া গেল।

বন্ধু তাঁহাকে বলিলেন—এবার আমি এক বাঘ পুষেছি, দেখবে?

হেমাঙ্গ বিস্মিত হইয়া বলিলেন—বাঘ?

—হ্যাঁ বাঘ। যাকে বলে শেলেদা বাঘ।

—চলো, দেখি, কোথায়? হেমাঙ্গবাবু উৎসুক হইয়া উঠিলেন। বন্ধু বলিলেন, বসো না। এইখানে আনছে। ওরে তারাচরণকে ডেকে দে ত। হেমাঙ্গবাবু বলিলেন—বাঘ এখানে আনবে কি হে? না—না, এ সাহস ভাল নয়। এখনও বাচ্চা বুঝি?

—বাচ্চা নয়, বরং প্রৌঢ়।

—বলো কি? হেমাঙ্গবাবুর বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

—সেলাম হুজুর।

আভূমি নত সেলাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া রতন হেমাঙ্গবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া যেন নিশ্চল পাষাণ হইয়া গেল।

হেমাঙ্গবাবুর বিস্ময়ের অবধি ছিল না। তিনি কিছু বলিবার পূর্বেই বন্ধুটি রসিকতা করিয়া বলিলেন—নর-ব্যাঘ্র। শিকার দেখিয়ে শেকল খুলে দিলে তার আর নিস্তার নাই।

হেমাঙ্গবাবু বলিলেন—হুঁ।

এই সময় একজন কর্মচারী আসিয়া হেমাঙ্গবাবুর বন্ধুকে কি বলিতেই তিনি উঠিয়া বলিলেন—তুমি আলাপ করো এর সঙ্গে, আমি আসছি।

রতন হেমাঙ্গবাবুর পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

হেমাঙ্গবাবু প্রশ্ন করিল—তুই পালিয়ে এলি কেন?

রতন বলিল—আমি যে পারলাম না হুজুর কাজ করতে।

—কেন?

—কখনও যে আমি ও কাজ করিনি। আমি সব মিথ্যে ক'রে বলতাম। যেখানে যে খুন দাঙ্গা হ'ত, সব আমি নিজের নাম দিয়ে মিথ্যে ক'রে বলতাম।

হেমাঙ্গবাবু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু কেন এমন করতিস্? কে তোকে এ বিদ্যে শেখালে?

রতন শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তারপর মাথা হেঁট করিয়া অনাবশ্যক ভাবে মাটিতে দাগ কাটিতে কাটিতে বলিল, হুজুর, দশ বছর আগে, তখন আমার একটিমাত্র ছেলে। সেবার দেশে আকাড়া হ'ল এমন যে, না খেয়ে মানুষ মরতে লাগল। পেটের জ্বালায় দেশ ছেড়ে পালিয়ে আপনার সঙ্গে যেখানে প্রথম দেখা হয় ঐ চাকলায় আসি। এ চাকলায় ধানটান চারটি হয়েছিল, আমার সেই উপোষ সার! শরীরে বল ছিল না, খাটতে পারতাম না, ভিক্ষেও কেউ দিত না। তার উপর ছেলেটার হ'ল অসুখ। কোন কিছু করেও কিছু যোগাড় করতে পারলাম না। এক জমিদারের বাড়ি গেলাম—সেখানেও ভিক্ষে দিলে না, তাড়িয়ে দিলে। পথে আসতে আসতে আবার ফিরলাম। জমিদারকে গিয়ে বললাম, ভিক্ষে দেন—না হয় কাজ দেন। জমিদারবাবু বললেন, কি কাজ পারিস্ তুই? মরিয়া হয়ে বললাম—যা বলবেন, খুন, জখম, ঘরে আগুন লাগান—যা বলবেন, তাই করব। আশ্চর্য বাবু, জমিদারবাবু আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে একটা টাকা বকশিশ দিয়ে দিলেন। ছেলেটা ম'রে গেল সেই অসুখেই, আমি কিন্তু ফন্দিটা শিখে নিলাম। যেখানে যা খুন-জখম হ'ত বলতাম আমি করেছি। লোকে ভয় করত, যার দোরে দাঁড়াতাম, সেই আঁচলটা ভ'রে দিত, খাতিরও করত।

রতন চুপ করিল।

হেমাঙ্গবাবুও নীরব। কিছুক্ষণ পর তিনি বলিলেন—চল্, তুই আমার সঙ্গে ফিরে চল্। তোকে কিছু করতে হবে না।

রতন তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া বলিল—আর জন্মে আপনি আমার সত্যিই বাপ ছিলেন হুজুর।

* * * *

আশ্চর্য! পরদিন প্রাতেই কিন্তু দেখা গেল রতন স্ত্রীকে লইয়া কোথায় পলাইয়া গিয়াছে।

এবার আর হেমাঙ্গবাবু বিস্মিত হইলেন না। তিনি কল্পনানেত্রে দেখিলেন—আবার কোন দূরদেশে রতন আভূমি নত হইয়া সেলাম করিয়া কোন বর্ধিষ্ণু ব্যক্তিকে অভিবাদন করিতেছে—সেলাম হুজুর!

বিরাট কারখানা। ফায়ার ব্রিক্স তৈরি হয়, ফায়ার ক্লে সরবরাহ করা হয়। যুদ্ধের আরম্ভ হতেই কারখানাটি অকস্মাৎ বিন্ধ্যপর্বতের মত কলেবর স্ফীত ক'রে চলেছে। আধুনিক বিন্ধ্য—কোন দুর্বাসার কাছে নত হবে না। বরং বশিষ্ঠের কাছে নত হলেও হতে পারে, হতে পারে কেন, হবে। শান্তিরূপী বশিষ্ঠ যেদিন আবির্ভূত হবেন—সেইদিন সে মাথা নোয়াবে। অর্থাৎ যুদ্ধের শান্তি যতদিন না হবে ততদিন কারখানাটা বেড়েই চলবে। দেশের লোহার কারখানাগুলি দাঁড়িয়ে আছে এর উৎপাদনের ভিত্তির উপর। যুদ্ধবিভাগ থেকে মাল সরবরাহের গাড়ির ব্যবস্থা হয়েছে। টেলিগ্রামে ওয়াগনের ব্যবস্থা হয়। স্থানীয় রেল স্টেশনটার কর্মচারীরা বরাবরই কারখানার কর্তৃপক্ষকে খাতির করে; সে খাতির এখন বেড়ে গেছে। থানায় সরকারী হুকুম আছে—কারখানার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখতে। কোন অশান্তির সম্ভাবনা মাত্রেই সর্বপ্রকার সাহায্য তৎক্ষণাৎ দিতে হবে। কারখানার ম্যানেজারের মাইনে হাজার টাকা। থানার দারোগা মাইনে পায় একশো পঁচিশ—; খাতির সেও বরাবরই করে; এখন আটশো পঁচাত্তর টাকার বেশী মাইনের ওজনের ওপর সরকারী হুকুমের গুরুভার চেপে বসেছে। আগে দেখা হলে দারোগা নমস্কার ক'রে বলত—নমস্কার মিঃ বোস!—নমস্কার অবশ্য সম্ভ্রমভরেই করত। কিন্তু এখন সে সম্ভ্রমের সঙ্গে ভয় মিশেছে; দেখা হলে এখন চকিতভাবে সে নমস্কার ক'রে বলে—নমস্কার Sir! আগে নমস্কারের সঙ্গে হাসত; এখন হাসে না। আগেই যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা করত, কিন্তু আজকে অভ্যর্থনার সঙ্গে তার তুলনা হয় না। আজ সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আপনি Sir? আসুন, আসুন, আসুন!

—একটা ডায়েরী করতে এসেছি।

—ডায়েরী?

—ফণি মিস্ত্রী—; আপনি নিশ্চয় তাকে জানেন—সেই বুড়ো মিস্ত্রী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। খুব জানি। সে ত আপনাদের কারখানার গোড়া থেকেই আছে।

হ্যাঁ। সেই লোকটা।

—দুর্দান্ত মাতাল।

—হ্যাঁ।

—কিন্তু পাক্কা কাজের লোক।

ম্যানেজার হাসলেন।

দারোগা আবার বললে—ভারী হিতাকাঙ্ক্ষী লোক Sir, আমি আজ পাঁচ বছর রয়েছি এখানে। এমন faithful লোক কিন্তু হয় না।

ম্যানেজার বললেন—কাল কিন্তু লোকটা কতকগুলো যন্ত্রপাতি চুরি ক'রে পালিয়েছে।

—ফণি মিস্ত্রী চুরি ক'রে পালিয়েছে! দারোগার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।

—হ্যাঁ, ডায়েরীতে আপনি entry ক'রে নিন।

ম্যানেজার উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—স্টেশনে যাচ্ছিলাম—পথে ভাবলাম নিজেই inform ক'রে যাই। অন্য লোকও আসবে। আপনি গিয়ে তদন্ত ক'রে আসবেন।

মোটরের দরজা খুলে ম্যানেজার বললেন—You must find that devil out. আমরা Company থেকে এর জন্যে reward দেব।

ফণি মিস্ত্রী। ষাট বৎসর বয়সের প্রৌঢ়; কিন্তু জোয়ানের চেয়ে কম কর্মঠ নয়। কেবল এখন হাঁপ ধরে একটু। বড় বড় মেশিনের দশ পনের মণ ভারী অংশগুলো হাবিসের সময় দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে তার বিরক্তি ধ'রে যেত। অকস্মাৎ এগিয়ে এসে হাবিসের বোলে বাধা দিয়ে ভেঙিয়ে বলত—হেঁইয়ো! হেঁইয়ো! হেঁইয়ো! বেটারা সব ভাত খাবার যম। ভাগ্। তারপর সে হাবিসের ডাণ্ডায় কাঁধ লাগিয়ে ধীরে ধীরে সোজা হয়ে উঠত। চোখেমুখে রক্তোচ্ছ্বাস ছুটে আসত—মনে হ'ত—রক্ত বুঝি এখুনি ফেটে পড়বে। পিঠে বুকে হাতে গুলগুলো ফুলে ফুলে দাঁড়িয়ে উঠত পাথুরে অসমতল শক্ত কালো মাটির মতো। বিস্ফারিত ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দেখা যেত দু'পাটি দাঁত—পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসেছে মেশিনের খাঁজকাটা চাকার মত। প্রকাণ্ড লৌহ-কঙ্কাল শক্তি এবং কৌশল দুইয়ের প্রচণ্ড এবং নিপুণ প্রয়োগে—এগিয়ে চ'লে যেত পাঁকাল মাছের মত।

ফণি মিস্ত্রী কালও ছিল। সন্ধ্যাবেলাতেও সে পুরানো ইঞ্জিন ঘরে ব'সে বিড়ি

টেনেছে। মধ্যে মধ্যে পকেট থেকে মদের শিশি বের ক'রে খেয়েছে। ঠিক সাড়ে আটটার সময় ক্লাব-ঘরে এসে রেডিয়োর সামনে ব'সে গান শুনে গেছে। অন্তে ঠিক এটা ধরতে না পারলেও ফণি ধরেছিল, সাড়ে আটটা থেকে ন'টার মধ্যে কোন-না-কোন গায়িকাতে গান গায় এবং এটাও সে আবিষ্কার করেছিল—সে গানগুলি রেকর্ডের গান নয়। সুতরাং আপনার মনের তর্ক-যুক্তির অভ্রান্ত বিচারের বিশ্বাসে—রেডিয়োর সামনে গান শুনত আর অনুভব করত গায়িকার সান্নিধ্য; মনে মনে গায়িকার একটি কাল্পনিক মূর্তিও গ'ড়ে তুলত। তালের মাথায় বাহবা দিত। সে বাহবা সে কালও দিয়ে গেছে।

গত মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ১৯১৯ কি ১৯২০ সালে এ কারখানার পত্তন হয়েছে। পলাশের জঙ্গল কেটে পাথুরে ডাঙ্গার উপর খাপরায় ছাওয়ানো তিন কুঠরি একখানা ঘর, ছোট একটা রান্নাঘর, আর প্রকাণ্ড একটা খাপরার চালা—এই নিয়ে কারখানার আরম্ভ। লোকজন বলতে জন-পাঁচেক। কালো প্রকাণ্ড দেহ, আকর্ণ বিস্তার মুখ-বিবর, বড় বড় দাঁত, ভাঁটার মত চোখ, ম্যানেজারবাবু, একজন দারোয়ান, একজন কেরানীবাবু, একজন মালবাবু, আর ওই ফণি মিস্ত্রী। আরও দু'জন স্থানীয় লোককে জোটানো হয়েছিল। একজন ঠাকুর, একজন চাকর। ম্যানেজারবাবু আবার স্থায়ীভাবে থাকতেন না। সপ্তাহে তিন দিন—শুক্র, শনি, রবি; বৃহস্পতিবারে রাত্রে এসে তিনটে দিন হৈ-চৈ, 'হুড়ুম-দুড়ুম', তৈরী জিনিস ভেঙে, নতুন জিনিসের ফরমাশ দিয়ে, মদ পাঁঠা খেয়ে—সোমবার সকালে আবার রওনা দিতেন। তখন ফণিই ছিল এখানকার সর্বেসর্বা। লেখাপড়া যেটুকু জানত সেটুকু না-জানাই; মোটা মোটা আঁকা বাঁকা অক্ষরে অতি প্রয়োজনে ম্যানেজারকে নিজে হাতে গোপন পত্র লিখত—"সিচরনেশু, এখানকার কাজে একটা বেপার হইয়াছে, পাশের সায়েব কোমপানী—খুব চুলবুল লাগায়েছে। আমাদিগে ইখান থেকে ভাগাবার মতলব। আপুনি শ্রীগ্র আসিবেন। সাক্ষাতে সব বলিব। মালবাবুর গতিক সতিক সুবিধের লয়। আসিবার সময় হরিনারান বল্টু গণ্ডাকয়েক এবং শক্ত ফিতা আনিবেন।" নীচে নাম সই করত, কিন্তু ইংরেজীতে আঁকা বাঁকা অক্ষরে লিখত পি. মিস্তিরী। অবশ্য বোঝা যেত না, কারণ সইটা এমন টেনে করত যে, মনে হ'ত ওটা কোন হিজিবিজি অথবা কোন পাকা বড় সাহেবের সই।

'হরিনারান বল্টু'—হোল্ডিং নাট বোল্ট। ফিতা-বেল্টিং। বাংলার যে সব জেলা এখন বেহারের মধ্যে ঢুকেছে সেই সব কারখানা-প্রধান অঞ্চলের শ্রমিকদের এগুলি নিজস্ব ভাষা। এমন কথা অজস্র—শ্যাফ্‌ট্‌—শাপ্টু, ট্রলি—টালি, ভাল্‌ভ—ভাল্‌বু, গেজ কর্ক—গজ কাক, হ্যামার—হাম্বর ইত্যাদি।

এই 'হাম্বর' পিটতেই সে প্রথম ঘর ছেড়ে এসেছিল কারখানার কাজে, কারখানা পত্তনেরও পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে। জাত কামারের পনেরো ষোল বৎসর বয়সেই বেশ শক্ত সমর্থ দেহে ছেলেটি এসে কাজ নিয়েছিল একটি কলিয়ারীতে। কলিয়ারীর কামারশালায় এসে ভর্তি হয়ে শুনলে—হাতুড়ির নাম 'হাম্বর'। কলিয়ারীটা এই কোম্পানিরই কলিয়ারী। কিন্তু তখন কোম্পানি ছিল চিঠির কাগজের মাথায় ছাপানো নামে। মালিকবাবু আসতেন দশাশয়ী পুরুষ, আমীর লোক, সঙ্গে আসতো ফলমূল, তরিতরকারী, কেসবন্দী বিলিতী মদ, বেতের খুপ্‌রিওয়ালা বাক্সে সোডা; শীতকাল হলে গলদা চিংড়ি, বর্ষা হলে ইল্‌শে মাছ, ছোট্‌ছেলের মাথার খুলির মত কাঁকড়া। কলিয়ারীর নাম ছিল কুঠি; কুঠিতে সমারোহ প'ড়ে যেত। প্রতি মালকাটার দলে পেত খাসি এবং মদের দাম, বাবুদের মেসে হ'ত 'ফিষ্টি'; তারা মালিকবাবুর-আনা জিনিসের ভাগ পেত, আরও মঞ্জুর হ'ত খাসির দাম। ম্যানেজারবাবুর বাংলায় মালিকবাবুর আসর পড়ত। যাবার সময় বকশিশের ছড়াছড়ি। আট আনা থেকে আরম্ভ ক'রে পাঁচ টাকা পর্যন্ত।

চার বৎসর পরে সে মালিকবাবুর সুনজরে পড়েছিল। তখন সে আর হাম্বর পিটত না। তখন সে ছোট মিস্ত্রী। তার গুরু বড় মিস্ত্রী তখন প্রায় ব'সে থাকত। ফণিকে বাহবা দিত। ফণি খাটত দৈত্যের মত। গুরুকে কোন কাজ করতে দিত না। প্রৌঢ়ও তাকে খুব ভালবাসত। তার বিদ্যা বুদ্ধি অকপটভাবে সে ফণিকে উজাড় ক'রে ঢেলে দিয়েছিল। শুধু তার যন্ত্রবিদ্যাই নয়—তার স্বভাব-চরিত্র জীবনদর্শন সব ফণিকে দিয়েছিল। ইঞ্জিন, বয়লার, পাম্প, শ্যাফট, পুলি প্রভৃতির নাড়ী-নক্ষত্র তাকে চিনিয়েছিল অদ্ভুতভাবে। খোলা ইঞ্জিনের অংশগুলি জুড়ে বয়লারের ষ্টীম পাইপের সঙ্গে যুক্ত ক'রে, বাষ্পশক্তির পথ মুক্ত ক'রে দিয়ে বলত—দেখ!

ইঞ্জিনের কাজ আরম্ভ হ'ত, ঝক্‌ঝকে তৈলাক্ত লৌহদণ্ডটা চলতে আরম্ভ

করত, সঙ্গে সঙ্গে বড় চাকাটার সঞ্চারিত ঘূর্ণমান গতি; প্রথমে ধীরে ধীরে তারপর ক্রমে দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে; চাকায় আবদ্ধ বেণ্টিং-বন্ধনের টানে অন্য চাকাগুলোও ঘুরত, দেখতে দেখতে টিনের শেডের অভ্যন্তরভাগ শব্দায়মান হয়ে উঠত, যন্ত্রগুলোর গতিশীলতার শব্দে, তার বেগে মাথার উপরে টিনের চালায় কম্পন সঞ্চারিত হ'ত, পায়ের তলায় বাঁধানো মেঝেও কাঁপত থর্‌থর ক'রে। আবার সে ব্রেক কষত অথবা বাষ্পশক্তির পথ বন্ধ ক'রে দিত, ইঞ্জিনটাও ধীরে ধীরে থেমে আসত। ফণি অবাক হয়ে দেখত!

ধীরে ধীরে সব সে শিখলে। ছোট একটি বোল্ট আল্‌গা থাকলে—কেমন কেমন শব্দ ওঠে—শব্দের সূক্ষ্ম পার্থক্যবোধ পাকা সেতারীর সুরবোধের মত পাকা হয়ে উঠেছিল। নানা লৌহ-যন্ত্রের রূঢ় উচ্চ শব্দ-সমন্বয়—সে যেন এক বিরাট ঐকতান বাদন, অথবা বিরাট লৌহ সেতারের বহুসংখ্যক তারের ঝঙ্কার। শুনবামাত্র কোন্ তারটিতে বেসুরা সুর উঠেছে, সেটিকে কতখানি টান ক'রে বাঁধতে হবে বা আল্‌গা করতে হবে—গুরুর শিক্ষায় ফণি সেটা বুঝতে পারত মুহূর্তে। আরবের শেখ যেমন ঘোড়া চেনে, এ-দেশের চাষীরা যেমন গরু চেনে, তেমনি চেনবার শক্তিতে গুরু তাকে মেশিন চিনতে শিখিয়েছিল। দেখবামাত্র সে বলতে পারত—কত ঘোড়ার জোরের ইঞ্জিন অথবা কত ঘোড়ার জোর ছিল, এখন ঘ'ষে ক্ষয়ে কত ঘোড়ার জোর দিতে পারবে।

সঙ্গে সঙ্গে সে তাকে শিখিয়েছিল মেশিন কেনা-বেচার কমিশন নেবার কৌশল।

আর শিখিয়েছিল—মালিক অন্নদাতা প্রভু, মা-বাপ। ম্যানেজারকে সেলাম বাজাবে, কমিশনের ভাগ দেবে ডালি দিয়ে, কিন্তু জানবে ওই হ'ল আসল শয়তান। মালিক চাকরি দেয়—ম্যানেজার চাকরি খায়। কুসুর হলেও মালিক মাফ করে; যত ভাল কাজ তুমি করো—ম্যানেজার নিজের নামে চালায়।

আর শিখিয়েছিল মদ খেতে। বলেছিল—এ হ'ল 'ইস্টীম'। মদের বোতলের ছিপি খুলে বলত—খোল্ 'এ স্টপ কাক', চালাও ইস্টীম, শা-লা—দশ ঘোড়ার ইঞ্জিন চলবে বিশ ঘোড়ার কদমে।

নিজে খেয়ে বোতলটা বাড়িয়ে দিয়ে বলত—লে ব্যাটা—ইস্টীম কর্ লে। উৎসাহে সে হিন্দীতে বলত।

আর শিখিয়েছিল—নারীর চেয়ে ভোগ্য আর কিছু নাই। বলত—দেখ্-না, চেয়ে দেখ্।

মালিক—ম্যানেজার, বাবুরা, দারোয়ান, কে বাদ আছে?

নিজে সঙ্গে ক'রে তাকে রাণীগঞ্জে বেশ্যালয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ওই শ্রেণীর একটা বাড়িতে গিয়ে সে বাড়ির সমস্ত মেয়েগুলিকে ডেকে সামনে সারিবন্দী দাঁড় করিয়ে বলেছিল—বল্ তোর কাকে পছন্দ?

আর শিখিয়েছিল—ক্ষতি করতে হয়—উপর-ওয়ালার করবি। কিন্তু গরিবের ক্ষতি কখনও করবি না। কভি না। গরিব চুরি করছে দেখলে মুখ ফিরিয়ে চ'লে যাবি। ব'সে থাকিস ত ফিরে বসবি। খবরদার ক্ষতি করবি না। তবে তুই আর ওই শালা ম্যানেজারে তফাৎ কি?

এই কারখানা সে নিজে হাতে গড়েছিল। সে আর ইট-মিস্ত্রী বুড়ো এনায়েৎ খাঁ। কারখানার যন্ত্রপাতি, শেড তৈরির বীম, র্যাফ্টার, অ্যাঙ্গেল, টি,—বোল্ট-নাট এনে কাজ আরম্ভ করেই—বুড়ো এনায়েৎকে নিয়ে আসে। নিয়ে এল ঐ পাশের সায়েবদের কারখানা থেকে ছাড়িয়ে। পাকা দাড়ি, পাকা চুল, মাথায় পাগড়ী বেঁধে সায়েবদের কারখানায় বুড়ো বয়সেও এনায়েৎ ছোট মিস্ত্রী হয়ে কাল কাটাচ্ছিল। এদিকে এখানে 'চিনামাটির' কারখানা—সে কাজ সে জানে না। রাক্ষুসে ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে সেদিন এসেছিলেন মালিকবাবু। প্রকাণ্ড বড় একটা খাসী সন্ধ্যের আগেই প'ড়ে গিয়েছে। এক ইঞ্চি পুরু চর্বিতে ছোট গামলাটা ভ'রে উঠেছে। বেঁটে ছোট্ট মোটা বিলিতী হুইস্কীর বোতল খুলে বসেছেন দু'জনে! ফণির ডাক পড়ল!

প্রণাম ক'রে হাত জোড় ক'রে বসেছিল।

এতবড় খাসীটার একটা লম্বা মোটা হাড় ম্যানেজার কষের দাঁতে ভাঙছিল মড়মড় ক'রে। বড় বড় চোখ দুটো কুঁচের মত লাল হয়ে উঠেছে। বাবু বসেছিলেন গম্ভীরভাবে।

কেউ কিছুই বলেন নাই। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে ফণিই বলেছিল—হুজুর!

মালিক মুখ ফিরিয়ে বলেছিলেন—ইট-মিস্ত্রী চাই। এক হপ্তার মধ্যে।

ফণি বলেছিল—আমি চেষ্টার কসুর করছি না হুজুর।

—এক হপ্তার মধ্যে চাই।

খাসীর হাড়টা ম্যানেজারের দাঁতের মধ্যে বোধ হয় গুঁড়ো হয়ে গেল সেই মুহূর্তে। তিনি বলেছিলেন—ব্যাটার মাথা চিবিয়ে খাব নইলে।

ফণি মাথা চুল্‌কে বলেছিল—দেখি আজ্ঞা।

মালিক অভয় দিয়েছিলেন—টাকার জন্য ভাবিস্ নে।

—যে আজ্ঞা। ফণি প্রণাম ক'রে উঠে বলেছিল—কালই দেখছি আমি।

—দাঁড়া।

—আজ্ঞা।

—ওইটে নিয়ে যা। বোতলটা।

আর একটা প্রণাম ক'রে বোতলটা নিয়ে সে বেরিয়ে এসে সেদিন মদ খেয়ে নেচেছিল। মালিক তাকে মদের প্রসাদ দিয়েছেন। বিলিতী মদ। কি তার! কি নেশা!

পরের দিনই সে সায়েবদের কারখানা থেকে নগদ পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ভাঙ্গিয়ে নিয়ে এল একটা সুন্দরী যুবতী কামিনকে। মেয়েটা এনায়েতের অনুগৃহীতা।

তারপরের দিন এনায়েৎ এল দাঙ্গা করতে।

ফণি দারোয়ানকে বসিয়ে দিলে বন্দুক নিয়ে। দাঙ্গা হ'ল না, বচসা হ'ল। শেষ পর্যন্ত ফণি গাঁজার কল্কে সেজে বললে—হাঙ্গামায় কাজ নেই; তুমি এইখানে এসো, এখানকার বড় মিস্ত্রী হবে তুমি, ওখানকার চেয়ে দশটাকা মাইনে বেশী পাবে। আর ও কামিনটাকে কাজ করতে হবে না,—তোমার ঘরে থাকবে, তার হাজরি পাবে।

এনায়েৎ এ কথার উত্তর দিতে পারলে না।

ফণি গাঁজার কল্কে দেখিয়ে এবার আহ্বান জানালে—এসো, বসো, খাও।

এনায়েৎ এল, বসল—গাঁজা খেলে। পরের দিন গভীর রাত্রে এনায়েৎ এসে হাজির হ'ল—আরও দুই বিবি নিয়ে; এই কারখানার গাড়িতে বোঝাই হয়ে এল তার মালপত্র।

তারপর কারখানা চলতে লাগল দ্রুততম গতিতে। ভাটার পর ভাটা, তৈরি করালে এনায়েৎ। ফণি বয়লার বসালে, ইঞ্জিন বসালে, নিকটের নদীটাতে পাম্প বসালে, মাটি গুঁড়ো করবার জন্যে গ্রাইণ্ডিং মেশিন বসালে, ম্যানেজার তাকে বই

থেকে ছবি দেখালেন—সে তাই দেখে তৈরি করলে কত হাত-গড়া যন্ত্র। কাঠের মিস্ত্রীকে দিয়ে ব'সে থেকে তৈরি করালে হরেক রকমের ছাঁচ। চালু হ'ল কারখানা। কালো মাটির তৈরী জিনিসগুলো পুড়ে মাখনের রং নিয়ে বজ্রকঠিন হয়ে বেরিয়ে আসতে আরম্ভ হ'ল। প্রথম যেদিন ভাটা পুড়ে মাল খালাস হ'ল সেদিন ফণির আনন্দের আর সীমা ছিল না।

সেদিন সে মদ খেয়ে তার সর্বাপেক্ষা প্রিয় মেশিন—ওই ইঞ্জিনটার উপর শুয়ে সেটাকে চুমো খেয়ে—পিঠ চাপড়ে আদরের আর বাকী রাখে নাই।

ফণি মিস্ত্রী ছিল কারখানার সর্বেসর্বা। কারখানাটার সমস্ত ছিল তার নখ-দর্পণে। বড় বড় যন্ত্রপাতি থেকে ছোট্ট স্ক্রচটির হিসাব পর্যন্ত তার মনে ছিল। গুদামের হিসেব মিলছে না; নতুন একটা 'পারালেবেল' নাই, কয়েকখানা ট্রলি লাইন পাওয়া যাচ্ছে না, কতকগুলো নতুন ইঞ্জিন-পার্টস এসেছে—সেগুলো নাই, সর্বপ্রথমে যে পাম্পটা ব্যবহৃত হয়েছে সেটাও কোথায় উধাও হয়েছে। গুদামবাবু মাথায় হাত দিয়ে ব'সে গেল। ছা-পোষা মানুষ—সাধারণ গৃহস্থ ঘরের ছেলে, বুকের পাটা অত্যন্ত কম; তার ওপর ম্যানেজার বসিয়ে দিলেন তার কোয়ার্টারের দরজায় দারোয়ান। ফণি ছিল না। সে গিয়েছিল রাণীগঞ্জ। কাজ কোম্পানির —একটা কলিয়ারীতে কিছু লোহালক্কড়ের সন্ধানে পাঠিয়েছিল তার গুরু। সে চার দিনের জায়গায় আট দিন কাটিয়ে এল! বিক্রেতার কাছে কমিশন পেয়েছিল —প্রায় একশো টাকা, সে টাকাটার আর অবশিষ্ট আছে কুড়ি টাকা কয়েক আনা। এ ছাড়া কোম্পানির কাছে রাণীগঞ্জ যাওয়া-আসার এবং থাকার বিল হয়েছে পঁচিশ টাকা। যে মেয়েটির বাড়িতে সে ছিল, তাকে সে একখানা গয়না গড়িয়ে দিয়েছে, খুব দামী অবশ্য নয়—তবু পঞ্চাশ টাকা লেগেছে।

সে এসে দেখলে কারখানায় হৈ-চৈ প'ড়ে গেছে। খোদ মালিকবাবু পর্যন্ত কলকাতা থেকে এসে হাজির। গুদামবাবুকে পুলিসে দেওয়া হবে কিনা তারই সমালোচনা চলছে। কলকাতা আপিসের ম্যানেজার এসেছেন, তিনিই চান পুলিসে দিতে। তিনি একেবারে সায়েব মানুষ; দয়া-মায়া—পুরানো চাকর এ সব কথা হলেই বলেন—রাবিশ।

ম্যানেজারবাবু বলছেন—বেটাকে ঘরের মধ্যে পুরে দে দমাদম্।

মালিক চুপ করেই আছেন।

ফণি এসে সব শুনে গিয়ে প্রণাম ক'রে দাঁড়াল। বললে—দেখি আজ্ঞা আমি একবার মিলায়ে দেখি। তবে পুরানো পাম্পুটার কথা বলছি—সিটাতে ত কিছু ছিল না।

কলকাতা আপিসের ম্যানেজার বললেন—কিছু ছিল-না-ছিল ত কথা নয়। জিনিসটা গেল কোথায়?

—আজ্ঞা যাবে কোথা? নতুন পাম্পু এল—সিটা তুলে এনে ওইখানে ফেলা হয়েছিল,—নতুন বাংলার ভিত কাটার সময়—মাটি তুলে ফেললে, মাটি চাপা পড়েছে। খুঁড়লেই মিলবে।

কথাটা এবার ম্যানেজারেরও মনে পড়ল, এবং সঙ্গে সঙ্গে মাটি খুঁড়ে পাম্পটা ঠিকই পাওয়া গেল।

—ইঞ্জিন পার্টস?

—সে ত আজ্ঞা ইঞ্জিনে লাগানো হয়েছে। একেবারে ইষ্টিশান থেকে ইঞ্জিন শেডে মাল খুলে আমি লাগিয়েছি।

ম্যানেজার, মালিক এবং কলকাতা আপিসের ম্যানেজারকে নিজে নিয়ে গিয়ে ইঞ্জিনে লাগানো অংশগুলো বিলিতী মার্কা মিলিয়ে দেখিয়ে দিলে।

—পুরানোগুলো?

—সেগুলা দেখছি আজ্ঞা।

—ট্রলি লাইন?

—সি লাগানো আছে নূতন শেডে, ক'খানা টি-য়ের অভাব পড়ল, কি করব, পড়েছিল লাগায়ে দিলাম। ম্যানেজার বাবুকে বলেছিলাম।

ম্যানেজারের মনে পড়ল এবার।—হাঁ বটে; এখন ইঞ্জিনের পুরানো পার্টসগুলো আর পারালেবেল।

—দেখি আজ্ঞা খোঁজ করে।

গুদামবাবুকে সঙ্গে ক'রে সে বেরিয়ে এল। গুদামবাবু হাত চেপে ধ'রে বললেন—মিস্ত্রী আমাকে বাঁচাও।

—বাঁচাও! ইঞ্জিনের সেগুলা করলি কি? আমি যে তুর গুদামে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বোঝ ক'রে দিয়েছি।

—আমার মেয়ের বিয়ের সময়—। গুদামবাবু বলতে পারলে না, কেঁদে ফেললে।

—হুঁ কত টাকায় বেচেছিস? কাকে বেচেছিস?

—ওই মাড়োয়ারী স্টোর সাপ্লায়ার্সের কাছে—পাঁচশো টাকা ধার করেছিলাম। টাকার জন্তে তাগাদা করে—বললে নালিশ করব। সে-ই সেগুলো নিয়ে গেছে, দাম এখনও ঠিক হয়নি।

—হুঁ। পারালেবেলটা চুরি করেছে—ইব্রাহিম রাজমিস্ত্রী—আমি জানি। কিন্তু খবরদার বলবি না; তাহ'লে তুর মাথাও খেয়ে দিব আমি। এই টাকা লে—একজনা কাউকে দে পাঠায়ে বাজারে। নিয়ে আসুক কিনে।

সন্ধ্যায় পারালেবেলটা হাতে ক'রে হাজির হয়ে বললে—আজ্ঞা ইটা ছিল ইব্রাহিমের কাছে। তাড়াতাড়ি আমি নিয়ে গিয়েছিলাম গুদাম থেকে, তখন উদিকে ইঞ্জিন বসছে। কাজ সেরে দিলাম ইব্রাহিমকে—বেটা গাধা—নিজের কাছেই রেখেছিল।

—ইঞ্জিন পার্টস?

মাথা চুলকিয়ে ফণি বলল—মড়ার হাড়—ইয়ের হিসেব কি মেলে? নতুন জিনিস এল পুরানো রদ্দিগুলা ছাড়ায়ে ফেললাম! ইঞ্জিন ঘরের আশেপাশে প'ড়ে ছিল—অনেকদিন; তা খুঁড়লেও মিলতে পারে, আবার কুলি কামিনে নিয়েও যেতে পারে।

মালিকের হাতে তখন গ্লাস। কলকাতা আপিসের ম্যানেজার বললেন—তার দাম তাহ'লে তোমাকে লাগবে।

—তা যখন অন্যায় করেছি তখন দিতে হবে আমাকে।

মালিক গ্লাসটা শেষ ক'রে বললেন—ম্যানেজারবাবু, ফণি মিস্ত্রীকে পঞ্চাশ টাকা বকশিশ। এখুনি দিয়ে দিন।

একটা প্রণাম ক'রে ফণি বললে—হুজুর, গরিব গুদামবাবুর বেটীর বিয়েতে পাঁচশো টাকা ধার হয়েছে। গরিব বিনা দোষে—।

সে মাথা চুলকাতে লাগল।

মালিক বললেন—দশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দাও ওর।

হঠাৎ যেন কাল পাল্‌টে গেল, অন্ততঃ ফণির তাই মনে হ'ল। ১৯৩০ সালের

স্বদেশী হাঙ্গামার মতন তার মন্দ লাগেনি! সেও খদ্দর পরেছিল, দোকানে মদ কেনা বন্ধ ক'রে দিয়ে নদীর ধারে মদ চোলাই শুরু ক'রে দিয়েছিল। কিন্তু সে সব হাঙ্গামা থেমে গিয়ে হঠাৎ কারখানায় ধর্মঘট আরম্ভ হয়ে গেল।

ফণি হতবুদ্ধি হয়ে গেল, কোন্ দিকে সে যোগ দেবে বুঝতে পারলে না। প্রথম যেদিন মিটিং হয় সেদিন তুলু সিংগী, হতভাগা তারই কাছে কাজ শেখে, তাকেই দিলে সভাপতি ক'রে, প্রথমটা মন্দ লাগে না ফণির। চেয়ারে ব'সে ফুলের মালা গলায় দিয়ে সে বেশ বুক ফুলিয়ে বসেছিল।

কিছুক্ষণ পরই কিন্তু ফণি চঞ্চল হয়ে উঠল। যে লোকটি মিটিং করার জন্য এসেছে—সে এসব কি বলছে? মালিকদের আমরা এতদিন ব'লে এসেছি—মায়-বাপ, হুজুর-মালিক। ভেবে এসেছি ওরাই আমাদের খেতে-পরতে দেয়। এটা এতদিন ধ'রে ওরাই আমাদের বলিয়ে এসেছে; পাঠশালার গুরুমশায় যেমন অ-আ মুখস্থ করায় তেমনি ক'রে মুখস্থ করিয়েছে। মালিক মা-বাপ নয়, হুজুরও নয়, কারখানার মালিক হলেও আমার মালিক সে নয়। সে আমাকে খেতে-পরতে দেয় না। আমরা যা খাই, ছাতু-নিমক, আটা-দাল, ভাত-তরকারী—তার একটা দানাও সে আমাকে মেহেরবাণী ক'রে দেয় না। সেই-ই আমার খানার ভাগীদার;—আমার রোজগারের দানায় সে ভাগ বসায়—আমায় ভুল বুঝিয়ে—আমার মাথায় হাত বুলিয়ে। তোমরা ভেবে দেখ,—আমরা সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কি হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটি! বয়লারে কয়লা ঠেলি—ইঞ্জিন চালু রাখি—মেশিনে-মেশিনে কাজ করি। ভাটার আগুন-তাতে ঝল্‌সে যাই, পেটে ভর্তি ধুলো খাই—সর্বাঙ্গে কাদা মাখি; আমরাই এই কারখানায় খাটি—তবে মাল তৈরি হয়। আর সেই 'মাল' বিক্রি ক'রে মালিক মুনাফা করে লাখো-লাখো টাকা। সে খায় পোলাও, কালিয়া, পরে ফিন্‌-ফিনে ধুতি, গলায় উড়োয় রেশমী চাদর! দামী জুতো পায়ে দিয়ে মস্‌-মস্‌ ক'রে চলে; মটর গাড়িতে হাওয়া খেয়ে বেড়ায়; দোতলায় শোয়—দিন দিন সিন্দুকে জমায় হাজারে হাজারে টাকা। সে সমস্তই তারা করে—আমাদের দানা মেরে। অথচ আমরা কিছু বললেই ওরা আমাদের বলে বেইমান। ইমান আমাদের ওদের কাছে কি আছে? নিমক আমরা ওদের খাই না। ভগবানের, খোদাতালার দেওয়া আমার তাগদ্—সেই তাগদে আমি মেহন্নত করি, সেই মেহন্নতের রোজগার যারা আমাদের চোখে

ধুলো দিয়ে ঠকিয়ে নেয়—তাদের কাছে আমাদের কিসের ইমান? বেইমান তারা।

সভাপতির আসনে ব'সে ফণি ঘেমে সারা হয়ে গেল। এমন ধারার কথা উঠবে সে ভাবে নাই। চিরকাল সে মালিককে মনিব জেনে এসেছে; তার গুরু তাকে শিখিয়ে গেছে মালিক মনিবের ক্ষতি কখনও করবি না; মালিকের বকশিশ নিয়েছে; তার প্রসাদী মদ খেয়েছে; তার আদরের 'হারামজাদা' গালাগাল শুনে খুশি হয়েছে—তার মধ্যে সে স্নেহের সন্ধান পেয়েছে; তাদের সম্বন্ধে লোকটি এ কি বলছে? সে আজ সভাপতি না হ'লে সে-ই একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে তুলত। মালিকরা শুনলে কি বলবেন? তাছাড়া লোকটা কিছু জানে না। টাকা কার? আর বেশী চালাকী করলে মালিক যদি এঁটো ভাতের কুত্তার মত এদের তাড়িয়ে দেয় তবে এরা যে না খেয়ে মরবে!

সভাপতির আসন থেকেই সে বললে—ই-সব কথা আপনি ভুল বলছেন মশায়!

বক্তা থেকে সভার সকলেই একটু সচকিত হয়ে উঠল।

ফণি বললে—মশাই, কারখানা গাছের মত মাটি থেকে আপনি গজায়ে উঠে নাই। টাকা লেগেছে কাঁড়ি কাঁড়ি! মালিক সে গুলান আগাম ঘর থেকে বার করেছে।

বক্তা হেসে বললে—কারখানা যেমন মাটি থেকে আপনি গজান গাছ নয়, টাকাও তেমনি গাছের ফল নয়; মাটিতে ঝড়ে পড়েছিল না; মালিক কুড়িয়ে এনে ঘরে জমান নাই। ঘরে তিনি তৈরিও করেন নাই, সে টাকাও তিনি জমিয়েছেন—এমনি কোন পুরানো কারখানার মুনাফা থেকে। গরিব মজদুরের মেহন্নতের মজুরিতে জবরদস্তি ভাগ বসিয়ে।

ফণির মনে প'ড়ে গেল বাবুর পুরানো কয়লাকুঠির কথা। হাঁ—বাবু সেইখান থেকেই বড়লোক বটে, কিন্তু—কিন্তু—তবু তার বাবুকে—মনিবকে এমন ক'রে খারাপ কথা বলতে পারে না।—মনিবের শক্তি—হিম্মৎ জানে না। সে ব'লে উঠল—ই-সব কথা বলছেন আপনি—কুলিগুলানকে ক্ষেপায় দিছেন; কুলিরাই কল চালায়—হাঁ—ই-কথা ঠিক বটে। কিন্তু মালিক যখন কাল খেদায়ে দিবে সব, তখন কি হবে?

বক্তা হাসলে, বললে—মালিকের কারখানাও তাহ'লে বন্ধ হয়ে যাবে। মুনাফার চাকা ঘুরবে না।

ফণিও হাসলে—বললে—ইন্‌দিগে তাড়ায়ে মালিক নতুন লোক আনবে। তখন?

—নতুন লোকেরাও কুলি। আপনারাও আজ যা বলবেন—কাল তারাও এসে তাই বলবে। দুনিয়ার মজদুর যদি এককাট্টা হয়ে যায়—তখন? তখন কি করবে কারখানার মালিক? কথা ত তাই। সব এককাট্টা হো-যাও। এ কারখানার একজনকে তাড়ালে যদি সবাই চলে যায়, সবাই চ'লে গেলে দুনিয়ার মজুর যদি না আসে, তবে? তবে?

ফণি হতভম্ব হয়ে গেল। সভায় উপস্থিত কুলিরা হৈ-হৈ ক'রে উঠল। ঠিক বাত, ঠিক বাত!

বক্তা বললে—আমাদের মজুরি বাড়াতে হবে।

—আলবৎ!

—আমাদের খাটুনির সময় কমাতে হবে।

—জরুর।

—না হ'লে আমরা ধর্মঘট করব!

—জরুর! আলবৎ!

সভার মধ্যে সেই ছোঁড়া দুলু সিংগী, যাকে সে হাতে ক'রে মানুষ করেছে—সেই তাকে—বুড়ো—বাতিল সেকেলে লোক ব'লে গাল দিলে। বললে, বাঘকে বাচ্চা অবস্থায় ধ'রে প্রতিদিন মানুষ আদর ক'রে আফিং খাওয়ায়—সারাটা জীবন সে ভুলেই থাকে যে, সে জঙ্গলকে আমীর—রাজা। সে শুধু আফিংয়ের নেশায় ঝিমোয় আর ভাবে আফিং যোগানে-ওয়ালাই তার ভগবান; তার হাত চাটে। আমাদের মিস্ত্রী সাহেবের সেই নেশা লেগে আছে।

লোকে হো-হো ক'রে হেসে উঠল। ফণির মাথা হেঁট হয়ে গেল। কারখানার ভেতর হ'লে সে একটা লোহার ডাণ্ডা ছোঁড়াটার মাথায় বসিয়ে দিত।

ছোঁড়া কিন্তু চালাক। সে ফণিকে জানে। ফণি বেশ বুঝতে পারলে তার চালাকি! এই হাসিতে ছোঁড়া চিৎকার ক'রে ব'লে উঠল—খবরদার! হেসো না তোমরা। এ হাসির কথা নয়। মিস্ত্রী সাহেব আমাদের সত্যি-সত্যিই বাঘ।

তার হিম্মৎ, তার কিম্মৎ কত তোমরা জান না। ওই বাঘকে আফিংয়ের নেশা ছাড়াতে হবে; তারপর ওই লড়াই ভাই—ফণি-মিস্ত্রীকি—

লোকে চিৎকার ক'রে উঠল—জয়।

কারখানায় ধর্মঘট হ'ল।

পুরানো মালিক মারা গেছেন। টেলিগ্রামে পুরানো ম্যানেজার বাতিল হয়ে গেল। এলেন নতুন মালিক, নতুন ম্যানেজার। কাঁচা বয়েস, খাঁটি সায়েবী মেজাজ, চোস্ত ইংরাজীতে কথাবার্তা। এসেই ডাক দিলেন কুলিদের মাতব্বর ক'জনকে। মাতব্বরের মাথা সেই ছোঁড়া সিংগী। ফণিকে তারা ডাকলে না। ফণি মনে মনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। মালিক-ম্যানেজার মিটমাট ক'রে ফেললেন মজুরদের সঙ্গে।

সন্ধ্যের পর ফণি গেল বাংলোয় দেখা করতে। প্রণাম ক'রে হাত জোড় ক'রে দাঁড়াল! নতুন মালিক বললেন—কি চাই?

ফণি বললে—আজ্ঞা আমি ফণি-মিস্ত্রী।

—জানি। কিন্তু দরকার কি তোমার?

ফণি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

ম্যানেজার বললে—তুমিই ত মজুর-সভার সভাপতি?

ফণি জোড় হাত করেই বললে,—আজ্ঞা হাঁ।

—কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে তোমাদের ডেপুটেশনের লোকদের সঙ্গে। শুনেছ?

—আজ্ঞা—না।

—তাদের কাছেই শুনতে পাবে। কাল থেকে কাজ আরম্ভ হওয়া চাই। যাও।

কাজ আরম্ভ হওয়ার নামে ফণি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল,—আজ্ঞা হাঁ। হুজুর। এখুনি যাই আমি।

বেরিয়ে এসে কারখানার ধারে সে দাঁড়াল। কত আলো জ্বলে কারখানায়—সেই কারখানাটা অন্ধকার হয়ে আছে। এখানকার প্রতি ইঞ্চি জমি তার জানা, তার হাতের তৈরী এই শেড;—প্রতিটি মেশিন সে-ই বসিয়েছে—তারও এ

অন্ধকারে পা বাড়াতে ভয় হচ্ছে। কত শব্দ কারখানায়। বয়লারের ষ্টীমের শব্দ, ঠিক তালে তালে ইঞ্জিনের শব্দ, বেণ্টিংয়ের ঘোরার শব্দ, ঘূর্ণিত শ্যাফ্‌টগুলোর শব্দ, গ্রাইণ্ডিং মেশিনের শব্দ, এই মহাধ্বনির আঘাতে শেডের টিনের কম্পন-ঝংকার—সব স্তব্ধ। এই সব বিচিত্র শব্দগুলির মধ্যে কোন একটি শব্দ, সে বয়লারের ষ্টীমের শব্দ বা শ্যাফ্‌টগুলোর ঘূর্ণনের ধাতব ধ্বনি—কিংবা টিনের চালের ওই ঝংকারের মধ্যে বেজে ওঠে যে বাজনার সুর, সেই সুরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কুলিকামিনে কতজনে কত গান করত; সে সব আজ চুপ-চাপ। পুজোর পর প্রথম প্রথম রাত্রে যেমন চণ্ডীমণ্ডপ খাঁ-খাঁ করে—কারখানাটাও সেই রকম খাঁ-খাঁ করছে। সব তার নিজের হাতের গড়া। ধর্মঘটের প্রথম দিন কারখানার এই স্তব্ধতা তাকে অত্যন্ত ব্যথিত ক'রে তুলেছিল। সে অধীর হয়ে কারখানায় যেতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু ওই ছোঁড়া ঢুলু সিংগীই তাকে যেতে দেয় নি। সে পা দিয়েছে কারখানার ফটকে, অমনি পিছন থেকে টান পড়ল—কে?

ঢুলু বললে—আমি। আমাদের ছেড়ে যাবে তুমি মিস্ত্রী? এতগুলো লোকের রুটি।

মিস্ত্রীর মনে হ'ল সব গরিবের মুখ। কারখানায় ঢুকতে সে পারেনি।

পরদিন ভোর বেলায় কারখানায় ফণি এল সর্বাগ্রে। বয়লারের ফায়ারম্যানটা আসতেই ধমক দিয়ে বললে—এত দেরি ক'রে? নে, মার কয়লা। জল্‌দি ষ্টীম উঠাও।

সে ব্যগ্র হয়ে চেয়ে রইল ষ্টীমের চাপ-নির্দেশক যন্ত্রটার দিকে। ঘড়ির কাঁটার মত কাঁটাটা থর-থর-থর ক'রে কাঁপছে। ফণির দেহের মধ্যে রক্ত-স্রোত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তার নিজের হাতে গড়া কারখানা। ইঞ্জিনের চালকটাকে ঠেলে দিয়ে সে নিজে বসল চালাবার জায়গায় ঐরাবতের মাহুতের মত।

ষ্টীম এসে ঠেলা মারছে। সিলিণ্ডারের মধ্যে বাষ্পশক্তি বর্ষার আকাশের ক্রমবিস্তৃত-কলেবর পুঞ্জিত মেঘের মত ফুলে ফুলে উঠছে। ধাক্কা খেয়ে পিস্টনের ঠেলায় প্রকাণ্ড বড় লোহার চাকাটার সঙ্গে আবদ্ধ লোহার দণ্ডটা—নিচে থেকে উপরে উঠছে—চাকারা নড়ছে। চলবে—এইবার চলবে।

সিংগী ছোঁড়া এল। হেসে বলল—সেই ভোরে উঠে এসেছো? ফণি কোন উত্তর দিলে না।

ছোঁড়া বললে—আফিংয়ের নেশা!—ব'লে ঠাট্টা করবার জন্যেই একটা হাই তুলে তুড়ি দিলে।

ফণি ছোঁড়ার ঘাড়ে লাফিয়ে প'ড়ে বোধ হয় ঘাড়টা ভেঙ্গে দিত। কিন্তু সেই মুহূর্তেই, শেডে ঢুকল নতুন ম্যানেজার। সিংগী ছোঁড়াটা ম্যানেজারের সামনে দিয়েই গট্‌গট ক'রে চ'লে গেল,—মাথাও নোয়ালে না—শুধু হাত তুলে ছোট্ট সেলাম দিয়ে চ'লে গেল। ফণি মনে মনেই বললে—বড় বাড় হয়েছে তোমার। "অতি বাড় বেড়ো না—ঝড়ে ভেঙ্গে যাবে।"

নিজে উঠে সে সসম্ভ্রমে সেলাম করলে।

ম্যানেজার বললে—তুমি না ফিটার?

—আজ্ঞা হাঁ; আমি ফণি মিস্তিরী।

—ইঞ্জিন ড্রাইভার কোথায়?

—ওই যে!

—তবে তুমি ইঞ্জিনে রয়েছ? কিছু খারাপ হয়েছে নাকি?

—না আজ্ঞা। উ আপনার তাজী জোড়ার মত ঠিক আছে।

—তবে?

হেসে ফণি বললে—আমি আজ্ঞা সবই করি।

ম্যানেজার বললে—না। যার যা কাজ সে তাই করবে। তোমার কাছে বেশী কাজ কোম্পানি চায় না।

ফণি অনুভব করলে তার প্রতিপত্তি সম্মান সব চ'লে গিয়েছে, উবে গিয়েছে যাদুর ভাটার মত। আপিসে তার পরামর্শ নেবার জন্যে তাকে আর ডাকে না, কুলি-মজুর-বাবু কেউ তার কাছে আসে না, বলে না—মিস্ত্রী তুমি বাঁচাও! হৈ-চৈ স্বভাবের ফণি-মিস্ত্রী কেমন শান্ত মানুষ হয়ে গেল! তবে তার একটা সান্ত্বনা—প্রত্যহ গোটা কারখানাটার কোথাও না কোথাও তার ডাক পড়ে; সে না হ'লে কারখানাটা অচল। ম্যানেজার উদ্বিগ্ন মুখে বলে—ফণি—এটাকে আজই সেরে না ফেলতে পারলে ত ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যাবে!

ফণি সঙ্গে সঙ্গে জামাটা ছেড়ে ফেলে সবল বাহু দু'খানি বের ক'রে, যন্ত্র বাগিয়ে ধ'রে ব'সে যায়।—দেখছি আজ্ঞা!

ঠুক্-ঠাক্-ঠন্-ঠন্—হাতুড়ির ঘা মারে! দাঁতে দাঁতে টিপে দুই হাতে ঠেলে

রেঞ্চ দিয়ে বোল্ট-নাট কষে। গা দিয়ে ঘাম ঝ'রে পড়ে। কখনো স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মেশিনটার দিকে—ভাবে। কুলি-কামিন সকলে উৎকণ্ঠিত হয়ে চেয়ে থাকে তার মুখের দিকে। মধ্যে মধ্যে সভয়ে, সসংকোচে প্রশ্ন করে—মিস্তিরী!

মিস্ত্রী হেসে আশ্বাস দিয়ে বলে—থাম-থাম—হচ্ছে-হচ্ছে।

ঘরে এসে ওই কথা ভাবে আর মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসে। বোতল নিয়ে ব'সে গেলাসে ঢালে আর খায়। তার হাতে গড়া কারখানা, তাকে হঠায় কে?

এমন সময় এল যুদ্ধের বাজার। কারখানার কাজ হু-হু ক'রে বাড়তে লাগল। ফণি খাটতে লাগল দানবের মত। একটা শেডই সে বানিয়ে ফেললে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে! তিন চারগুণ মজুর, দিনরাত পরিশ্রম। প্রকাণ্ড উঁচু শালের খুঁটি পুঁতে মাথায় পুলি বেঁধে—সেখানে সন্ধ্যাবেলায় দড়ি টেনে উঠিয়ে দিত বড় বড় শক্তিশালী স্টোভ ল্যাম্প। নিজে সে চালের ফ্রেমে উঠে লোহার টি অ্যাঙ্গেলে ছাঁদা-ছাঁদি ক'রে বোল্টনাট কষত।

শেডের মধ্যে বসবে বিদ্যুৎ-শক্তির যন্ত্রপাতি নতুন ইলেকট্রিক ইঞ্জিনীয়ার সরু শিথার মত তারে তারে গোটা কারখানার দেওয়ালে ছেয়ে দিলে। তারপর যন্ত্রগুলোর সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র কৌশলে যোগ করলে। চালের মাথা থেকে তারের প্রান্তে ঝুলিয়ে দিলে সারি সারি আলো। পথের ধারে খুঁটি পুঁতে তাতেও ঝুলিয়ে দিলে আলো। তারপর একদিন সে টিপে দিলে ছোট্ট পেরেকের মাথার মত একটি যন্ত্রের মাথা। সমস্ত কারখানাটা দিনের মত আলো হয়ে গেল। শুধু শেডের ভিতরটাই নয়, কারখানাটার আশপাশের প্রান্তর, বাংলো, মেস, এমন কি ফণির কোয়ার্টার পর্যন্ত।

ফণি উল্লসিত উচ্ছ্বাসে নেচে উঠল। ইলেকট্রিক আলো সে দেখেছে, বিজলীর ভোজবাজির কেরামতির কথা সে শুনেছে কিন্তু এমন ক'রে হাতে-কলমে তাকে তৈরি করতে সে জানে না, কখনও দেখেনি, মনে মনে সে ওই তরুণ ইলেকট্রিক ইঞ্জিনীয়ায়ের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করবে স্থির করলে। তরুণটির কৃতিত্বে চাতুর্যে প্রৌঢ় যন্ত্রশিল্পী মুগ্ধ হয়ে গেল। প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে সে ইঞ্জিনীয়ারটির পিঠ চাপড়ে ব'লে উঠল—বহুৎ আচ্ছা! জিতা রহো ভাই!

ইঞ্জিনীয়ার দু-পা পিছিয়ে গিয়ে বললে—**What's that?**

ফণি অপ্রস্তুত হয়ে গেল।—না—না—না! আর কিছু সে বলতে পারলে না।

কিন্তু এইখানেই ব্যাপারটা শেষ হ'ল না। ম্যানেজারের কাছ পর্যন্ত গড়াল। ম্যানেজার তাকে ডেকে বললে—মাফ চাইতে হবে তোমাকে।

—মাফ চাইতে হবে?

—নইলে তোমাকে আমি সাসপেণ্ড করব পনের দিনের জন্যে।

ফণি মাফ চাইতে পারল না। কোনমতে সে বুঝতে পারলে না—সে কি অপরাধ করেছে। বললে—তাই করুন আজ্ঞা। মনে মনে বললে—দেখা যাক। ফণিকে সাসপেণ্ড ক'রে কারখানা কেমন ক'রে চলে, দেখা যাক। ইঞ্জিনে খুঁত দেখা দিয়েছে। রোজ ফণিকে এখন সেখানে হাতুড়ি ঠুকতে হয়—কোথায় কতটুকু লোহার টুকরো প্যাকিং দিতে হয়, সে হিসেব ওই ছোকরার মাথায় আসবে না।

তিন দিনের দিন কারখানা বন্ধ হ'ল।

ফণি হাসলে মনে মনে। ওদিকে আবার কুলি মজুররা উস্‌খুস্‌ করছে। তাদের মাগ্‌গি ভাতা চাই। কম দামে তাদের চাল-ডাল-আটা-তেল-নিমক চাই। ফণি ঠিক করলে এবার সেও লাগবে। মাতবে। থাক কারখানা বন্ধ। তাকে ডাকলে সে যাবে না। কখনও যাবে না। অচল ইঞ্জিনটা তাকে না হ'লে চলবে না। সে জানে। জ্বলুক শুধু আলোই জ্বলুক। নিথর নিস্তব্ধ যন্ত্রপাতি প'ড়ে থাক জগদ্দল পাহাড়ের মত। সে জানে যাদু। সে যতক্ষণ না বলবে ততক্ষণ পাহাড় চলবে না। কারখানা বন্ধ থাক। কুলিগুলো চিৎকার করুক মজুরির অভাবে, ম্যানেজার দিনরাত পরিশ্রম ক'রে নিরুপায় হয়ে যাক। সে নিজে আসুক। তারপর ফণি যাবে। সে ঠেকিয়ে দেবে তার যাদুদণ্ড! অমনি চলবে কারখানা। জগদ্দল পাহাড় ঘুরতে আরম্ভ করবে, চলতে আরম্ভ করবে, ইঞ্জিন চলবে, বেল্টিং পাক খাবে চাকায় চাকায়—শ্যাফ্‌ট ঘুরবে, মাটি বইবার বালতির সারি মাটি বোঝাই নিয়ে উপরে উঠবে—খালি হয়ে নামবে, গ্রাইণ্ডিং মেশিন ঘুরবে—

অকস্মাৎ শব্দ-ধ্বনিতে ফণি চকিত হয়ে উঠল। গ্রাইণ্ডিং মেশিন ঘুরছে! কারখানা চলছে! তাকে ছেড়েও কারখানা চলছে! তার হাতে গড়া কারখানা তার বিনা স্পর্শে চলছে! সে ছুটে বেরিয়ে এল, ঢুকল গিয়ে কারখানায়।

দেখলে কারখানা জনশূন্য। শুধু ইলেকট্রিক শেডে দাঁড়িয়ে ম্যানেজার ও ইলেকটিক ইঞ্জিনীয়ার। রহস্যটা এইবার সে বুঝতে পারলে। শুনেছিল—ইলেট্রিক পাওয়ারে কারখানা চলবে। আজ চলছে। সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। আর তাকে

দরকার নাই। তারই হাতে গড়া কারখানা চলছে—অথচ তার হুকুম নেয়নি। কোন দিন আর নেবে না। কেউ আর তার মুখের দিকে চেয়ে থাকবে না। আপিসে তাকে আর কেউ ডাকবে না, 'মিস্ত্রী বাঁচাও' ব'লে কুলিরা আর তার কাছে আসবে না, সিংগী প্রভৃতি ছোঁড়ার দল—তাকে দেখে হাই তুলে ঠাট্টা করবে; আর এই কারখানা—তার নিজের হাতে গড়া কারখানা—সেও তার বিনা হুকুমে চলছে; আর কোনদিন তার মুখের দিকে চেয়ে থাকবে না।··· শব্দধ্বনি-মুখর শেডে ঘূর্ণমাণ যন্ত্রপাতির মধ্য দিয়ে সে চ'লে যাবে। আর সে এখানে থাকবে না। কারখানাটাও আর তাকে চায় না। সে চ'লে যাবে।

যন্ত্রপাতির মধ্য দিয়ে সংকীর্ণ পথ। তার অত্যন্ত পরিচিত পথ। বিহ্বলমিস্ত্রীর চোখ জলে ঝাপ্‌সা হয়ে এল। হঠাৎ তাকে পিছন থেকে টানলে। মিস্ত্রী হাসলে। —সেই ভুলু ছোঁড়া। যেতে দেবে না!—না! না—না—ছাড়! ছাড়! ছাড়···

বৈদ্যুতিক শক্তি-সংযোগে কারখানাটা চলার পরীক্ষা দেখে সন্তুষ্ট হয়ে স্মিত-মুখে ম্যানেজার ইঞ্জিনীয়ারকে বললে—That's alright.

হঠাৎ গ্রাইণ্ডিং মেশিনের ও-দিকটায়—যেখানে স্থূল আকারের বড় বড় কয়েকটা চাকা তীক্ষ্ণ দাঁতে দাঁতে মিলে ঘুরছে—সেখানকার শ্যাফটটা ঝাঁকি খেয়ে বার-দুয়েক কেঁপে উঠল। কিন্তু সে ঝাঁকি বিরাট যন্ত্রদেহের মধ্যে বুঝবার মত স্পষ্ট নয়।

অধীরতায় অসাবধান ফণি চাকার দাঁতে ধরা পড়েছে; কারখানা তাকে ছেড়ে দেয়নি। সে তাকে গ্রাস ক'রে নিয়েছে—তার দাঁতের দুপাশে বেয়ে পড়ছে রক্তের ধারা। দাঁতের পাশে লেগে রয়েছে মাংসের টুকরো—পাশে মেঝের উপর পড়েছে হাড়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরো কিন্তু প্রচুর ফায়ারক্লের ধুলোর মধ্যে সেও মিশে গিয়েছে। নিশ্চিহ্ন করেই যেন যন্ত্রদানব ফণিকে আত্মসাৎ করছে।

মেশিন চলছে। রক্ত শুকিয়ে গেল—চাকায় থেকে চাকায় ঘুরে ঘুরে মাংস-চিহ্ন লুপ্ত হয়ে গেল; ফণির চর্বিতে শুধু যন্ত্রপুরীর এ-প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত মসৃণ স্বচ্ছন্দগামী ক'রে দিলে। মেশিন চলছে স্বচ্ছন্দে, শব্দের মধ্যে কান পেতে শুনলে বোধ হয় ফণির মোটা গলার গান শোনা যাচ্ছে।

ম্যানেজার বিদ্যুৎ-শক্তিতে যন্ত্রের সাবলীল গতিতে চলার ধারা দেখে বললেন—সুইচ অফ প্লিজ্‌!

● তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ●

পঞ্চরুদ্র

পঞ্চরুদ্রের মৃত্যু। অপঘাতে অপমৃত্যু হইয়া গিয়াছে; আজ তাহারই প্রেতক্রিয়া উপলক্ষে সমারোহের কাণ্ড, লাঠালাঠি ব্যাপার; রক্তগঙ্গা হইবার সম্ভাবনা।

এক নয়, দুই নয়, পঞ্চ রুদ্র, পঞ্চমুখ পঞ্চাননের পঞ্চ মূর্তির মৃত্যু—তাও অপমৃত্যু! রক্তগঙ্গা হইবে না? সমস্ত গ্রামটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার পূর্বের কথাটা আগে বলা প্রয়োজন।

প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে অন্নভিখারী পঞ্চানন মহুগ্রামের রামরতন পাঁজার বাড়িতে পাঁচটি বিভিন্ন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া উপস্থিত হইলেন। বোধ হয় পাঁচমুখে খাইয়া এক উদরে খাদ্যসম্ভার সংকুলান করিতে কষ্ট হইতেছিল, তাই পাঁচ মুখের জন্য পাঁচটি স্বতন্ত্র দেহ ধারণ করিয়াছিলেন।

রামরতন পাঁজার তখন জম্‌জমাট সংসার, ধনে-পুত্রে পাঁজার বাড়ি হু-হু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। উর্বর ক্ষেত্র, খামার-ভরা মরাই, পুকুর-ভরা মাছ, গোয়াল-ভরা পয়স্বিনী গাভী, লোহার সিন্দুকে সোনা রূপা,—মোটকথা পরিপূর্ণ সংসার! ঠিক এই সময়েই ভিখারী শিবঠাকুর অন্নলোভে আসিয়া বলিলেন, ওহে পাঁজা, আমাদের চারটি ক'রে খেতে দিতে হবে তোমাকে!

অর্থাৎ একদা রাত্রে পাঁজা স্বপ্ন দেখিলেন যে তিনি শিব প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়াই তিনি বড় ছেলেকে ডাকিয়া আদ্যন্ত স্বপ্নের বিবরণ বিবৃত করিয়া বলিলেন, শিব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করো।

সংবাদটা শুনিয়া গৃহিণী আসিয়া বলিলেন, আমি কিন্তু আলাদা ক'রে করব। তোমার শিব থাকবেন ডান দিকে, আমার শিব থাকবেন বাঁয়ে—বলিয়া তিনি ফিক করিয়া হাসিলেন।

'বেলা যে যায়' কথাটা শুনিয়া সাধু মহাত্মার বৈরাগ্য উদয় হয়, অথচ কথাটা অত্যন্ত সাধারণ, বেলা রোজই যায় এবং প্রত্যহই বহু লোক বহুবারই বলিয়া থাকে। পাঁজা-গৃহিণীও দিনে এমন হাসি বহুবারই হাসেন, কিন্তু এই মুহূর্তের হাসিটি

পাঁজা-মহাশয়ের বুকে সম্মোহন-বাণের মত গিয়া বিঁধিল, তাঁহার অঙ্গ যেন অবশ হইয়া গেল। তিনিও ফিক করিয়া হাসিয়া বলিলেন, বেড়ে বলেছ!

কিছুক্ষণ পর দুই বিধবা ভগ্নী আসিয়া বলিল, আমাদের সাধ দাদা, বহুদিনের।

পাঁজা চিন্তিত হইয়া বলিলেন, হুঁ।

এক ভগ্নী বলিল, আমাদের বাপ বলো, মা বলো, পুত্তুর বলো—সবই তুমি। তুমি যদি আমাদের মুখের দিকে না তাকাও, তবে আর আমাদের পরলোক কি ক'রে হয়, বলো?

পাঁজা মহাশয় ভগ্নীদের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহাদের মুখচ্ছবি ভিক্ষুকের মতই সকরুণ এবং ত্রস্ত। তাহাদের মুখ দেখিয়া তাঁহার মমতা হইল, শুধু মমতাই নয়, তিনিও এ সংসারে তাহাদের সর্বস্ব জানিয়া বেশ একটু খুশিই হইলেন, কিন্তু তবুও তিনি গৃহিণীর সম্মতি না লইয়া একেবারে সম্মতি দিতে পারিলেন না। বলিলেন, তা হ্যাঁ, দেখি ভেবে-চিন্তে! মানে খরচপত্র ত আছে!

গৃহিণী মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, তোমার খুশি! আমি কে?

পাঁজা মহাশয় চিন্তিত হইয়া তামাক টানিতে আরম্ভ করিলেন, তাইত—!

দিন দশেক পরেই কিন্তু একটা সুমীমাংসা হইয়া গেল। ক্রোশ পাঁচেক দূরবর্তী পাঁজা মহাশয়ের এক বিধবা শালিকার বাড়ি। তিনি হঠাৎ সেদিন আসিয়া হাজির হইলেন। গালে মোটা মোটা দুই-দুইটা ডবল খিলি পান দোক্তা সহযোগে লবণাক্ত আনারসের মত অনবরত রসক্ষরণ করিতেছিল, তিনি কোঁত কোঁত করিয়া সেই রস গিলিতে গিলিতে বাড়ি ঢুকিয়া বলিলেন, কই গা পাঁজামশাই, কই গা? —বলিয়া পচ্ করিয়া এক ঝলক পানের পিচ ফেলিয়া দিলেন।

গৃহিণী পুলকিত হইয়া বলিলেন, কে বেমলা? আয় আয়!

—উঁ হুঁ, আগে পাঁজা মশাই কই, বল?

পাঁজা মহাশয় ঘরের ভিতর ছিলেন, তিনি পুলকিত হইয়া আসিয়া বলিলেন, আরে, এসো এসো, ছোটগিন্নী এসো। ওরে আসন দে রে, বসতে আসন দে।

ছোটগিন্নী মুখ বাঁকাইয়া বলিল, নাঃ তোমার আর আদরে কাজ নেই; ভালবাসার কথা জানা গেছে!

ত্রস্ত হইয়া পাঁজা বলিলেন, আরে আরে, হ'ল কি ছোটগিন্নী? কথাটাই বলো আগে।

—কেন? শিব প্রতিষ্ঠে করছ, দিদি থাকবে তোমার বাঁয়ে, বলি ডান দিক্ কি তোমার খালি থাকবে নাকি?

গিন্নী হাসিয়া বলিলেন, তা, আমাদের বেমলা বলেছে বেশ! দু'পাশে দুটি ছোট মন্দির, মাঝখানে তোমারটি একটু বড়, সে মানাবে খুব ভাল!

বিমলা হাসিয়া বলিল, দু'পাশে দুই কলাগাছ মধ্যিখানে জগন্নাথ!

অতঃপর গৃহিণী ও শ্যালিকার দুই পাশে দুই ভগ্নীকে স্থান না দেওয়াটা আর ভাল দেখাইল না! গৃহিণীও একবার বলিলেন, আহা, স্বামী নেই, পুত্তুর নেই, তুমি ছাড়া ওদের কে আছে? আর বাপু, মানাবেও খুব ভাল! দু'পাশে দুটি ছোট, তার পাশের দুটি আর একটু বড়, একেবারে মাঝে তোমারটি স-ব চেয়ে বড়। সারি সারি পাঁচটি মন্দির, পঞ্চকন্যে স্মরেন্নিত্যং—বলিয়া কপালে হাত ঠেকাইয়া গৃহিণী প্রণাম করিলেন।

ছেলে সমস্ত শুনিয়া বলিল, তাই ত খরচ বেজায় বেড়ে গেল;—পাঁচ-পাঁচটা মন্দির!

পাঁজা বলিলেন, ছোট ছোট মন্দির করো।

—তাতেও ত নেহাৎ কম খরচ হবে না। মনে করেছিলাম সরকারদের সম্পত্তিটা কিনব।

—তবে না হয় ধান বিক্রয় করো।

—ধান? ধানের কি দর আছে? তাছাড়া ধান ধার দিলে এক বছরেই দেড়া হয়ে ফিরে আসবে।

—তবে?

—আমি বলছিলাম, পিসীমা'রা গয়নাগুলো দিন না! কিছু ত সাহায্য হবে। আর কাদার গাঁথনি ক'রে—তাতে খরচও কম হবে; বাকী যা লাগবে সে যা হোক ক'রে দোব আমরা।

গহনাই বা কি? মরা-সোনার কয়েকখানা পদ—কাঁকনি, বাজু, গলার মুড়কিমালা—এইমাত্র; সমস্ত বিক্রয় করিয়াও শ'চারেক টাকা হইল না, কুড়ি টাকা কম থাকিয়া গেল। তবুও তাহারই শোকে বিধবা দুইটি গোপনে ঘরের মেঝে ভিজাইয়া তুলিল।

যাক সে কথা। দেব পঞ্চানন পঞ্চমূর্তিতে ত প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পাঁজা

পাকা বন্দোবস্ত করিলেন, পাঁচ বিঘা নিষ্কর জমি দেবোত্তর করিয়া গ্রামের নবাগত দরিদ্র ব্রাহ্মণ হরিহর ঘোষালকে অর্পণ করিয়া পূজক নিযুক্ত করিলেন। হরিহর ঘোষাল বংশানুক্রমে ফুল-বিল্বপত্র, আতপ ও গঙ্গাজল দিয়া পূজা করিতে বাধ্য থাকিবে। ঘোষাল শুধু পাঁজাকেই দুই হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিল না, সে পঞ্চরুদ্রের পদতলেও লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, জয় আশুতোষ! তুমিই আমার অন্নদাতা, তুমিই আমার ঈশ্বর!

সে পরম ভক্তি সহকারে পূজা আরম্ভ করিল।

বিধবা ভগ্নী দুইটি নিত্য প্রণাম করে, গাওয়া ঘি আনিয়া শিবের অঙ্গে মাখাইয়া দেয়, চন্দন লেপন করে। পাঁজাও নিত্য প্রণাম করিয়া যান, বাড়িতে কলা পাকিলে পাঁচটি শিবের জন্য আসে, জমিতে শসা ধরিলে শিবেরা পাইয়া থাকেন, প্রতি সন্ধ্যায় ছটাকখানেক করিয়া পাঁচ ছটাক দুধও পঞ্চরুদ্র পাইয়া থাকেন।

খাইয়া মাখিয়া পঞ্চজনে বেশ চিকন হইয়া উঠিলেন!

রাত্রে মধ্যবর্তী রামরতনের শিব রত্নেশ্বর-রুদ্র বলেন, বলি কেমন লাগছে হে কমলেশ্বর?

গিন্নী কমলার শিব কমলেশ্বর বলেন, আঃ, বুড়ো বয়েসে রস দেখ! রাতদুপুরে এমন আরামের ঘুম ভাঙাচ্ছ!

ডান পাশ হইতে বিমলেশ্বর ফিক করিয়া হাসিয়া বলেন, মরণ তোমার! রসের আবার বয়েস আছে নাকি? আছি বেশ! আমার ত ভুঁড়িটা বাড়ছে দিন দিন।

একেবারে এপাশ হইতে এলোকেশীশ্বর বলেন, মাথার জটাগুলো কালো হয়ে উঠল হে, ঘি খেয়ে আর মেখে! গায়ের ফাটগুলো একেবারে ম'রে গেছে। বেঁচেছি হে, শরীর আর চড়-চড় করে না।

একেবারে ওপাশ হইতে মুক্তকেশীশ্বর বলেন, সন্ধ্যাবেলায় দুধটি খেয়ে মাথার গোলমালটা কিন্তু একেবারেই আমার কেটে গেছে। আর গাঁজার মুখে দুধটি যা লাগে, আহা—হা!

এবার বিমলেশ্বর বলেন, কই, তোমার কথা ত কিছু বললে না রত্নেশ্বর?

রত্নেশ্বর বলেন, সুখ সবই। তবে একটি দুঃখ আমার আছে। চন্দন যখন মাখি তখন গৌরীকে মনে প'ড়ে যায়।

অকস্মাৎ কমলেশ্বর ফোঁস করিয়া উঠেন, আ মরণ তোমার!

পঞ্চাশ বৎসর পর।

কাল-প্রবাহের গতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। পাঁজা মহাশয় নাই, কমলা বিমলা, এলোকেশী মুক্তকেশীও নাই। শুধু ইহারা কেন সমগ্র পাঁজা-পরিবারই আজ ছত্রভঙ্গ; পাঁজাদের এত বড় বাড়িটা একটা প্রকাণ্ড মাটির ঢিপিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। রামরতন হইতে তৃতীয় পুরুষের প্রথমেই পাঁজা-বংশ মহাপ্রভু জগন্নাথের রথযাত্রা উপলক্ষে পুরী গিয়া মোক্ষ লাভ করিল। সম্পত্তি গিয়া অসিল পাঁজাদের দৌহিত্র বংশে। তাহাদের বাসও নিকটেই, পাশের গ্রামে। হরিহর ঘোষালও গত হইয়াছে, তাহার পর তাহার পুত্রেরাও বিগত, এখন আছে তিন পৌত্র। এক পৌত্র গিরীন ঘোষাল, সে করে জমিদারী সেরেস্তায় গোমস্তা-গিরি; এক পৌত্র মহীন ঘোষাল, সে করে গুরুগিরি; অপর পৌত্র মণীন্দ্র ঘোষাল, সে খানিকটা জড়তাব্যাধি-যুক্ত—বুদ্ধির জড়তাও আছে, জিহ্বার জড়তা হেতু কথাও বেশ পরিষ্কার উচ্চারণ করিতে পারে না; সে-ই এখন ওই পঞ্চরুদ্রের পূজা করে। বলা বাহুল্য, তিনজনেই পৃথগন্ন, মণীন্দ্রের ভাগেই পঞ্চ বিঘা জমির সহিত পঞ্চরুদ্র পড়িয়াছেন।

কাদার গাঁথুনির মন্দিরগুলিতে পঞ্চাশ বৎসরেই ফাট ধরিয়াছে, চারিপাশের রোয়াকগুলি ত নিঃশেষে বিলুপ্ত, ইটগুলির পর্যন্ত চিহ্ন নাই। বহুদিন পর্যন্ত ইটগুলি আশেপাশে রাশীকৃত হইয়া পড়িয়াই ছিল। সে, হরিহর ঘোষালের পুত্রদ্বয়ের জীবিত-কালের ঘটনা। ঘোষালদের তখন উন্নতির মুখ, ঘোষালেরা দুই ভ্রাতায় পরামর্শ করিয়া নবান্ন উপলক্ষে অন্নপূর্ণাপূজা প্রতিষ্ঠার সংকল্প করিল। প্রথম বৎসর পূজার শেষে প্রতিমা-নিরঞ্জনের পর দিবসই অন্নপূর্ণা দেবীর গৃহ-নির্মাণের জন্য বনিয়াদ খোঁড়া হইল।

বড়ভাই বলিল, ভালই হ'ল, বাইরে বসবার দাঁড়াবার একটা জায়গা হ'ল। পূজো ত বছরে দু'দিন।

ছোটভাই সায় দিয়া বলিল, এ আমার বহুদিনের সাধ দাদা। দত্তদের বৈঠকখানায় দাবা খেলতে যাই, মাঝে মাঝে এমন কথা বলে ছোটলোক বেটারা! ওদের ওখানকার আড্ডা এইবার ভাঙব, দাঁড়াও।

বড়ভাই বলিল, তবে এক কাজ কর, দু'কুঠরি ঘর হোক। পূজার ঘরটা বড়, ওইটেতে সব বসবি দাঁড়াবি, আর পাশে একখানা ছোট ঘর, ও-খানেতে আমি আপনার সেরেস্তার কাগজপত্র রাখব, সাধন-ভজন করব।

সাধন-ভজন অর্থে অনেক কিছু, কিন্তু সে থাক। ঘর হইয়া গেল। ছোট বলিল, দাদা, মেঝেটা কোন রকমে বাঁধিয়ে ফেল। খরচ ত কিছু করতে হয় নি। তোমার গোমস্তাগিরির কল্যাণে কাঠকুটো বাঁশ, মায় খড় পর্যন্ত বাবুদের মহাল থেকে এল। কিছু খরচ করো!

বড় ভাই বলিল, আচ্ছা।

পরদিনই দেখা গেল, মজুর লাগিয়া ঝুড়িতে বহিয়া পঞ্চরুদ্রতলার রোয়াক-ভাঙা ইট ঘোষালদের বাড়ির দিকে লইয়া চলিয়াছে।

রাত্রে কমলেশ্বর বলিলেন, দেখছ ঘোষাল বেটাদের কাণ্ড!

বিমলেশ্বর ফিক করিয়া হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু অন্নপূর্ণার মন্দিরের জন্যে নিয়ে যাচ্ছে যে!

রত্নেশ্বর বলিলেন, অন্নপূর্ণা এলে ত বাঁচি! খাওয়া দাওয়ার বড়ই অসুবিধে হচ্ছে হে!—আতপ বড্ড কমিয়ে দিয়েছে! জল ত কুশীতে ক'রে এতটুকু। ঘি-চন্দন ত দেয়ই না! গা হাত পা এমন চড়-চড় করছে!

এলোকেশীশ্বর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আমার পাশেই একটা সার-ডোবা করেছে ঘোষালরা। গন্ধে ত আর বাঁচি না!

মুক্তকেশীশ্বর চোখ মুছিয়া বলিলেন, আমার ঘরের কোণের ফাটলে বিছুটির গাছ হয়েছে, লতাটা এসে গায়ে জড়িয়েছে, অহরহ জালাতে আমি জলে মলাম। ওঃ! এর চেয়ে সাপের জ্বালা ভাল।

রত্নেশ্বর কটমট করিয়া চাহিয়া বলিলেন, তবে একবার উঠব নাকি?

বিমলেশ্বর বলিলেন, অন্নপূর্ণা সবে এল। ওরাই অন্নপূর্ণাকে আনলে, এখন কি অরসিকের মত কাজ করা ঠিক হবে?

কমলেশ্বর বলিয়া উঠিলেন, অন্নপূর্ণা অন্নপূর্ণা করেই ম'ল?

এখন মণীন্দ্র ঘোষাল পঞ্চরুদ্রের সেবক।

প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে সে একটা ঘটিতে জল, একটা ঠোঙাতে একমুঠো আতপ ও

কতকগুলো বেলপাতা লইয়া আসিয়া মন্দিরের মধ্যে তারস্বরে চিৎকার আরম্ভ করে। কিন্তু কি যে সে বলে তা সেই জানে, ভাষাটা সংস্কৃত, কি চীনে, কি পুস্ত, কি হনোলুলুর ভাষা—বোঝা যায় না। কিন্তু চিৎকার সে করে খুব।

তবে একটা কাজ করিয়াছে, মুক্তকেশীশ্বরের অঙ্গের বিছুটি সে ঘুচাইয়াছে। একদিন বিছুটি তাহার গায়েই লাগিয়াছিল। মুক্তকেশীশ্বর ত মণীন্দ্রের উপর মহা সন্তুষ্ট; চায় না তাই, চাহিলে বোধ করি পৃথিবীর সাম্রাজ্যই তাহাকে দান করিতে পারেন।

মধ্যে মধ্যে রত্নেশ্বর বলেন, আচ্ছা কি মন্ত্র ও বলেন বলো ত?

মুক্তকেশীশ্বর বলেন, যাই বলুক, ভক্তি ওর খুব। ওকে কিছু দিতে হবে।

কিন্তু তাঁহারা দিবার পূর্বেই একদিন মণীন্দ্র নিজেই তাহার প্রাপ্য গ্রহণ করিয়া বসিল। একদিন গভীর রাত্রে সে পঞ্চরুদ্রের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তারপর ঠক করিয়া একটা প্রণাম করিয়া বলিল, কিটু মনে ক'রো না বাবারা। ঘরের ডান্‌লা হট্টে না আমার।

রত্নেশ্বর অবাক হইয়া বলিলেন, কি বলে হে?

ততক্ষণে মণীন্দ্র এলোকেশীশ্বরের মন্দিরের দরজা দুই পাট খুলিয়া লইয়া কাঁধে চাপাইয়াছে। ক্রমে বিমলেশ্বর, রত্নেশ্বর, কমলেশ্বর, মুক্তকেশীশ্বর সকলের দরজাই সে একে একে খুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

রত্নেশ্বর বলিলেন, এ কি রকম হ'ল?

বিমলেশ্বর বলিলেন, যা হ'ল তাই হোক গে। কিন্তু বসন্তের হাওয়াটি কেমন দিচ্ছে বলো ত?

রত্নেশ্বর বলিলেন, যা বলেছ! শরীরটে যেন জুড়িয়ে গেল! অন্নপূর্ণাকে ডেকে একটু গল্প করলে হয় না?

কমলেশ্বর বলিয়া উঠিলেন, আমি উঠে যাব কিন্তু!

দুঃখিত হইয়াছিলেন এলোকেশীশ্বর, সার-ডোবার গন্ধটা মুক্তদ্বার-পথে অত্যুগ্র হইয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছে।

মুক্তকেশীশ্বর খুশি হইয়া ভাবিতেছিলেন, যাক, কিছু পেলে বেচারা। কিন্তু সামান্য ঐ কয় জোড়া দরজা লইয়া মণীন্দ্র সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না। প্রত্যহ রাত্রে গ্রাম নিষুতি হইলে সে একটা ঝুড়ি ও একটা শাবল লইয়া আসিয়া মন্দিরের

পিছন দিকের ভাঙা ভিতে শাবল চালাইয়া ইট বাহির করিয়া নিয়মিত দুই চার ঝুড়ি করিয়া বহিতে আরম্ভ করিল। তাহার ঘরের মেঝে বাঁধাইতে হইবে।

আর রুদ্রদেবতার সহ্য হইল না। অকস্মাৎ একদিন মাথা নাড়া দিলেন। কিন্তু তাহাতে মণীন্দ্রের কোন ক্ষতি হইল না, রুদ্রদেবতাদের মস্তকান্দোলনে মন্দিরগুলিই শুধু কাঁপিতে কাঁপিতে হুড়মুড় করিয়া ভাঙিয়া পড়িল।

মন্দির পতনের ফলে রুদ্রদেবতার রোষে মারা গেল গোটা দুই ছাগল, সার-ডোবার মধ্যে একটা ঢোঁড়া সাপ আর বহু কীটপতঙ্গ। একটা মুচিদের মেয়ে মন্দিরের পিছনে পতিত জায়গাটায় বুনো শাক তুলিতেছিল, একটা ইট ছুটিয়া গিয়া তাহার গায়ে লাগিল, সে খানিকটা জখম হইল।

মন্দির-পতনের শব্দে বহুলোক আসিয়া জমায়ত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে মণীন্দ্রও ছিল, সে বিপুল পুলকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, জয় বিঠ্যনাট! অর্থাৎ, জয় বিশ্বনাথ।

বহুক্ষণ পর রত্নেশ্বর প্রশ্ন করিলেন, বলি ওহে, শুনছ সব?

কমলেশ্বর ভ্যাঙাইয়া বলিলেন, শুনছ সব? কেমন, বার বার বললাম, ক্ষ্যাপামি করো না; তুমিই ত ক্ষ্যাপালে সব!

বিমলেশ্বর বলিলেন, উঃ, ভাগ্যিস জটার বোঝাটা বেশ মোটা হয়ে আছে, তাই ত রক্ষে! নইলে মাথা আর কারু থাকত না।

এলোকেশীশ্বর বলিলেন, আমার হাতে বড্ড লেগেছে।

মুক্তকেশীশ্বর বলিলেন, এ যে ইট চাপা প'ড়ে দম বন্ধ হয়ে গেল!

রত্নেশ্বর বলিলেন, কুম্ভক ক'রে বসো।

পঞ্চরুদ্র কুম্ভক করিয়া বসিলেন। ভাগ্য ভাল যে, কয়েক দিনের মধ্যেই এ অবস্থার অবসান হইল। ইট সমান অংশে ভাগ করিয়া কিছু লইল মণীন্দ্র, কিছু লইল মহীন্দ্র, কিছু লইল গিরীন্দ্র। গ্রামের লোকে আসিয়া ধরিল, রাস্তার ওই সাঁকোটার জন্য আমরা কিছু নেব।

তাহারাও কিছু লইল। মহীন্দ্র ড্রেনটা পাকা করিয়া ফেলিল, গিরীন্দ্রের ভাগের ইটগুলি লইয়া গেল চাষাদের মেয়ে সত্যদাসী। সে তাহার ঘরের মেঝেটা বাঁধাইয়া ফেলিল। গিরীন্দ্র রোজ সন্ধ্যায় সেখানে যায়, গল্প করে, তামাক খায়, আসিবার সময় সত্যদাসী একবাটি ঘনাবর্ত দুধ না খাওয়াইয়া ছাড়ে না।

আরও পনরো বৎসর পর।

মণীন্দ্র কৈলাসে গিয়াছে। তাহার একমাত্র পুত্র জীবনকৃষ্ণ এখন রুদ্রদেবতার সেবক। পঞ্চরুদ্র এখন উন্মুক্ত আকাশের তলে রৌদ্র বৃষ্টি শীত গ্রীষ্ম মাথায় করিয়া বোধ করি যোগমগ্ন। কষ্টিপাথরের নিকষ কালো রঙের উপর ধুলো পড়িয়া পড়িয়া ধূসর বর্ণ ধারণ করিয়াছে। আশেপাশে ইট-চুনের কোন চিহ্ন নাই, এক-একটা মাটির ঢিপির উপর কেহ কাৎ হইয়া, কেহ ঈষৎ হেলিয়া, কেহ বা কোনরূপে সোজা হইয়া বসিয়া আছেন। বিমলেশ্বর ত একেবারে শুইয়া পড়িয়াছেন। জীবনকৃষ্ণ স্নান করিয়া কতকগুলো বেলপাতা তুলিয়া লয়, সিক্তবস্ত্রেই পথে দাঁড়াইয়া বেলপাতা ছুঁড়িয়া দেয়, নমঃ শিবায় নমঃ। গামছার খুঁটে অর্ধমুষ্টি অপেক্ষাও কম আতপ-চাউলের খুদ বাঁধা থাকে, তাহাই চারিটি করিয়া ছিটাইয়া দিয়া আসে। এক এক রুদ্রের ভাগে পড়ে গুটি বিশ পঁচিশেক আতপকণা।

জীবন একদিকে পূজা করিয়া যায়, আর একদিক হইতে কয়টা ছাগল সেগুলি খাইতে খাইতে আসে। জীবনের পূজার সময় তাহাদের যেন মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। ছাগলের বাচ্চাগুলো আবার লাফাইয়া রুদ্রদেবতার মাথায় চড়িয়া নাচে।

আরও নাচে কয়টি ছেলে; গিরীনের ছেলে তাহাদের মুখপাত্র। তাহারা প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে এক এক জন এক এক রুদ্রের ঘাড়ে চাপিয়া ভাঙা ডাল দিয়া দেবতাকে পিটিতে পিটিতে বলে, চল চল, হেট হেট!

কাহারও চোখে পড়িলে সে ধমক দিয়া তাহাদের তাড়াইয়া দেয়। নিঃসন্তান জীবনকৃষ্ণ কিন্তু দেখিলেও কিছু বলে না। সে মনে মনে রুদ্রদেবতাকে নিবেদন করে, নাও বাবা রুদ্রদেব, নাও বেটাদের! নির্বংশ হোক সব!

দয়াময় আশুতোষ কিন্তু শিশুর অপরাধ গ্রহণ করেন না! জীবন মধ্যে মধ্যে বিরক্ত হইয়া বলে, শিব না কচু। সেদিন সে বেলপাতার পরিবর্তে আগাছার পাতা ছিটাইয়া দেয়।

ছেলেদের কাণ্ডটা একদিন চোখে পড়িল গিরীনের। সে শিহরিয়া উঠিয়া নিজের ছেলে লক্ষ্মণকে ডাকিয়া অনেক বুঝাইয়া বলিল, ঠাকুর! দেবতা! ও করলে পাপ হয়। বাবারে! ঠাকুরকে পেন্নাম করতে হয়।

লক্ষ্মণ উৎসাহের সহিত বলিল, পূজো করব তবে, বেশ বাবা!

—হ্যাঁ, পূজো করতে হয়।

—শালুক-ডাঁটা তুলে এনে বলিদান দোব, বেশ বাবা।

—আচ্ছা, তাই দিও বরং।

—আর বেসজ্জন?

গিরীন চমকিয়া উঠিয়া ছেলের মুখের দিকে চাহিল। তারপর একবার চাহিল নিজের বাড়ির দিকে। সদর রাস্তা হইতে তাহার বাড়ি পর্যন্ত একটা গাড়ির রাস্তার বড়ই অভাব, ধান তুলিতে অসুবিধার অন্ত থাকে না। পথ জুড়িয়া বসিয়া আছেন পঞ্চরুদ্র। মোড়ের ওই দুইটা যদি—

অসহিষ্ণু লক্ষ্মণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, বেসজ্জন করব না বাবা?

চুপি চুপি গিরীন বলিল, দিস্ ক'রে! এই দেখ, এই এপাশের দুটো বুঝলি? ভর্তি দুপুরবেলা দিস্; নইলে লোকে বকবে!

দিন দুয়েক পরেই পঞ্চদশনেত্র পঞ্চবক্ত্র মাত্র নবনেত্র ত্রিবক্ত্র হইয়া বসিয়া রহিলেন। মুক্তকেশীশ্বর এবং কমলেশ্বর শীতল জলশয়ানে শুইয়া ভাবিলেন, 'প্রলয় পয়োধি জলে' ত মন্দ নয়, শরীর ত বেশ জুড়াইয়া গেল। জীবনকৃষ্ণও উচ্চবাচ্য করিল না। সঙ্গে সঙ্গে সে পাঁচবিঘা নিষ্কর জমির দুইবিঘা বিক্রয় করিয়া ফেলিল। তাহার টাকার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

কাঁদিল শুধু বেনে-বুড়ী। রোজ সকাল-সন্ধ্যায় সে পঞ্চরুদ্রকে প্রণাম করিয়া যাইত। সেদিন সন্ধ্যায় সে পঞ্চদেবতার স্থলে তিনজনকে দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কিন্তু কোন উদ্দেশ না পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, কি অপরাধ করলাম বাবা? রোজ পাঁচটি ক'রে পেন্নাম করতাম, দুটি ক'রে যে আমার বাকী থেকে যাবে বাবা!

জীবন একদিন রাত্রে এলোকেশীশ্বরকে নিজেই একটা পুকুরে ফেলিয়া দিয়া আসিল। তাহার আরও টাকার প্রয়োজন।

*　　*　　*　　*

আরও বৎসর পঁচিশেক পর।

রত্নেশ্বর আর বিমলেশ্বর বসিয়া বসিয়া ভাবেন, মৃত্যুঞ্জয় হওয়ার মত অভিশাপ আর নাই।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনকৃষ্ণ এখন বৃদ্ধ, সে-ই এখনও পূজা করে, বেলপাতা ছিটাইয়া দিয়া প্রণাম করিয়া বলে, গতি করো পরমেশ্বর!

দুই রুদ্র আশীর্বাদ করেন, মৃত্যুঞ্জয় হও, অমর হও তুমি।

তবে রুদ্রদেবদ্বয়ের এই অবস্থার মধ্যেও হঠাৎ একটা সম্পদ বৃদ্ধি হইয়াছে, এক পরম ভক্ত জুটিয়াছে। গিরীনের ভাই মহীন, তাহারই এক পৌত্র। সে রুদ্রদেবতার মহাভক্ত। সে চুল রাখিয়াছে, দাড়িগোঁফ রাখিয়াছে, গাঁজা খায়, পারদ এবং লতাপাতা লইয়া সে তামা হইতে সোনা প্রস্তুত করে, সে-ই আসিয়া গভীররাত্রে দুই রুদ্রের সম্মুখে চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে গাঁজা সাজে, রুদ্রদেবতাদের ভোগ দেয়; তারপর নিজে প্রসাদ খায়।

মধ্যে মধ্যে রত্নেশ্বর বলেন, দেখ, কিসের পর কি হয়, সে কি বলা যায়? গাঁজাটা কিন্তু ছোকরা বানায় ভাল হে!

বিমলেশ্বর বলেন, বম্ বম্ বম্! হরি হরি হরি হরি!

রত্নেশ্বরও গাল বাজান, বম্, বম্, বম্!

অকস্মাৎ একদিন পঞ্চরুদ্রতলায় তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ হইয়া গেল। গিরীনের পুত্র সেই লক্ষ্মণের সহিত তাহার ভ্রাতা রামদাসের বিবাদ বাধিল। নিতান্ত অকারণে ঝগড়া—দুই বউয়ের ঝগড়া ক্রমশ বিপুলতর হইয়া ভাগাভাগির ঝগড়ায় পরিণত হইয়াছে। এখন ঝগড়া সেই রাস্তাটা লইয়া; মূল বাড়িটা এখন লক্ষ্মণের ভাগে পড়িয়াছে, রামদাসের বাড়িটা লক্ষ্মণের বাড়ি পার হইয়া যাইতে হইবে। লক্ষ্মণ বলিতেছে, এ রাস্তা তোমার নয় আমার।

রামদাস বলে, বাঃ, এ রাস্তা ত পৈতৃক।

—পৈতৃক ত এই আমার বাড়ির দোর পর্যন্ত। তারপর এ জায়গাটা ত আমার। এ জায়গার ওপর দিয়ে তোমাকে রাস্তা কেন দোব হে? তুমি কি আমার পীর নাকি? ওঃ, বলে যে সেই, গরজের পা মাথার ওপর দিয়ে!

পাঁচজন গ্রামের লোকও আসিয়া জুটিয়াছিল। তাহারাও লক্ষ্মণকে সমর্থন করিয়া বলিল, সে একশো-বার। যতটুকু পৈতৃক রাস্তা ততটুকু সাজার বটে। কিন্তু তারপর ওর নিজের জায়গা যদি ও না দেয়?

রামদাস বলিল, বেশ, ও জায়গাটা আমার সঙ্গে বদল করুক?

লক্ষ্মণ বলিল, তা যদি আমি না করি ?

শেষ পর্যন্ত রামদাস বলিল, আচ্ছা, রাস্তা ভগবান দেবেন আমাকে।

*   *   *   *

গভীর রাত্রি।

রামদাস চুপি চুপি রুদ্রতলায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ওই শিব দুইটাকে সরাইতে হইবে। সে ওই দিক্ দিয়া রাস্তা বাহির করিবে। মালকোঁচা মারিয়া কাপড় সাঁটিয়া আসিয়াই সে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। একি, কে ? ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল, নিথর মূর্তি। সে থর্‌থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

পরক্ষণেই আলোক জ্বলিয়া উঠিল। পাগল দেশলাই জ্বালিয়া গাঁজার জন্য টিকা ধরাইতেছিল। মুহূর্তে রামদাস ক্রোধে যেন উন্মত্ত হইয়া গেল।

—হারামজাদা, গেঁজেল, শুয়ার, পাজী, ছুঁচো !

সে দুমদাম করিয়া কিল চড় লাথি মারিয়া পাগলকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল। পাগল কিছুক্ষণ হতভম্বের মত মার খাইয়া ছুটিয়া পলাইল।

রামদাস একটু হাসিল। তারপর প্রথমেই বিমলেশ্বরকে ঘাড়ে তুলিয়া সে একটু চিন্তা করিয়া পুকুরের দিকে অগ্রসর হইল। কিছুক্ষণ পর ফিরিয়া আসিয়া রত্নেশ্বরকে ঘাড়ে তুলিল।

পরদিন জীবনকৃষ্ণ দেখিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে পাঁচ বিঘার বাকী দুই বিঘার খরিদ্দার খুঁজিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

*   *   *   *

পরদিন রামদাস রাস্তা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। জীবনকৃষ্ণ আসিয়া বাধা দিল। সে বলিল, আমি পুলিসে খবর দোব। তুমিই শিব কোথা ফেলে দিয়েছ। নইলে আমাকে কিছু দাও।

রামদাস মুখ ভ্যাঙাইয়া বলিল, আর বাকী তিনটে ? আর জমিগুলো যে বেচে খেলি, সে জমি আন্।

জীবন ভড়কাইয়া গেল।

ইতোমধ্যে গোবিন্দ ঘোষ সটান পাশের গ্রামে গিয়া বাঁড়ুজ্জে-বাবুদের নিকট হাজির হইল, বলিল, জায়গা ত আপনাদের ধরুন পাঁচটা মন্দির, প্রত্যেক মন্দিরের মেঝে চার হাত, দেওয়াল দু'হাত, আর বারান্দা তাও এক-এক পাশে

দু'হাত ক'রে চার হাত, একুনে দশ হাত, এই পাঁচ দশে পঞ্চাশ হাত লম্বা, আর হাত দশেক চওড়া, এ জায়গাটা ত আপনাদের বটেই। ওটা বন্দোবস্ত করলে মোটা টাকা হবে আপনাদের।

বাঁড়ুজ্জে-বাবুরাই এখন পাঁজাদের সম্পত্তির মালিক, তাহাদের দৌহিত্রদের যথাসর্বস্ব তাঁহারা নিলামে খরিদ করিয়াছেন। বাবুরা গা-ঝাড়া দিয়া উঠিলেন, নিশ্চয়!

ঘোষ বলিল, আমিই একশো টাকা দোব। আজই লেখাপড়া ক'রে দিন, দখল দিয়ে দিন, সঙ্গে সঙ্গে টাকা!

বাবুরা বলিলেন, আনো কাগজ।

লেখাপড়া হইয়া গেল। ঘোষ বলিল, দখল দিয়ে দিন।

আচ্ছা, কালই আমাদের লোক যাবে। আর নায়েববাবু, জীবন ঘোষালকে একবার ডেকে পাঠান ত!

জীবন আসিতেই বাবুরা সেই পাঁচ বিঘা জমি দাবী করিয়া বলিলেন, জমি বেচেছ, টাকা ফেল। নইলে নালিশ ক'রে তোমাকে জেলে দোব। ঠাকুর-দেবতা নিয়ে এই কাণ্ড! রামদাসকেও ছাড়ব না। লক্ষ্মণের ওই পথও বন্ধ করব।

জীবন যেন অগাধ জলে পড়িল। সে আসিয়া রামদাসকে বলিল, বাবুরা বলছে, 'জায়গা ত দখল করবই, তাছাড়া রামদাসকে আর তোমাকে জেলে দোব। লক্ষ্মণেরও পথ বন্ধ করব।'

আধ ঘণ্টার মধ্যে জাদুমন্ত্রে ঘোষাল-বাড়ির সমস্ত ঝগড়া মিটিয়া গেল। তাহারা বলিল, আরে মামলা ত সাক্ষীর মুখে। সে দেখা যাবে। এখন লাঠি ঠিক ক'রে রাখ, দেখব কেমন ক'রে কাল জায়গা দখল করে।

* * *

সন্ধ্যায় বেনে-বুড়ী কাঁদিয়া ফিরিয়া গেল।

গভীর রাত্রে পাগল শূন্য রুদ্রতলায় আসিয়া হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর সে উঠিল। তারপর বড় পুকুরটায় আসিয়া নামিল।

হ্যাঁ, এইখানেই ত! এই ত! আর একটি কোথায় গেল? আরে, আরে, অই, এ যে অনেক! হাঁ, গাজনের ভক্তেরা ত বলে শিবের বাচ্চা হয়।

* * *

পরদিন প্রাতঃকালেই পঞ্চরুদ্রতলায় সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। একদিকে বাঁড়ুজ্জে বাবুদের বরকন্দাজ দল, অপরদিকে ঘোষালরা সবংশে, চারিদিকে বিস্মিত জনতা, মধ্যে পঞ্চরুদ্রতলায় সারি পঞ্চরুদ্র বিরাজমান। সমস্ত জনতা নির্বাক। সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বেনে-বুড়ী জনতা ঠেলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া বলিল, আঃ বাবা! ছলনাময় যে তোমাকে বলে তা মিথ্যে নয়। ফিরে আসতে পারলে বাবা! সম্মুখে আসিয়া সে ঠক-ঠক করিয়া পাঁচটা প্রণাম করিয়া জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, পঞ্চরুর্দ্দ তলা বাবা, পেন্নাম করো সব পেন্নাম করো।

পাগল দূরে একটা গাছতলায় বসিয়া ফিক ফিক করিয়া হাসিতেছিল।

ইস্কাপন

'ইস্কাতন' অর্থাৎ 'ইস্কাপন' কোন মানুষের নাম হয় না। কিন্তু চক্চকে কালো রঙ আর চাকা মত মুখের ঢঙ—এই দুটোর জন্যে ওর ইস্কাপন নামটা মনে হয় না যে অসংগত। বরং 'ইস্কাতন' ব'লে ডাকলে ও যখন সামনে আসে—তখন মনে হয়—বাঃ, চমৎকার মিলিয়ে নাম রাখা হয়েছে ত। যে নাম দিয়েছিল—তার রসবোধের এবং সেই বোধ প্রকাশের শক্তির তারিফ করতে হয় মনে-মনে। কিন্তু সে রসিক জন যে কে—সে আজ কেউ বলতে পারে না। ইস্কাপনের বয়সই হ'ল চল্লিশের ওপর। ছেলেবেলা থেকেই সে 'ইস্কাপন', ওই এক এবং অদ্বিতীয় নামেই সে পৃথিবীতে পরিচিত। তার বন্ধুবান্ধবে বলে—'ইস্কাতন'। থানার স্থানীয় 'ইতিহাসের' যে পাকাখাতা—তাতেও লেখা আছে —" 'ইস্কাপন'। পিতা অজ্ঞাত, জাতি অজ্ঞাত, নিবাস অজ্ঞাত। ভীষণ প্রকৃতির লোক। কথায় কথায় মারপিট করে; দুর্দান্ত মাতাল; বেশ্যাসক্ত; চোর। স্থানীয় সাহোড়া 'গ্যাং'-এর (ডাকাতের দল) সঙ্গেও যোগাযোগ আছে বলিয়া সন্দেহ করা যায়। অন্ততঃ এই গ্যাং এখান হইতে চল্লিশ মাইল দূরবর্তী সদর থানার এলাকাভুক্ত তারাপুর গ্রামে যে ডাকাতি করিয়াছিল, সে ডাকাতিতে মোটরবাস ব্যবহারের যে অসমর্থিত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল তাহাতে ইস্কাপন যুক্ত ছিল। মোটরবাসের ক্লীনার সে। লাইসেন্স না থাকিলেও ড্রাইভিং জানে। সন্দেহ হয় সে-ই মোটরবাস ড্রাইভিং করিয়াছিল।"

তেরশো পঞ্চাশ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস।

'ইস্কাপন' জেল থেকে বেরিয়ে এল। প্রায় আট মাস পর। তেরশো উনপঞ্চাশের সপ্তমী পূজার দিন দুপুর বেলা থেকে যে কাল-ঝড় আরম্ভ হয়েছিল, সেই ঝড়ের রাত্রে ইস্কাপন বেরিয়েছিল চুরি করতে। অবশ্য তখন কি কেউ বুঝেছিল যে, ঝড় নয় প্রলয়? বাদলা, আকাশজোড়া মেঘের অন্ধকার, ঝিমিঝিমি বৃষ্টি, তার সঙ্গে বুনো শুয়োরের মত গোঁ-গোঁ ক'রে বাতাসের দমকা; চুরির পক্ষে

এমন রাত্রি আর হয় না। তার ওপর পটলির মুখ ভার! দোকানে সে কি একটা শাড়ি দেখে এসেছিল—দাম তার কুড়ি টাকা। সেখানা নইলে তার মন উঠছিল না কিছুতেই। কাপড়খানা অবশ্য বাহারের কাপড়! যে জিনিস ইস্কাপনের খুব ভাল লাগে, সে জিনিসকে সে বলে 'মন্‌মোহিনী'; কাপড়খানা মনোমোহিনীই বটে। মদের নেশায় শরীরে মনে বেশ চন্‌চনে ভাব এসেছিল। সে হঠাৎ উঠে গান ধরেছিল—"ও আমার ঘেঁটুনীর মন হলো ভারী, নতুন কাপড় নইলে যাবে না শ্বশুর বাড়ি!" "আচ্ছা চললাম আমি, এক টুকুন হাস দেখি!"

পটলিও ফিক ক'রে হেসে ফেলেছিল।

ইস্কাপন কাজ ঠিক সেরেছিল। দু' ক্রোশ দূরের মণি চন্দের বাড়ি ঢুকে ঠিক হাত বাক্সটি নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, ধরা পড়বার কোন ভয় ছিল না। কিন্তু তখন বুনো শূয়োর শেলেদা বাঘ হয়ে উঠেছে, ঝড় তখন মেতেছে, একা পবন তখন উনপঞ্চাশ ধারায় বইছে। জলের জোরও বেড়েছে, গায়ে লাগছে—যেন ঝাঁকে ঝাঁকে সূচ এসে বিঁধছে। খানিকটা আসতেই হাড়ের ভেতর পর্যন্ত কন্‌কনিয়ে উঠেছিল। একটু বিশ্রামের জন্যে সে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল একটা গাছের তলায়। কয়েক মুহূর্ত পরেই মড়্‌মড় ক'রে ভেঙে পড়ল একটা ডাল। সেটা চাপা পড়লে ইস্কাপন তুরুপ হয়ে যেত, ম'রেই যেত সে। কিন্তু ভাগ্য ভাল, সরাসরি গোড়া চাপা না প'ড়ে পত্রপল্লববহুল ডগার দিক্‌টার ঝাপ্‌টা খেয়ে উপুড় হয়ে প'ড়ে গিয়ে পাতা চাপা পড়েছিল। আসলে মণি চন্দের কপালটাই পাতা চাপা আর ইস্কাপনের কপালটা যাকে বলে পাথর চাপা; তাই সকালেই সেই দুর্যোগের মধ্যেও থানায় খবর দিতে যাবার পথেই মণি ফিরে পেলে তার বাক্স আর পাতা চাপা প'ড়ে বেঁচে ইস্কাপন পড়ল ধরা।

অতঃপর পুলিসের হেফাজতির মধ্যে জেল হাসপাতাল। সে প্রায় মাস খানেকের ওপর, তারপর বিচার। তারপর ছ'মাস জেল।

জেল মন্দ জায়গা নয়, শরীর সারে, কিন্তু প্রথমেই ওই যে হাসপাতালে একমাস প'ড়ে ছিল তাতেই ইস্কাপনকে ভেঙে দিয়েছিল। তবুও সে মনে মনে ভাগ্যকে মানে যে, ভাগ্যে ওই হাসপাতালে এসে পড়েছিল সে, তা না হ'লে পটলি হয়তো শাড়ি পরত কিন্তু তাকে পটল তুলতে হ'ত অবধারিত। যাক, সে ভাঙা শরীর আর তার জোড়া লাগল না। কাঁধের হাড়গুলো উঁচু হয়ে উঠে পড়েছে,

ঢাকা মুখের পুরন্ত গালও চড়িয়ে যেন ভেঙে দিয়েছে। জেলে গোপনে বহু কষ্টে সংগ্রহ-করা ভাঙা আয়নার টুকরোয় নিজের চেহারা দেখে সে আপন মনেই দুঃখের হাসি হেসে রসিকতা ক'রে যা বলত, তাই বললে সে গাঁয়ে পা দিয়েই। সে গাঁয়ে ঢুকছে—আর নোটন চৌকিদার বেরুচ্ছে। নোটনের পেছনে ইউনিয়ন বোর্ডের সেক্রেটারীবাবু। নোটন তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল—ইস্কাতন? আ-হা-হা, একি চেহারা হয়েছে রে?

ইস্কাপন হেসে বললে—ভেঙে চিড়িতন ক'রে দিয়েছে ভাই! তারপরে তোমাদের সব ভাল ত? সেক্রেটারীবাবু ভাল আছেন?

সেক্রেটারী সংক্ষেপে জবাব দিয়ে এগিয়ে গেল। চৈত্রে বছর শেষ হয়েছে, বাকী ট্যাক্স অস্থাবর ক'রে আদায়ের পালা; মেজাজটা তার রুক্ষ হয়েই আছে। তার ওপর কোথা থেকে এল বেটা চোর, বেটার মুখ দেখে যাত্রার ফলে যে কি আছে কপালে কে জানে! আবার ওর ট্যাক্স আদায়েরও হাঙ্গামা বাড়ল। জেলে ছিল, পড়েছিল ভাঙা ফুটো ঘরখানা, স্বচ্ছন্দে রেহাই পড়ত বেটার ট্যাক্স অনুপস্থিতির অজুহাতে। বেটা এল ঠিক সময়টিতে; এইবার যেতে হবে ওর দরজা ছাড়াতে। তার ওপর চোর ফিরল—হাঙ্গামা বাড়ল।

নোটন পিছিয়েই ছিল ইচ্ছে ক'রে। সেক্রেটারী ডাকলে—আয়রে নোটনা!

—এই যাই আজ্ঞে। যেতে যেতেই সে অকৃত্রিম দুঃখের সঙ্গে মৃদু স্বরে বললে—পটলি ম'রে গিয়েছে রে!

—ম'রে গিয়েছে?

—হ্যাঁ—বড় কষ্ট পেয়ে—

সেক্রেটারী ডাকলে—নোটনা!

—এই যে আজ্ঞে। যা হয়েছিল দুষি ঘা।

—নোটনা!

নোটন আর দাঁড়াতে পারলে না। ছুটে যেতে হ'ল তাকে। ইস্কাপন দাঁড়িয়েই রইল। পটলি ম'রে গেছে! সর্বাঙ্গে ঘা হয়ে—দূষিত ঘা হয়ে ম'রে গেছে? হঠাৎ তার কানে এল সেক্রেটারী নোটনকে বলছে—ও বেটাও জেলে ম'লে যে ভাল হ'ত!

অন্য সময় হলে ইস্কাপন গর্জন ক'রে উঠত। কিন্তু আজ তার মুখে কোন কথা

ফুটল না। পটলির মৃত্যুর দুঃখের ওপরেও সে আরো দুঃখ পেলে। সে ম'রে গেলে ভাল হ'ত!

ইস্কাপনের যেন কিছুক্ষণের জন্য রইল:

দুঃসংবাদ আর এই দুঃখ পেয়ে মন তার কেমন হয়ে গেল। পটলি ম'রে গিয়েছে? তবে? কার কাছে গিয়ে সে দাঁড়াবে? এতটা পথ সে কেবল পটলির কথাই ভাবতে ভাবতে আসছে। নানা রকম ভাবনা। জেল থেকে বেরিয়েই মনে হয়েছিল তার—"পটলি তার জন্যে ভেবে, তার অভাবে না-খেতে পেয়ে রোগা হয়ে গিয়েছে; যে ক'খানা সোনা-রূপোর টুকরো তার গায়ে ছিল তার আর কিছুই নাই; পরনে ছেঁড়া ময়লা কাপড়; মুখে হাসি নাই; তার চোখের তারা দুটি আগে সেই যে নাচুনে কালো ফড়িংয়ের মত নাচত—তা আর নাচে না, তার বদলে চোখের তারা দুটো হয়ে গেছে মরা ফড়িংয়ের মত। ইস্কাপনকে দেখে সে ঝর ঝর ক'রে কাঁদবে।"

কিছুক্ষণ পর নিজেই সে হেসে আপন মনে বলেছিল—"হুঁ!" বার বার ঘাড় নেড়েছিল অস্বীকারের ভঙ্গীতে।—"পটলি ত! সেই পটলি! যে পথ চলে হেলে-দুলে, যেন নেচে চলে; যে কথা কয় পিচ কেটে, মানুষের মনকে কেটে যেন খান খান ক'রে দেয়; হাসতে গিয়ে যে ভেঙ্গে পড়ে অতি বাড়ন্ত লতার মত ভাল ছাড়া মুখে যার কিছু রোচে না; পছন্দ না হ'লে, যত আদর ক'রে দেওয়া হোক না, সোনার জিনিসও যে পায়ে লাথি মেরে ফেলে দেয়—সেই পটলি! সে নাকি তার জন্যে ব'সে আছে! সে আবার কারও সঙ্গে জুটে গিয়েছে। জুটবার লোকের ত অভাব নাই। তার বাড়ির পাশে বাবুভাই থেকে আরম্ভ ক'রে কত-জনই না ঘুর-ঘুর করত! কেবল তার অস্ত্র সেই মোটরের স্টার্টার লোহার ডাণ্ডাটার ভয়েই ঘুর ঘুর ক'রেও কেউ কিছু করতে পারেনি।"

চোখ দুটো তার জ্বলে উঠেছিল।

"ফের—ফিন—ওই ডাণ্ডা ধরবে সে। কুছপরোয়া নাই। যার যার কাছেই থাক না পটলি, একটি পাঁট খাঁটি খেয়ে ডাণ্ডা ঘুরিয়ে সে গিয়ে হাজির হবে। যে মরদই হোক—ভাগে ভাল, না হ'লে মারবে ডাণ্ডা। পটলির চুলের মুঠি ধ'রে—।" সঙ্গে সঙ্গে তার মনে প'ড়ে গিয়েছিল—গাঁয়ের বাউলদের কাছে শোনা একখানা গান—"কেশে ধ'রে নিয়ে যাবে মিনতি কাহিনী শুনবে না!"

সেই পটলি ম'রে গিয়েছে? দুষি ঘা হয়ে মরে গিয়েছে? একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে সে। দুষি ঘায়ের আর আশ্চর্য কি? সে ছিল না, পেটের দায়ে পাপ করেছিল। না করেই বা খেত কি ক'রে সে?

জ্যৈষ্ঠ মাসের রোদ চন্‌চনে হয়ে উঠেছে। চারি পাশের মাঠ খাঁ-খাঁ করছে। আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত সব ঘোলাটে হয়ে গিয়েছে মনে হচ্ছে। বোশেখ মাস থেকে জল নাই, মাঠে বীজ-ধান প'ড়ে নাই। ইস্কাপনের শরীর জ্বলে যাচ্ছে যেন। চট্‌চটে ঘামে সর্বাঙ্গ চট্‌চটে হয়ে উঠেছে। সে আবার পা বাড়ালে গাঁয়ের দিকে।

"যাক্ গে। পটলি মরেছে, কথা দুঃখেরই বটে—কিন্তু কি করবে সে? সে-ই যদি সেই রাত্রে গাছ চাপা পড়ে মরত! কি হ'ত? পটলি তা'হলে ত সঙ্গে সঙ্গেই সাঙা করত! পটলি গিয়েছে, ঝিঙে আছে, উচ্ছে আছে, আবার কাউকে নিয়ে ঘর বাঁধবে সে। বাঁচতে যখন হবে—তখন আর কি করবে? খেতেও হবে, ঘরও বাঁধতে হবে, সবই করতে হবে। এবার সে মোটর চালানোর লাইসেন্স নেবে। হয়তো দেবে না পুলিস সাহেব। না দেয় তাতেই বা কি? ক্ষিতীশের মোটর ট্যাক্সিতে ত বাঁধা চাকরি তার। গাঁ থেকে বেরিয়ে ক্ষিতীশ তাকে স্টিয়ারিং ছেড়ে দিয়ে পাশে ব'সে ঘুমোবে, সে ছাড়বে গাড়ি।"

"গোঁ গোঁ ক'রে ছুটবে গাড়ি। পায়ের রোঁয়া গুলো ঝল্‌সে, জলের অভাবে মরা বীজ-ধানের চারার মত শুকিয়ে ব'সে যাবে। রেডিয়েটারের ভেতর জল ফুঠবে টগ্‌বগ ক'রে। পিছনে উড়বে ধুলো, পাশের গাছপালা ছুটবে উল্টো বাগে, পাশের দূরের গাঁগুলো ঘুরবে আস্তে আস্তে পাক দিয়ে।"

এই কল্পনার ফলেই অকস্মাৎ একটা সজীবতার প্রবাহ ব'য়ে গেল ইস্কাপনের সমস্ত শরীরে, মনেও ব'য়ে গেল, তার চলার গতি দ্রুত হ'ল আপনা থেকেই। কয়েক পা গিয়েই কিন্তু সে থমকে দাঁড়াল; পিছন ফিরে চাইলে—যে পথে চ'লে গেছে সেক্রেটারী আর নোটন, সেই দিকে। তাদের আর দেখা যাচ্ছে না। তবুও তার চোখ দুটো যেন দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠল, দাঁতে দাঁত চেপে বললে—শালা!

বললে ওই সেক্রেটারীকে। বলবে না? কি দোষ তার, ইস্কাপন সেক্রেটারীর কি ক্ষতি করেছে যে এত বড় কথাটা সে বললে? জেলের মধ্যে সে ম'রে গেলেই ভাল হ'ত? কই সেক্রেটারীকে দেখে তার ত মনে হয় নাই—এই আট মাসের মধ্যে সেক্রেটারী ম'রে গেলে ভাল হ'ত!

ইস্কাপনের চোখে হঠাৎ জল এসে গেল।

*　　*　　*　　*

ঘরখানা শুধু নামেই দাঁড়িয়ে আছে। চালে এক মুঠা খড় নাই। বাখারিগুলোর অর্ধেক আছে, অর্ধেক নাই। দেওয়ালের একটা দিক্ গোটাই প'ড়ে গিয়েছে! বাকী তিন দিকেরও ছ'আনা অবস্থা। দশ আনা আছে। দরজাটা ভেঙ্গে প'ড়ে আছে দাওয়ার ওপর; মাটি চাপা প'ড়েআছে। ইস্কাপন একটু আশ্চর্য হয়ে গেল। এমন বেশী মাটি কিছু চাপা প'ড়ে নাই, তবু দরজা জোড়াটা থাকল কি ক'রে? হঠাৎ তার হাসি পেল। দরজাটাকে চাপা দিয়েছে যে মাটিটা—সেই মাটির ঢিপিতে একটা গর্ত, গর্তের মুখে একটা গোখরোসাপের খোলস। হরিহরি, ওই জন্য! সাপটাকে দেখতে না পেলেও সাপটাকে তার ভাল লাগল। ভাল সাপ! বেশ সাপ! সাপটাকে সে মারবে না। তাড়িয়ে দিলেই হ'ল। ঘর দোর পরিষ্কার ক'রেথাকতে আরম্ভ করলেই ও পালাবে। আর দরজার মাটি খুঁড়তে গেলেই যদি বেরিয়ে প'ড়ে তবে সঙ্গে সঙ্গেই পালিয়ে যাবে। হঠাৎ মনে হ'ল, কালীমায়ের ডোম দেবাংশী যেমন একটা গোখরো পুষেছে তেমনি ক'রে সাপটাকে ধরিয়ে ওর বিষ দাঁত ভেঙে ওটাকে পুষলে কেমন হয়?

—এই ইস্কাপন?

—কে? ইস্কাপন ঘুরে দেখলে—তার জমিদারের লোক। জমিদার মানে—এই খানিকটা জমিরই মালিক শুধু। গেরস্ত ভদ্রলোক। তারই গরুর রাখালটা এসে দাঁড়িয়াছে। ইস্কাপন বললে—কি?

—বাবু বললে, তোমার ঘর বাবু অন্য লোককে দিয়ে দিয়েছে। এ ঘরে তুমি ঢুকো না।

—দিয়ে দিয়েছে? অন্য লোকের ঘরে ঢুকব না আমি?

—হঁ্যা। তাই ব'লে দিল বাবু।

ইস্কাপন হতবুদ্ধির মত কিছুক্ষণ রাখালটার দিকে চেয়ে রইল, তারপর হঠাৎ ব'লে উঠল—শালা! শূয়ারের বাচ্চা! কি বললি? আমার বাড়ি—আমি ঢুকব না?

লোকটা পিছু হাটিতে শুরু করলে—ওই, তা আমি কি করব? বাবু ব'লে দিলে যে তোমাকে বলতে।

—বাবু? ওরে শালা তুই এলি কেনে? তোমার বাবুকে মেরে তবে আমার অন্য কাজ! আমার ঘর, শূয়ারের বাচ্চা! ছোট লোকের কুত্তা—

লোকটা ততক্ষণে পিছনে ফিরে বোঁ বোঁ শব্দে ছুটতে আরম্ভ করেছে। আগেকার কাল হ'লে এই দৃশ্য দেখে ইস্কাপন হো-হো ক'রে হাসত। কিন্তু আজ আর তার হাসি এল না। রাগে মাথাটা যেন ফেটে যাচ্ছে মনে হচ্ছে। সে ছিল জেলে বন্দী হয়ে, তার এই অসময়ে তার ঘর, কত যত্ন ক'রে যে ঘরখানি করেছিল, সেই ঘর তার অন্য লোককে দিয়ে দিয়েছে! ইস্কাপন কুড়িয়ে নিলে একটা মাটির ঢেলা। ছুঁড়লে বোঁ ক'রে পলায়নপর রাখালটার দিকে। কিন্তু রাখালটার ভাগ্য ভাল। লাগল না তাকে। কিছুক্ষণ রাগে গুম হয়ে সে সেইখানে ব'সে রইল। তারপর উঠে চলল ক্ষিতীশের সন্ধানে। বেলা অনেক হয়েছে। ক্ষিদে পেয়েছে। রৌদ্রের মধ্যে যেন আগুনের আঁচ খেলে যাচ্ছে।

ইস্কাপনের মনে হ'ল এ সব যেন একা তার ওপর অত্যাচার করবার জন্য হচ্ছে। এ রৌদ্রের এই আগুনের ঝলক—এও তাকে দগ্ধাবার জন্য।

সেক্রেটারী তাকে বিনা কারণে বলে—লোকটা মরে নি কেন?

জমিদার তার বাড়ি কেড়ে নিয়েছে।

গাঁয়ের মাটি তার পায়ের তলায় তেতে জ্বলন্ত অঙ্গার হয়ে উঠেছে। বাতাসে আগুনের আঁচ এসে তাকে দগ্ধাচ্ছে।

ক্ষিতীশের বাড়ি বন্ধ। মোটরের গ্যারেজটা ফাঁকা।

ক্ষিতীশ নাই। যুদ্ধের জন্যে পেট্রোল পাওয়া যায় না। ট্যাক্সি চালানো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ট্যাক্সি বিক্রি ক'রে ক্ষিতীশ চ'লে গিয়েছে এখান থেকে। ইস্কাপন ব'সে পড়ল। তার চোখের সামনে সত্যিই পৃথিবী খাঁ-খাঁ করছে। আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত সব ধোঁয়া—সব ধোঁয়া।

আপনার কাছার খুঁটে কয়েকটা টাকা ছিল—সেইটাতে সে হাত দিয়ে দেখলো। জেল গেটে জমা ছিল টাকা ক'টা। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠল। বাজারে এসে কেষ্ট মোদকের দোকানে দাঁড়াল।

—ভাল আছেন, মোদক মশায়?

—কে? ইস্কাতন লাগছে।

—হ্যাঁ গো!

—এলি কবে?

—আজই।

—বেশ ! বেশ ! কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কেষ্ট মোদক বললে,—তারপর ?

—এই চিঁড়ে—আর মিষ্টি দ্যান দেখি !

—ধারে দিতে পারব না কিন্তু।

কাছার খুঁট খুলে একটা টাকা বার ক'রে ইস্কাপন আগেই ফেলে দিলে—বললে—দু' আনার চিঁড়ে—দু' আনার মিষ্টি !

—একি ? দু'আনার চিঁড়ে গো ? দু'আনার ওই ক'টি কি দিচ্ছেন ?

মোদক হেসে বললে—এই দু'আনার চিঁড়ে।

ইস্কাপনের চোখ দুটো বড় হয়ে উঠল। দু'আনার চিঁড়ে ? গলায় ছুরি দ্যান না কেনে তার চেয়ে।

মোদক দু'আনার দুটি বড় মার্বেলের মত রসগোল্লা ঠোঙায় ফেলে দিয়ে বললে—ধানের দর পনের টাকা। চালের পঁচিশ টাকা। এক পয়সার মিষ্টির দাম চার পয়সা হয়েছে। এই দেখ্।

ইস্কাপনের আর সহ্য হ'ল না। সে ঠোঙাসুদ্ধ চিঁড়ে রসগোল্লা ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে বললে—তার চেয়ে এক টাকার আপিং খেয়ে মরব।

ঘটনাটা হাস্যকর, তবুও কেষ্ট মোদক অপ্রতিভ হয়ে গেল। বললে—আমরা কি করব বল্ ?

তোমরা কি করবে সে ইস্কাপন জানে না। সে জানে এ অত্যাচার—তার পটলি মরেছে ; ঘর কেড়ে নিয়েছে জমিদার, ট্যাক্সি বন্ধ হয়েছে, ইস্কাপনের কাজ গিয়েছে। চার আনার খাবারে পেটের একটা কোণও ভরবে না ইস্কাপনের—এ অত্যাচার। তার ইচ্ছে হচ্ছে—মাথার চুলগুলো টেনে ছিঁড়ে ফেলে। কেষ্ট ময়রার মাথাটা ভেঙে দেয়—দেওয়ালের সঙ্গে ঠুকে।

—আরে, ইস্কাপনোয়া ! থানার কনেস্টবল।

রুক্ষ দৃষ্টিতে চেয়েই সে বলল—সাধারণ চোর ডাকাতের মত সে থানা পুলিসকে ভয় করে না।

—চল্—দরোগা বাবু বোলাইছেন তুকে।

—এখন আমি যেতে লারব, যাও। ব'লে হন্ হন্ ক'রে চলতে লাগল। কিছুদূর গিঁয়েই সে ফিরল।—চলো—তোমার দরোগাই কি বলছে দেখি। চলো।

দারোগা বললে—কবে ফিরলি ?

—আজই।

—কোথায় উঠেছিস?

—ঘর ভেঙে গিয়েছে। পটলি ম'রে গিয়েছে। ক্ষিতীশ নাই। পথেই ঘুরছি এখন।

—তারপর?

এ প্রশ্নের উত্তরে ইস্কাপন বললে—ক্ষিদেতে পেট জ্বলে গেল, খেতে স্থান মশায়। দারোগা অবাক হয়ে গেল।

ইস্কাপন বললে—চার আনার চিঁড়ে মিষ্টি কিনে রেগে ফেলে দিলাম। এই—এই একমুঠো চিঁড়ে—আর এ টুকুন দুটো মিষ্টি—চোখে তার জল এল।

দারোগা চারটি মুড়ি আর এক টুকরো পাটালী তাকে দিলে, বললে—বিকেলে বরং লঙ্গরখানায় যাস্, সেখানে খেতে পাবি।

লঙ্গরখানা? ইস্কাপন অবাক হয়ে গেল।

দারোগা বললে—কোথায় থাকবি, কি করবি খবর দিয়ে যাস বাপু। তারপর বললে—তুই শহরে-টহরে চ'লে যা না রে। মোটরের কাজ জানিস। চাকরী যা হোক মিলবেই। এখানে থাকলেই তো হাঙ্গামা করবি। আর অভ্যেসে না করলেও পেটের জ্বালাতেও চুরি করতে বাধ্য হবি।

লঙ্গরখানা।

দেখে শুনে ইস্কাপন অবাক হয়ে গেল। সারি সারি ব'সে গেছে সব—মেয়ে-পুরুষ ছেলে-বুড়ো জোয়ান, যাকে আগে এখানে বলত কাঙালী-ভোজন—লঙ্গরখানা তাই। তবু তার সঙ্গে অনেক তফাৎ। কেউ কারুর দিকে তাকায় না। জোয়ান ছেলে পর্যন্ত জোয়ান মেয়ের দিকে চাইতে ভুলে গিয়েছে। পাঁজরার হাড় বেরিয়ে গিয়েছে, চোয়ালের হাড় উঠেছে উঁচু হয়ে, পেট জ্বলে গিয়েছে। জোয়ান ছেলে—যে চোখের রঙের ঘোরে যুবতী মেয়ের দিকে তাকায়—সে রঙই মুছে গিয়েছে চোখ থেকে। ঘোলা—হলদে চোখ। ইস্কাপনের নিজেরই চাইতে মনে থাকল না।

দু'হাতা চালে ডালে ঘাঁটা জলো খিচুড়ী। জেলের লপ্সী এর চেয়ে ঢের ভাল। খানিকটা শাক-পাতায় আর একটা কিম্ভূৎকিমাকার বস্তু। তবু পেটের জ্বালায় তাই খেয়ে সে উঠে পড়ল। এর চেয়ে ম'রে যাওয়া ভাল। হাজার বার

ভাল। তার হাড়ের ভেতর পর্যন্ত জ্বলছে যেন। ম'রে হাড় জুড়োয়—কথাটা সে শুনেছিল—আজ সে খুব ভাল ক'রে বুঝতে পারলে কথাটা।

—ইস্কাপন কাকা!

কে?

তিনটে ছেলে। একটার বয়স আট—একটার পাঁচ—একটার তিন কি চার। অদূরে দাঁড়িয়ে একটা বছর পনরো বয়সের মেয়ে। মোটা ডিগ্-ডিগে পেট—বুকের পাঁজরাগুলো ঝির ঝির করছে, ঘোলা চোখ, রুক্ষু চুল। চৈতন হাড়ীর ছেলে সব। ওই মেয়েটা চৈতনের বেটার বউ। চৈতন হাড়ীকে ইস্কাপন দাদা বলত। চৈতনও চোর ছিল—দুজনের মধ্যে ভালবাসাও ছিল খুব। দু'ক্রোশ দূরে চৈতনের বাড়ি।

—কি রে? তোরা হেথা কেনে রে।

—খেতে আইচি। তুমি কবে এলে কাকা?

—খেতে এসেছিস? এইখানে? এই পিণ্ডি? ইস্কাপন অবাক হয়ে গেল। চৈতন নামজাদা চোর। তা' ছাড়া ইদানীং ত তার ঘরেই দল বেঁধে উঠেছিল। চৈতনের ছয় ছেলে। বড়টা মেজটা ডাগর; বড়টার বউ ওই মেয়েটা। দুই ছেলে নিয়ে চৈতন রাত্রে বের হ'ত।

—বাবা মরে গেইছে, কাকা।

—চৈতনদা মরেছে?

—মা মরেছে, দাদা মরেছে, মধ্যম মরেছে, গোঁসাই চ'লে গেয়েছে কোথা।

হায় ভগবান্! বলছে কি? শুবরীর চৈতন, তার ছেলে—। কিসে ম'ল? কবে ম'ল? এবার বউটা এগিয়ে এল। বউটার চেহারাও যেন একখানা কাঁটার মত। দেখে শরীর শিউরে ওঠে। অথচ চমৎকার দেখতে ছিল বউটা। হৃষ্টপুষ্ট মেয়েটা, এক হাত ঘোমটা টেনে ঘুর ঘুর ক'রে বেড়াত, ভারী ভাল লাগত। ঘোমটার মধ্য দিয়ে চোখে চোখ পড়লেই ফিক ফিক ক'রে হাসত।

চৈতনের স্ত্রী পুত্রবধূকে এর জন্যে গাল দিত,—মর্ মুখপুড়ী, কালামুখী দেখন-হাসি আমার! দোব নোড়ায় ঠুকে দাঁত ভেঙ্গে।

চৈতনের ছেলে গর্জাতো—নেকড়ে বাঘের মত, বলতো—টুটি ছিঁড়ে দোব একদিন।

চৈতন বলতো—উ কি বদ্ স্বভাব ?

চৈতনের ছেলে ইস্কাপনকে কাকা বলতো, তবুও ইস্কাপনের মনে হ'ত—। আজ কিন্তু ইস্কাপনের সমস্ত ভেতরটা ঘিন্‌ঘিন ক'রে উঠল ওকে দেখে। মেয়েটার মুখে আর সে ঘোমটাও নেই, সে হাসিও নেই। সে বললে—গুষ্টিসুদ্ধ কলেরা হয়েছিল। আমরা বাঁচলাম, তারা ম'রে গিয়েছে। সেজন্য পালিয়েছি।

বড় ছেলেটা বললে—এইখানে থাই আমরা।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ইস্কাপন মোদকের দোকানে টাকা-ভাঙ্গানী পয়সা থেকে আধুলিটা বের ক'রে ছেলেটার হাতে দিয়ে বলল—বাড়ি যা! ব'লেই সে চলতে আরম্ভ করলে।

কিছুদূর এসে হঠাৎ তার মনে হ'ল পিছনে ছেলেগুলো এখনও কথা বলছে। পিছন ফিরে দেখলে—সত্যই তাই! সে দাঁড়াল।

—তোরা বাড়ি গেলি না ?

তারা পরস্পরের মুখের দিকে চাইলে। বউটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

—সন্ধ্যে হয়ে গেল যে ?

বড়ছেলেটা বললে—যাবনা বাড়ি।

মেজটা বলে উঠল—তুমি আইচ এইবার, তোমার কাছেই থাকব কাকা!

ইস্কাপনের সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। তার নিজের আশ্রয় নেই, কাজ নেই, তারই দিন কাটছে ওই ভিক্ষের পিণ্ডি খেয়ে; তার ওপর—রোঁয়া-ওঠা কুকুরের বাচ্চার মত তিন তিনটে ছেলে, ওই—কদর্য কুৎসিত একটা মেয়ে তার সঙ্গে জুটতে চায়। নিজেরই ওপর তার রাগ হয়ে গেল। সে ওই আধুলিটা দিয়েই নিজের সর্বনাশ করেছে। ওরা ভেবেছে, ওদের ওপর তার অনেক মায়া, ওরা ভেবেছে—ইস্কাপনের অনেক পয়সা।

সে ব'লে উঠল, আমার বাড়ির ধার মাড়াবে ত খুন করব তোমাদিগে। অত্যন্ত অশ্লীল গাল দিল ওই কঙ্কালসার বউটাকে।—বেরো—বেরো—বেরো।

অনেকক্ষণ ঘুরে কোথায় রাত্রে শুয়ে থাকবে স্থির করতে পারলে না। স্টেশনে গিয়েছিল। গরমের দিন। প্লাটফরম—বেশ আরামের জায়গা, সেখানেও ভাল লাগেনি। অবশেষে সে এল আপনার ভাঙ্গা ঘরের সামনে। বাড়ি আর তার

নয়, জমিদার কেড়ে নিয়েছে। মারামারি সে করতে পারে। কিন্তু কি ফল? এই গাঁয়ে—শুধু এই গাঁয়ে কেন—সব জায়গাতেই ত এই হাল। ইষ্টিশানে সে শুনেছে—দুনিয়া—পৃথিবী সুদ্ধ এই অবস্থা। তবে তার কাছে এই গ্রামটিকেই সব চেয়ে নিষ্ঠুর স্থান ব'লে মনে হচ্ছে। তাই আর ঘর নিয়ে হাঙ্গামা করতে তার ইচ্ছে নাই। আজ রাতটা সে শুয়ে থাকবে তার ভাঙ্গা ঘরের দাওয়ায়। শেষ রাত্রি। তাতে গর্তের মধ্যে আছে যে গোখরোটা—সেটা যদি দেয় চুম খেয়ে, ত খালাস। বাঁচে ত কাল সকালে উঠেই চ'লে যাবে।

অন্ধকার সব। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যেই ঘুরছে—ফিরছে সে, অন্ধকারের মধ্যেও নজর চলছে বেশ! দাওয়ার কাছে এসেই সে চমকে উঠল। কে? কারা? হুঁ, তাই বটে। সেই নেড়াকুত্তার বাচ্চার দল। আর সেই মেয়েটা! ফতুয়ার পকেট থেকে দেশলাইটা বার ক'রে সে ফস্ ক'রে একটা কাঠি জ্বেলে ফেললে।

ঠিক তাই। সঙ্গ ছাড়ে নি। তাকে ছাড়বে না ব'লে এখানে এসে একপাশে শুয়ে আছে। রূঢ় ঝাঁকি দিয়ে কর্কশ কণ্ঠে সে ডাকলে। কিন্তু অদ্ভুত ঘুম। মরণদশা ওদের, আধা মরণ ওদের হয়েই গিয়েছে। তাই ঘুমও ওদের মরণ-ঘুম। না—হয়েই গিয়েছে এর মধ্যে? গোখরো কাজ শেষ করেছে? না! গা গরম; জ্বরের মত জ্বলছে। সে আবার ঠেলা দিল। —এই! এই!

এবার তারা উঠল। ইস্কাপন একে একে হাতে ধ'রে ঝুলিয়ে এনে রাস্তায় একরকম আছড়ে ফেলে দিলে। বউটাকে টেনে আনলে চুল ধ'রে। তার অঙ্গ স্পর্শ করতেও ইস্কাপনের মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। সকলকে টেনে বাইরে এনে রূঢ় স্বরে সে বললে—মরবি! মরবি! গোখরো খরিশ দেবে শেষ ক'রে। ব'লে সে অন্ধকারের মধ্যেই সেই খোলসের টুকরোটা এনে তাদের গায়ে ফেলে দিয়ে বললে—এই দেখ্!

তারপর সে সেখান থেকে একরকম ছুটে চ'লে গেল। দশটার ট্রেনের টিকিটের ঘণ্টা বাজছে। সে স্টেশনের পথে উঠল এসে থানায়। আপিসে এখনও লণ্ঠন জ্বলছে।

—দারোগাবাবু!

—কে? ইস্কাপন? কিরে এত রাত্রে?

—যাবার সময় ব'লে যেতে বলেছিলেন। তাই—

আশ্চর্য হয়ে গেল দারোগা।—কোথায় যাবি এত রাত্রে?

—আজ্ঞে? সে জানে না কোথায়।

—যাবি কোথায়? কাশী না গয়া—না মক্কা, না মদিনা? কোথায়?

—কাশী। আজ্ঞে কাশীই যাব আমি।

—কাশী?

—হ্যাঁ আজ্ঞে, সন্নেসী হ'ব আমি। মেগে খাব। চুরি না—চামারি না। কাজ না কম্ম না—বাবার নাম করব আর মেগে খাব। আমি কাশী চল্লাম। দশটার টেনে।

দরদর ক'রে তার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল।

দারোগা অবাক হয়ে গেল।

কাশী নয়; বর্ধমানে এসে হঠাৎ তার বৈরাগ্য কোথায় বিলুপ্ত হয়ে গেল। বিশ্বনাথের প্রতি ভক্তিও সে আর অনুভব করলে না।

ভাগ! কাশী কেন যাবে সে? বাবা বিশ্বনাথ! মাথায় থাকুন বাবা বিশ্বনাথ। একবার ইস্কাপন দেওঘর গিয়েছিল ক্ষিতীশের মোটরের সঙ্গে। বাপ! মন্দিরের ভিতর যে অন্ধকার আর যে গুমোট গরম! ইস্কাপনের মাথার উপরেই একজন গঙ্গাজলের ভাঁড় ভেঙে দিয়েছিল।

সে কলকাতার গাড়িতে চ'ড়ে বসল।

কলকাতা! রাস্তায় পয়সা ছড়ান। বড় বড় মোটর বাস, ঝক্‌ঝকে দামী মোটর, বড় বড় ঘোড়া,—আকাশ ছোঁয়া বাড়ি; বিজলী বাতি—রাত্রিতে অন্ধকার ঢুকতে পারে না কলকাতায়। রূপের হাট কলকাতা! বেনারসী শাড়ি প'রে স্বর্গের পরীর মত মেয়েরা পথ আলো ক'রে চ'লে যায়। দু'হাতে রোজকার করবে ইস্কাপন, পেট ভ'রে খাবে; সাধ মিটিয়ে পরবে; চোখ জুড়িয়ে রূপ দেখবে, ঐশ্বর্য দেখবে, জীবন সার্থক করবে।

কলকাতায় এসে নামল সে। রাত্রি তখন দশটা। ব্ল্যাক আউটের অন্ধকার কলকাতা। অন্ধকার! অন্ধকার সব অন্ধকার! অন্ধকার এত গাঢ় হয়? অমাবস্যার রাত্রের অন্ধকারে ইস্কাপন একা পথ হেঁটেছে—কিন্তু এমন অন্ধকার দেখে নাই। শুধু বড় বড় রাস্তায় দু'পাশের দোকানের মধ্যে আলো দেখা যায়, তার কিছু ছটা এসে পড়ে পথের উপর কিন্তু ছোট রাস্তা—গলিপথ—সে কি

ভীষণ অন্ধকার! মধ্যে মধ্যে ঠুঙিপরানো আলোর তলায় খানিকটা আলো মুগ-মুগ করছে।

পরদিন সকালে সে দেখলে—রাস্তার ধারে কঙ্কালসার মানুষের যেন মেলা ব'সে গিয়েছে। ওই গৌর দাদার ছেলেগুলোর মত, বউটার মত হাড় পাঁজরা সার ভিখিরীর পঙ্গপাল!

একটা জায়গায় ভিড় জমে গিয়েছে। চিৎকার ক'রে কাঁদছে একটা মেয়ে। উঁকি মেরে ইস্কাপন দেখলে—একটা ছেলে প'ড়ে আছে, রক্তে ভাসছে যেন, মাথার খুলিটার আধখানা নাই। রক্তের মাঝখানে ভাসছে মাথার সাদা ঘিলু! মোটর চাপা পড়েছে। মা কাঁদছে বুক চাপড়ে। ওই ভিখিরীদেরই ছেলে!

শিউরে উঠে ইস্কাপন চ'লে গেল সেখান থেকে। রাগও হ'ল। ড্রাইভার বেটাকে পেলে সে লাগাত কয়েকটা সুইট ব্লো! ঘুষিকে ইস্কাপন সুইট ব্লো বলে। কথাটা সে শিখেছে দেশের মোটর সার্ভিসের মালিকের কাছ থেকে। মালিক পথেই সুইট ব্লো চালাত তাদের বুকে পিঠে।

বাস মোটর ট্রাম দেখতে দেখতে সে চলে।

আবার এক জায়গায় সে দাঁড়ায়। অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। একখানা মোটর বাসে দুটো ভিখিরীকে ধরাধরি ক'রে তুলছে। মরেই গিয়েছে ব'লে মনে হ'ল ইস্কাপনের। না, বুকের পাঁজরাগুলো দুলছে এখনও। মোটর বাসটার পিছন দিকটা কাটা, গায়ে একটা লাল ঢেরা কাটা আঁকা রয়েছে। কে একজন বললে—হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে।

—হাসপাতাল না মাথা। নিয়ে গিয়ে ফেলে দেবে নিমতলায়। যমের গাড়ি।

তিনজন ভিখিরী কাঁদছে—ওগো নিয়ে যেয়ো না গো! তোমাদের পায়ে পড়ি গো!

নীল কোর্তা পরা একটা লোক গাড়িতে হ্যাণ্ডেল মারলে।

স্টার্ট নিলে না গাড়ি। বোঁ বোঁ ক'রে হ্যাণ্ডেল মেরে—লোকটা ঘেমে গেল! ড্রাইভার এবার সেল্‌ফস্টার্টারের চাবি টিপলে। খানিকটা—কোঁ-ওঁ-ওঁ ক'রে সেও থেমে গেল। ড্রাইভার নেমে ইঞ্জিনের বনেট খুলে ফেললে।

ইস্কাপনও কৌতূহলী হয়ে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করলে কি হ'ল ইঞ্জিনটার। অত্যন্ত ছোট্ট একটা ব্যাপার। ইস্কাপনের চোখে প'ড়ে গেল ব্যাপারটা। ড্রাইভার

খুঁজে বেড়াচ্ছে বাঁশ বনে কানা ডোমের মত। ইস্কাপন আর থাকতে পারলে না। বললে—ছেলের কানে বেথা, আপুনি পেটের চিকিৎসে করছেন যে মশায়!

বিরক্ত হয়ে ভ্রূকুটি ক'রে ফিরে চাইলে ড্রাইভার। ইস্কাপন আঙুল দিয়ে দেখালে—ওই দেখুন। ওইখানে। এখানে। সে ঠিক জায়গায় হাত দিলে।

কদর্য চেহারার একটা ভিখিরী!

ইস্কাপন বললে—মোটরের কাজ আমি খুব ভাল জানি মশায়। একটা কাজ দেন কেনে!

* * *

এ-আর-পির এ্যাম্বুলেন্স।

নীল কোর্তা নীল প্যাৎলুন প'রে প'রে ইস্কাপন গাড়ি চালায়। কাজ পেয়ে গিয়েছে সে; ইস্কাপন ব'লে মানুষের দশ দশা—কখনও হাতি কখনও মশা। ছিলাম হাতি, হয়েছিলাম মশা—ফের হলাম হাতি। নসিব কা খেল। দুনিয়া গোলক-ধাঁধা ভাই—নিমেষে ফক্কিফার!

গাড়িতে ব'সে সে সিগারেট ধরিয়ে আরাম ক'রে টানে। অন্য লোকেরা স্ট্রেচারে তুলে ব'য়ে নিয়ে আসে দুস্থ মরণোন্মুখ ভিখিরীদের। গাড়ির ভেতর দু-থাকি ক্যাম্বিসের স্ট্রেচার। স্ট্রেচারগুলো ভর্তি হয়ে গেলে ইস্কাপনের গাড়ি চলে হাসপাতালের দিকে। ওদের নামিয়ে দিয়ে আবার চলে গাড়ি কে কোথায় পথের পাশে মরছে—তার সন্ধানে।

দুর্গন্ধে পেটের ভিতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। ইস্কাপন জোরে সিগারেটে টান মারে। গাড়ির ভিতর শুয়ে কাতরায় হতভাগারা। ইস্কাপন আপন মনেই বলে —"কেশে ধ'রে নিয়ে যাবে, মিনতি কাহিনী শুনবে না।" তারপর হঠাৎ ব'লে ওঠে—শা-লা!

হাসপাতালের পথেই কত লোক দাঁত খিঁচিয়ে ম'রে যায়।

ইস্কাপন তাতে বলে—শা-লা!

মরুক। ইস্কাপনের ওই মড়া ব'য়েই পেট চলছে, তাই তার লাভ! শুধু পেট চলা! মাথায় গন্ধ তেল মাখে ইস্কাপন, সিগারেট খায়, কোর্তা পাৎলুন প'রে কাবুলী স্যাণ্ডেল পায়ে দেয়, সন্ধ্যের পর অফ ডিউটিতে ইস্কাপন তো রাজা।

দেশীমদের দোকানে ঢুকে—চোখে রঙ ধরিয়ে—সিগারেট মুখে দিয়ে সে বস্তির দিকে হাঁটে। মধ্যে মধ্যে টর্চ জেলে আশপাশ দেখে।

শা-লা! আপন মনেই সে বলে—সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টি-মিষ্টি হাসি ফুটে ওঠে তার কদর্য পুরু কালো ঠোঁটে; গুনগুন ক'রে সে গান ধরে—'হেসে নাও দুদিন বই তো নয়।' তার ছেলেবেলায় গ্রামের সখের থিয়েটারে সে গানটা শুনেছিল।

যমের গাড়ির চাকরি। যত মরবে মরুক—সে পিছপাও হবে না। গাড়িতে তেল থাকলেই হ'ল—স্টীয়ারিং ধ'রে সে ঠিক ট্রিপ মারবে ঝপাঝপ। 'চলো মুসাফের, বাঁধো গাঁঠেরী।' বেশী দূর নয় বাবা—বৈতরণীর ফটক পর্যন্ত সে হাজির ক'রে দেবে। দিন গেলে ত্রিশ চল্লিশ আসামী নিয়ে চলে। মধ্যে মধ্যে মনে হয়—হায়-হায়—গৌরদাদার সেই ছেলে কয়টা আর বউটাকে সে গাড়িতে পুরে যদি চালাতে পারত!

যমের গাড়ির ড্রাইভার সে। তফাৎ চলো বাবা। সে হর্ণ দেয়—আর কল্পনা করে—হর্ণের শব্দের মধ্যে সে ঠিক বলছে—যমপুরী! যমপুরী! যমপুরী!

এর ওপর মধ্যে মধ্যে বাজে সাইরেন! জাপানীরা আসে বোমা ফেলতে। ইস্কাপন রেডী হয়ে ব'সে স্টীয়ারিং ধরে। হুকুম হলেই তার গাড়ি ছুটবে! নিয়ে আসবে বোমার ঘায়ে যমপুরীর যাত্রীদের বোঝাই ক'রে।

যেদিন বেশী মদ খায় রাত্রে—সেদিন তার মনে হয়—সব ম'রে যায়! সে গাড়ি বোঝাই ক'রে হর্দম নিয়ে গিয়ে ফেলে! ঝপাঝপ! ঝপাঝপ! ঝপাঝপ!

* * *

সেদিন রবিবার। বেলা বোধ হয় দশটা। ইস্কাপন ব'সে সিগারেট টানছিল অলসভাবে। প্রকাণ্ড একটা হাতার মধ্যে খাপরার ছাউনি-করা শেডের মধ্যে গাড়িগুলো রয়েছে। মুখ সব রাস্তার দিকে। ট্যাঙ্ক ভর্তি তেল। সব তৈয়ার অবস্থায় রয়েছে। রবিবারটা—খুব হুঁশিয়ারীর বার। তবে দিনের বেলায় নয়, রাত্রি বেলা; এদিন আর ছুটি নাই। রবিবারেই আসে জাপানীরা। সন্ধ্যের পর কখন যে কঁকিয়ে বেজে উঠবে সাইরেন তার কোন ঠিকানা নাই। রবিবারে আমেজটা ইস্কাপন দিনের বেলাতেই সেরে নেয়, লুকিয়ে-রাখা শিশি থেকে কয়েক ঢোক খেয়ে ইস্কাপন মৌজ ক'রে সিগারেট টানছিল। হঠাৎ সাইরেন বেজে উঠল। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ইস্কাপন। যাঃ! শালা দিনের বেলাতেই এল

না কি জাপানীরা! আসুক না—আসুক—ছুটল ইস্কাপন গাড়ির দিকে! তৈয়ার—তৈয়ার থাকতে হবে!

আকাশে প্লেনের শব্দ উঠল। গাড়ির সিটে ব'সেই পাশ দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সে আকাশের দিকে চাইলে। সাদা ঝক্‌ঝকে—বকের ঝাঁকের মত একঝাঁক প্লেন চ'লে গেল।

ইস্কাপন বললে—শা-লা!

ছুটছে ইস্কাপনের গাড়ি। খিদিরপুর ডক। ধোঁয়ায় আকাশ ছেয়ে গিয়েছে—জাহাজ জলছে, বাড়ি ভেঙে পড়েছে; চারিদিকে প'ড়ে আছে রক্তাক্ত মানুষ। হাত পা—মুণ্ড—ঘিলু—রক্ত! আঁশটে গন্ধ উঠছে!

ইস্কাপনের গাড়ি বোঝাই। ছুটছে। হাসপাতাল। হাসপাতাল থেকে আবার খিদিরপুর। আবার হাসপাতাল। আবার খিদিরপুর। আবার হাসপাতাল। ওদিকের হাসপাতাল বোঝাই। চলো এবার মিটিয়া কলেজ!

গাড়ি ছুটছে! ইস্কাপনের মনে হচ্ছে চারিদিকের বাড়ি ছুটছে পিছনের দিকে। ছুটছে। স্টীয়ারিং ধ'রে আছে ইস্কাপন। চোখ সামনের দিকে। যমের বাড়ির যাত্রী নিয়ে চলেছে সে। যমের গাড়ি! গাড়ি থামে। জখমী নামায় লোকেরা। ইস্কাপন আড়ালে গিয়ে শিশিতে মুখ লাগায়। চোখ লাল হয়ে ওঠে! মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে। চলো মুসাফের—বাঁধো গাঁঠেরী! শা—লা! গাড়ি ছোটে হু-হু ক'রে। পাশের লোক ত্রস্ত হয়ে ওঠে।—এই—এই! করছিস কি? স্পীড কমিয়ে দে! এই—এই!

ইস্কাপন হাসে। বহুদূর যানা হৈ! চলো মুসাফের!

—এই! এই! রোখো গাড়ি! রোখো!

—ছুটি—ছুটি! ছুটি দাও আমাকে! ছুটি!

পাশ থেকে জোর ক'রে ঠেলে ইস্কাপনকে সরিয়ে পাশের লোকটি গাড়ির স্টীয়ারিং ধরে, ফুট ব্রেকে পা দেয়; কিন্তু তার আগেই গাড়িখানা গিয়ে ধাক্কা মারে সামনের লাইট পোস্টে।

ইস্কাপনের মনে হয় লাইট-পোস্টটাই যমরাজা। ধাক্কা মারবার মুহূর্তটিতেই সে সেলাম বাজিয়ে বলে—সেলাম হুজুর!

মতিলাল

'চোত-পরব' অর্থাৎ গাজনের সঙ বাহির হইয়াছিল। ঢাক-ঢোল বাজাইয়া শোভাযাত্রার মধ্যে বাবা বুড়াশিবের দোলা চলিয়া গেল, তাহার পিছনে পিছনে সঙের দল চলিতেছিল। একজন বাজিকর সাজিয়াছে, সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড বড় ভালুক, একটা হনুমান ; বাজিকরের বগলে একটা সাপের ঝাঁপি। এই বাজিকরের পিছনেই যত ছেলের ভিড়। কৌতুকেরও সীমা নাই, অথচ ভয়ও আছে, একটু দূরে দূরে কোলাহল করিতে করিতে তাহারা চলিয়াছে। ভালুকটা প্রকাণ্ড বড় —বোধ হয় বুড়া—গায়ের রোঁয়াগুলা অনেকস্থলে উঠিয়া গিয়াছে, ছেলের পাল সেটাকে লক্ষ্য করিয়াই বাজিকরের অলক্ষ্যে ক্রমাগত ঢিল ছুঁড়িতেছিল। বুড়া ভালুকটা কয়েকবার এমনইভাবে আঘাত পাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া গোঁ-গোঁ করিয়া উঠিল। সভয়-কৌতুকে ছেলের দল এদিকে-ওদিকে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। ভালুকটা খিল্‌খিল করিয়া হাসিয়া আবার বাজিকরের সঙ্গে চলিতে লাগিল।

ছেলেদের দলের অগ্রগামী পার্বতী তাহার পার্শ্বচর মদনকে বলিল, মানুষ রে, মানুষ—হাসছে। সেজেছে।

মদন বলিল, ধ্যেৎ! নারায়ণবাবুদের কাছারীতে জ্বরে কাঁপছিল, দেখিস নি? ভালুক না হ'লে জ্বর আসে—কাঁপে? গাঁজা খেলে—

চোটা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট শ্যামগোপালবাবুর বৈঠকখানাটা সম্মুখেই, সেখানে তখন শ্যামগোপালবাবু ইউনিয়ন বোর্ডের খাতাপত্র দেখিতেছিলেন। বাজিকরের হনুমানটা 'উপ্' শব্দে লাফ দিয়া দাওয়ার উপর উঠিয়া বসিল, ভালুকটাও প্রণাম করিয়া ধপ্ করিয়া সেইখানে পড়িয়া জ্বরে কাঁপিতে আরম্ভ করিল। হনুমানটা প্রেসিডেণ্টবাবুকে দাঁত দেখাইয়া ঘন ঘন চোখ মিট্‌মিট করিতে আরম্ভ করিল।

শ্যামবাবু অল্প একটু হাসিয়া বলিলেন, বেশ বেশ! ওবেলায় এসে পয়সা নিয়ে যাস্।

বাজিকর জোড়হাত করিয়া বলিল, আজ্ঞে, এই বেলাতেই পেলে—

শ্যামবাবু বলিলেন, যা বেটা, দেখছিস না, এখন সরকারী কাজ করছি ?

বাজিকর আর কিছু বলিতে সাহস করিল না, সে প্রণাম করিয়া ফিরিল।

শ্যামবাবুর খোট্টা চাপরাসীটা পাশে দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল, আরে ভালুকো তো বহুৎ লড়াই করে রে, দেখে তেরা কেমন ভালুকো।—বলিতে বলিতে সে ধাঁ করিয়া ভালুকটাকে বেশ কায়দা করিয়া জাপটাইয়া ধরিল। অতর্কিত আক্রমণে ভালুকটা বেকায়দায় নিচে পড়িয়া গেল।

বাজিকর চটিয়া উঠিয়াছিল, সে বলিল, ই কি করন তোমার সিংজী ? বলেহার বেটা, বলেহার বেটা ভালুক রে !

ভালুকটা নিজের অসতর্ক অবস্থা তখন অনেকটা সামলাইয়া লইয়াছে। চারিদিকে দর্শক জমিয়া গিয়াছিল। সম্মুখেই দাঁড়াইয়া পার্বতী আর মদন যুধ্যমান ভালুক ও চাপরাসীটার প্যাঁচ-কষাকষির সঙ্গে সঙ্গে আপন আপন দেহ লইয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া উঠিতেছিল, কখনও দাঁতে ঠোঁটে কামড়াইয়া বলিতেছিল, দে—দে—দে !

শুধু মদন আর পার্বতী নয়, ওরূপ ধারায় মুখভঙ্গী করিতেছিল আরও অনেকে, মায় শ্যামগোপালবাবু পর্যন্ত। ভালুকটা যখন চাপরাসীটাকে চিত করিয়া ফেলিয়া দিল, তখন তিনি ধনুকের মত বাঁকিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। দর্শকরা হাসিবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় হনুমানটা চট্ করিয়া উঠিয়া পরাজিত চাপরাসীটার মুখের উপর বাঁ পায়ের একটা মৃদু লাথি মারিয়া দিয়া দর্শকদের একেবার দাঁত দেখাইয়া দিল। দর্শকের মধ্যে হাসির একটা হাঁড়ি যেন সশব্দে ফাটিয়া পড়িল। পার্বতী পথের উত্তপ্ত ধুলার উপরেই একটা ডিগবাজি মারিয়া দিল।

চাপরাসীটা অপমানে চটিয়া উঠিয়াছিল, শ্যামবাবুও চটিয়াছিলেন ; কিন্তু এতগুলি লোকের সহানুভূতির বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। শুধু গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিলেন, হনুমান সেজেছে ওর নাম কিরে ? কানে ধর্ তো বেটার, এই চৌকিদার !

ভিড়ের মধ্য হইতে কে বলিয়া উঠিল, আসছে বারে ভোট দোব না কিন্তু।

অত্যন্ত রুষ্টকণ্ঠে শ্যামবাবু কহিলেন, কে ?

বক্তা আসিয়া সম্মুখে জোড়হাতে দাঁড়াইয়া বলিলেন, প্রভু, আমি।

শ্যামবাবু ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন, বক্তা তাঁহার এক আত্মীয় এবং বন্ধু—হবুকাকা।

শ্যামবাবু কহিলেন, এসো এসো, তামাক খাও খুড়ো।

হবুকাকা বলিলেন, যা যা সব, যা এখন।

সঙের দল চলিয়া গেল। সমস্ত গ্রামখানা ঘুরিয়া বাজিকর যখন শিবতলায় ফিরিল, তখন বেলা প্রায় চারিটা। দর্শকদলের বেশি কেহ আর তখন সঙ্গে ছিল না, শুধু পার্বতী তখনও পিছন ছাড়ে নাই। গাজনের পাণ্ডা হরিলাল পাত্র দাওয়ায় দাঁড়াইয়াছিল, বিরক্তিভরে সে বলিল, ওঃ, আমোদ তোদের আর শেষই হয় না। নে বাপু, লৈবিখি নিয়ে যা।

সঙ্গে সঙ্গে হনুমান ভালুক বাজিকর এক এক গামছা খুলিয়া বসিল। হরিলাল সের খানেক করিয়া চাল, কয়টা কলা ও সামান্য কয়েকখানা বাতাসা বিতরণ করিয়া দিয়া বলিল, এইবারে আমি খালাস বাবা।

পার্বতী আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল, সে আরও আশ্চর্য হইয়া গেল, যখন বাজিকর জানোয়ার দুইটাকে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল। হনুমানটাও এক দিকে চলিয়া গেল, ভালুকটাও পাশের গ্রামের পথ ধরিল। ভয়ে সে দূরত্ব একটু বাড়াইয়া দিয়া নাচিতে নাচিতে ভালুকটার পিছন ধরিল।

খানিকটা মাঠ পার হইয়াই 'মৌলকিনী' পুকুর, ভালুকটা পুকুরের ঘাটে নামিয়া বসিল, তারপর হাত পা মুখ ও দেহ হইতে একে একে খোলসগুলি ছাড়াইতে আরম্ভ করিল।

পার্বতীর আমোদের সীমা-পরিসীমা ছিল না,—তাহার অনুমানই সত্য হইয়াছে। সে করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল, মানুষই বটে, মানুষই বটে, ওরে বাবারে!

শব্দ শুনিয়া ভালুক তাহার দিকে চাহিয়া পরমানন্দে দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছিল। কিন্তু সে কি ভীষণ মূর্তি! হাঁড়ির মত প্রকাণ্ড মাথা, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, আলকাতরার মত কালো রঙ, নাকটা থ্যাবড়া, চোখ দুইটা আমড়ার আঁটির মত গোল এবং মোটা, দুই গালের থলথলে মাংস খানিকটা করিয়া চোয়ালের নীচে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, মুখগহ্বরের পরিধি আকর্ণ-বিস্তৃত। সেই মুখগহ্বর মেলিয়া বড় বড় দাঁত বাহির করিয়া সে হাসিতেছিল, দেখিয়া পার্বতী সভয়ে ছুটিয়া পলাইল। ভালুক তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল, ও খোকাবাবু, ও খোকাবাবু!

পার্বতী একবার দাঁড়াইয়া ফিরিয়া চাহিল। ভয় অপেক্ষা বিস্ময়ের মাত্রা তাহার অনেক গুণ অধিক হইয়া উঠিয়াছিল। এত লম্বা এত মোটা আর এত কালো লোক সে কখনও দেখে নাই। সমস্ত গা বাহিয়া কালো আঠার মত কি ঝরিতেছে! বুকও গুর্‌গুর করিতেছিল, ভালুক, না ভূত? না, তাহার চেয়েও বেশি মেলে গয়লাদের কাদামাখা মহিষগুলার সঙ্গে। লোকটা একখানা বাতাসা হাতে তুলিয়া তখনও তেমনই হাসিতে হাসিতে ডাকিতেছিল, পেসাদ, পেসাদ, শিবের পেসাদ।

পার্বতী সভয়ে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিল, ভালুকের কথা শুনিয়া সে দুই পা পিছাইয়া গেল। ভালুক এবার কয় পা তাহার দিকে আগাইয়া আসিয়া আরও খানিকটা বেশি হাসিয়া বলিল, ভয় কি খোকাবাবু, এসো।

পার্বতী নিমেষের মধ্যে পিছন ফিরিয়া ছুটিল এবং পথপার্শ্বের জঙ্গলের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল। ভালুক হাসিতে হাসিতে ঘাটে ফিরিয়া নৈবেদ্যের পুঁটুলিটা খুলিয়া বসিল।

সবসুদ্ধ গামছাটা জলে ভিজাইয়া লইয়া চাল কলা ও বাতাসায় মাখিয়া প্রকাণ্ড বড় বড় গ্রাসে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে শেষ করিয়া ফেলিল। উচ্ছিষ্টলোভী কয়টা কাক দূরে বসিয়াছিল; শূন্য গামছাখানা সে বার কয়েক তাহাদের দিকে সজোরে ঝাড়িয়া দিয়া বলিল, ওই লে, ওই লে। তারপর গামছাখানা জলে কাচিয়া লইয়া ভালুকের পোশাক ঘাড়ে ফেলিয়া সে পথ ধরিল। ডোমপাড়ায় পৌঁছিয়া একটা বাড়িতে ঢুকিয়া ডাকিল, ভোবন, আজ যে মজা, বুঝলি কিনা!

'ভোবন' অর্থাৎ ভুবনমোহিনী ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, জ্বালাস না আমাকে আর, আপন জ্বালাতে ব'লে মলাম আমি! ভাতের হাঁড়িটা নামা দেখি।

ভুবনমোহিনী ওই লোকটির যেন ছায়া বা দর্পণের মধ্যের নারীরূপিণী প্রতিবিম্ব। অমনই কালো, অমনই দৈর্ঘ্যে অমনই পরিধিতে। মাথার সম্মুখেই সিঁথি জুড়িয়া একটা টাক, প্রকাণ্ড বড় মুখের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র দুইটা চোখ, লম্বা নাক, তাহার উপর উপরের ঠোঁটের এক পাশের খানিকটা মাংস নাই, সে দিক দিয়া দুইটি দাঁত নিচের ঠোঁটের উপর চাপিয়া বসিয়া আছে।

ভালুকের পোশাকটা ঘাড় হইতে ফেলিয়া পুরুষটি ভাতের হাঁড়ি নামাইতে চলিল।

ভুবন বলিল, আমার মাথা বলে খ'সে গেল! ওষুধ নাই পত্তর নাই, আর বাঁচব না আমি। —ও মা!

পুরুষটি কোন উত্তর দিল না, কোথা হইতে একটা পোড়া বিড়ি বাহির করিয়া উনানের আগুনে সেটাকে ধরাইতে বসিল। ভুবন তাহার কাছে আসিয়া বসিল, তু ঘরে ব'সে থাকবি কেনে, বল্? একা মেয়েমানুষ আমি কত রোজগার করব?

ভালুক নিজের কনুইটা দেখিতে দেখিতে বলিল, তাই বলি, জ্বলছে কেনে? মাস ছেড়ে গিয়েছে দলকাছাড়া হয়ে।

তারপর ভুবনের দিকে চাহিয়া বলিল, বাবুদের ওই খোট্টা চাপরাসী বেটা আচমকা আমাকে চেপে ধ'রে কায়দা ক'রে ফেলিয়েছিল আর টুকচে হ'লে।

ভুবন বলিল, ত্যাল লাগা খানিক।—বলিয়াই সে মাটির উপর শুইয়া পড়িল, আঃ, গা-গতর যেন ঢেঁকিতে কুটছে!—বাবা!

ভালুকের কথা তখনও শেষ হয় নাই, সে বলিতেছিল, তেমনই দিয়েছি বেটাকে ঠিক ক'রে। আমাকে পারবে কেনে বেটা, আমার ক্ষ্যামতায় আর—

মুখের কথা কাড়িয়া ভুবন বলিল, তাই তো বলছি, ওই ক্ষ্যামতায় খাটলে যে রোজকার হয়! আচ্ছা, কেন খাটিস না, বল্ দেখি?

ভালুক বলিল, উ গাঁয়ে একটি কি সুন্দর ফুটফুটে ছেলে, বুঝলি ভোবন—

ভুবন ভুলিল না, সে বাধা দিয়া বলিল, তোর ভাত আমি যোগাতে পারি? খাটুনিকে এত ভয় কিসের তোর?

—ভয় আবার কি?

—তবে?

নিজের বিশাল দেহের দিকে চাহিয়া ভালুক কহিল, খাটতে গেলে গতর দেখে সব। বলে, গতর দেখ আর খাটছে দেখ। খুঁড়ে খুঁড়ে আমার গতর ক'মে গেল। উঁহু, উ সব হবে না। দত্ত-কাকা বলেছে, কলকাতার যাত্রার দলে ঢুকিয়ে দেবে আমাকে।

এ কথা ভুবনের বহুবার শোনা কথা। বহু কাণ্ড এই লইয়া হইয়া গিয়াছে;

ভুবন চুপ করিল। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ যেন তাহার কি মনে পড়িয়া গেল, সে উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সঙ সাজলি, তার পয়সা কই, নৈবিদ্যি কই?

ভালুক বলিল, পয়সা এখনও ভাগা হয় নাই।

—নৈবিদ্যি? বলি, নৈবিদ্যি কি হ'ল?

ভালুক ডাকিল, আয় আয় গোবরা, আয়।

গোবরা এক বিশালকায় কুকুর, এ পরিবারটির উপযুক্ত জীব। শুধু গোবরা নয়, গোবরগণেশ উহার নাম। খায় দায় ঘুমায়, চোর আসুক ডাকাত আসুক—কোন আপত্তি নাই তাহার, সে কাহাকেও কিছু বলে না।

ভুবন সরোষে বলিল, বলি, নৈবিদ্যি কি হ'ল?

—খেয়ে দিয়েছি। যে ক্ষিদে, বাবাঃ!

ভুবন আবার শুইয়া পড়িয়া কাতরাইতে লাগিল। ভালুক ভাতের হাঁড়িটা নামাইয়া ফেলিয়া বলিল, আজ আর ক্ষিদে বেশি নাই। নৈবিদ্যি খেয়ে ক্ষিদে প'ড়ে গেল।

ভুবন বলিল, আমি টাকা দোব, তু গরু কেন্ এক জোড়া, ভাগে চায—

ভালুক মধ্যপথেই ভুবনকে বাধা দিয়া বলিল, ধেৎ! টাকা টাকা ক'রেই মরবি তু। ছেলে নাই, পিলে নাই, দুটো পেট শুধু; বেশ তো চলছে।

ভুবন বলিল, হা রে মুখপোড়া গাঁদা মোষ, বলি—খেটে খেটে যে আমার গতর প'ড়ে গেল!

ভালুক হি-হি করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, তোর গতরের এক সরষেও কমেনি ভোবন। দাঁড়া, একখানা বড় আরশি এনে দোব তোকে। একটা টাকা দিস দেকিনি।

হাতের কাছেই পড়িয়া ছিল একটা শুকনা গাছের ডাল, ভুবন স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া সজোরে সেটাকে ছুঁড়িয়া মারিল। ভালুক কিন্তু ভুবনের মতলব পূর্বেই বুঝিয়াছিল, সে একটু পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। ডালটা বোঁ শব্দে ডাক ছাড়িয়া উঠানের পেয়ারাগাছে প্রতিহত হইল।

ভালুক হি-হি করিয়া হাসিতে হাসিতেই বলিল, ওইটো যদি লাগত ভোবন! শেষে তো তোকেই ত্যাল মালিশ করতে হ'ত।

ভুবন বলিল, ওই ছিরিতে আর দাঁত বার ক'রে হাসিস নে বাপু। আহা-হা।

ভালুক হা-হা করিয়া হাসিয়া ঘরখানা ভরাইয়া দিল।

ভুবনও না হাসিয়া পারিল না, সেও সলজ্জভাবে ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

কথাটা পুরাতন দিনের কথা।

ভালুকের নাম মতিলাল, জাতিতে সে হাড়ী। এ গ্রামের বাসিন্দা তাহারা নয়; এখান হইতে ক্রোশ পাঁচেক দূরে তাহার পৈতৃক বাস। এ গ্রামে তাহার মাতুলালয়, নিঃসন্তান মাতুলের ভিটায় সে ভুবনকে লইয়া বৎসর-খানেক আসিয়া বাস করিতেছে।

ভুবন কিন্তু এই গ্রামের মেয়ে। তাহাদের সামাজিক রীতি অনুযায়ী ভুবনের পাঁচ বৎসর বয়সের সময় প্রথম বিবাহ হয়। তখন তাহার ঠোঁটের পাশটা কাটা ছিল না। বৎসর দশেক বয়সের সময় গাছে গাছে 'ঝাল্লু' খেলিতে গিয়া ঠোঁট কাটিয়া দাঁত বাহির হইয়া গেল। তখন সে ছিল লম্বা, কিন্তু ছিপছিপে পাতলা। এগারো বৎসর বয়স হইতেই দেহে তার জোয়ার ধরিতে আরম্ভ হইল। তখন তাহার বয়স চৌদ্দ বৎসর। সেবার জামাইষষ্ঠীতে বাপ তাহার জামাই লইয়া আসিল। জামাইটি দেখিতে শুনিতে মন্দ নয়, সচরাচর নিম্নশ্রেণীর জোয়ান যেমন হইয়া থাকে তেমনই। শাশুড়ী জামাইকে পরমাদরে বসাইয়া পা ধুইতে এক ঘটি জল নামাইয়া দিল। ভুবনের বাপ গিয়াছিল মাছের সন্ধানে। মাও তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল তেলের বোতল হাতে,—ভুবনের চুলটা বাঁধিয়া দিতে হইবে। ছেলেটি পা না ধুইয়াই এদিক-ওদিক চাহিতেছিল ভুবনের সন্ধানে। ঠিক এই সময়টিতেই ভুবন আসিয়া বাড়ি ঢুকিল। কাঁখে এক প্রকাণ্ড বড় কলসী। গ্রাম হইতে মাইল-খানেক দূরে ঝরনার জল আনিতে গিয়াছিল সে।

বাড়ি ঢুকিয়াই সে স্বামীকে প্রশ্ন করিল, কে বটিস রে তু, কোথা বাড়ি?

বাপের ফিরিবার কথা ছিল সন্ধ্যায়, কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহারা দ্বিপ্রহরের পূর্বেই আসিয়া পড়িয়াছে। ভুবনের স্বামী অবাক হইয়া বিপুলকায়া ভুবনের কুৎসিত মুখের দিকে চাহিয়াছিল।

ভুবন আবার প্রশ্ন করিল, রা কারিস না কেনে রে ছোঁড়া, কোথা বাড়ি তোর?

তেলের বোতল হাতে মা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, মাথায় কাপড় দে হারামজাদী, জামাই রয়েছে।

দারুণ লজ্জায় সহাস্তে পুরু জিবটা এতখানি বাহির করিয়া ভুবন দুমদুম শব্দে দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। মাও তাহার পিছন পিছন ঘরে ঢুকিয়া বলিল, ব'স্, চুল বেঁধে দি তোর আগে। ও বাবা কানাই, হাত-মুখ ধোও বাবা, শ্বশুর তোমার আইচে ব'লে।

অল্প কিছুক্ষণ পর ভুবনের বাপ মাছ হাতে বাড়ি ঢুকিয়া বলিল, কই, কোথা গেলি গো? কানাই কোথা গেল?

শাশুড়ী বাহিরে আসিয়া বলিল, এই হেথাই তো—। কানাই, অ বাবা!

কেহ কোথাও ছিল না, জলের ঘটিটা পর্যন্ত তেমনই পূর্ণ অবস্থায় সেইখানে পড়িয়া আছে। ধুলা পায়েই কানাই পলাইয়াছে।

সে আর আসে নাই, আবার সে বিবাহ করিয়াছে।

তাহার পর কত সম্বন্ধ যে ভুবনের বাপ করিল তাহার হিসাব নাই। কিন্তু ভুবনকে দেখিয়া সকলেই একরূপ পলাইয়া গেল।

ভুবনকে দেখিলেই পাড়ার ছেলেরা ফিক করিয়া হাসিত। ভুবন সে ব্যঙ্গ-হাসির জ্বালায় জলিয়া উঠিত। একদিন সে ক্রোধে আপনার কপালে নোড়ার ঘা মারিয়া রক্তে মুখ ভাসাইয়া ফেলিল।

মামার অসুখের সংবাদ পাইয়া মতিলাল সেদিন এই গ্রামে আসিয়াছিল। তখন তাহার তিনটি বিবাহ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু গৃহ গৃহিণীশূন্য। গ্রামে ঢুকিবার পথেই ভুবনের সহিত তাহার দেখা হইয়া গেল। তাহার রূপের কারুকার্য দেখিয়া মতিলাল না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

ভুবন ঘৃণার সহিত বলিল, ওই ছিরিতে আর দাঁত বার ক'রে হাসিস নে বাপু। আহা-হা!

মতিলাল হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

তাহার কয়েক দিন পরই ভুবনের সহিত মতিলালের বিবাহ হইয়া গেল। মতিলাল ভুবনকে লইয়া ধুমধামের সহিত আপনার ভিটায় গিয়া সংসার পাতিয়া বসিল। প্রথম দিনই সন্ধ্যায় সে ভুবনকে ডাকিয়া বলিল, শোন্, একটা কথা বলি।

সে আসিয়া বলিল, কি?

—ব'স্, একটা জিনিস এনেছি, দেখ্। তোকে কেমন সোন্দর ক'রে দি, দেখ্।

মতিলাল খানিকটা খড়ির মত সাদা গুঁড়া জলে গুলিতে বসিল। ভুবন আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, উ কি ?

মতিলাল অহংকারভরে বলিল, যাত্রায় সব মুখে মাখে, দেখিস নাই ? কাল্লো কুচ্ছিতও এতে সোন্দর হয়—বলিয়া সে ভুবনকে রঙ মাখাইতে বসিল। তারপর আয়না মুখের সম্মুখে ধরিয়া বলিল, দেখ্।

ভুবন তাহার হাত হইতে আয়নাখানা টানিয়া লইয়া নিবিষ্ট চিত্তে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতে বসিল। তারপর সহসা আয়নাখানা রাখিয়া দিয়া বলিল, আয়, তোকে মাখিয়ে দি আমি।

গম্ভীরভাবে মতিলাল বলিল, উঁহু, তু পারবি না। ই সব ভাগ-মাপ শিখতে হয়। দে, আমি মাখি।—বলিয়া সে নিজেই রঙ মাখিতে বসিল।

ভুবন কিন্তু অভিমান করিল। সেটুকু আবিষ্কার করিয়া মতিলাল বলিল, তোকে শিখিয়ে দোব, তু এক দিন মাখিয়ে দিস।

ভুবন বলিল, তু কোথায় শিখেছিস, শুনি ?

মতিলাল হাসিয়া বলিল, যাত্রার দলে শিখেছি। তা ছাড়া আমি কত রকম সাজতে পারি ব'লে! দেখবি ?

সে তাহার একটা ঝাঁপি খুলিয়া বাহির করিল, বস্তার তৈয়ারী ভালুকের খোলস, পেত্নী সাজিবার ছেঁড়া কাঁথা, আরও কত কি!

তাহার পর ক্রমশ ভুবন আবিষ্কার করিল, মতিলালের ওই পেশা। খাটুনির নাম নাই, খায়-দায় ঘুমায়, যাত্রার দলের ভার বয়, তামাক সাজে, আর মাঝে মাঝে সঙ সাজিয়া বেড়ায়।

ভুবন কিন্তু দারুণ পরিশ্রমী মেয়ে, শরীরে শক্তিও তাহার বিপুল ; সে ধান ভানিয়া, ঘুঁটে দিয়া, ঘাস বেচিয়া স্বচ্ছন্দ আহারের প্রাচুর্যে বিপুলকায় মতিলালকে আরও স্ফীত এবং কুৎসিত করিয়া তুলিল, সঙ্গে সঙ্গে নিজেও তাহাই হইয়া উঠিল। মতিলালকে সে অহরহ তিরস্কার করে রোজগারের জন্য। মতিলালের সেই এক উত্তর—খাটতে গেলে গতরে লজর দেয় সব, উ হবে না। যাত্রার দলে এবার মাইনে হবে। আর ছেলেপিলে হোক, তখন না হয়—। ছেলে না হ'লে কি ঘর—! বলিয়া সে পুলকে হি-হি করিয়া হাসে।

ভুবন বলিল, হবে তো ছেলেপিলে।

মতিলালের মনে পুলক বাড়িয়া গেল, দাঁড়া, আজ মাদুলি এনে দোব তোকে।

মাদুলি সে আনিয়াও দিল, একটা নয়, একটা একটা করিয়া পাঁচ-ছয়টা মাদুলি ভুবনের বুকে এখন ঝোলে।

বেশ চলিতেছিল। কর্মপরায়ণা ভুবনের কর্মের মধ্যেই দিন কাটিয়া যাইত। সেদিন সহসা তাহার দৃষ্টিতে পড়িল, পুকুরের ধারে মতিলাল বসিয়া হি-হি করিয়া হাসিতেছে, আর যাত্রার দলের কয়েকটা ছেলে তাহাকে কাদা মাখাইতেছে। একজনের কথাও তাহার কানে আসিল, সে মতিলালকে বলিতেছিল, গাঙের পলি যদি মাখতে পারিস, তবে রঙ ফরসা হবে নিশ্চয়। এতেও হবে তবে ফিট্ গোরা হবে না।

সে কথার দিকে মতিলালের মন ছিল না; সে দূরের কতকগুলো ছোট ছেলের কথা শুনিয়া হাসিতেছিল।

তাহারা হাততালি দিয়া নাচিতেছিল আর সুর করিয়া গাহিতেছিল, আয় রে কালো মোষ, কাদা মাখবি ব'স্।

ভুবনের অঙ্গ জ্বলিয়া গেল। সে মতিলালকেই ডাকিল, ও মুখপোড়া, বলি শোন্।

মতিলাল হি-হি করিয়া হাসিতে হাসিতে উঠিয়া আসিল।

যাত্রার দলের একজন বলিল, মাধব তাঁতীর লীলেবতী।

ক্রোধে ভুবনের চোখে জল দেখা দিল, মতিলাল কিন্তু হাসিয়া বলিল, বলুক কেনে; তোরও যেমন!

ইহার পর ক্রমশ ভুবন আবিষ্কার করিল, এ কথা এ গ্রামের সকলেই বলে, কর্মের ব্যস্ততার মধ্যে ভুবন এতদিন শুনে নাই, বা শুনিতে পায় নাই। ভুবন জেদ করিয়া বসিল, এখানে সে থাকিবে না। মতিলাল বলিল, মামার ভিটে তো মোটে এইটুকুন ছোট ঘর, ছেলেপিলে হ'লে কুলোবে কেনে?

ভুবন বলিল, ঘর ক'রে লিবি, অত বড় হাঁদা মুনিষ।

প্রবল আপত্তি করিয়া মতিলাল বলিল, উহু, সি আমি পারব না। বাবা, ঘর তোলা কি সোজা কথা!

ভুবন তবু মানিল না, সে বলিল, ঘরের খরচ আমি দোব। আর বাবা আছে, দাদা আছে—

বাধ্য হইয়া বৎসর-খানেক পূর্বে মতিলাল মাতুলালয়ে আসিয়া বাস আরম্ভ করিল। ভুবনের চেষ্টায় ও অর্থে ঘর হইয়াছে। মতিলাল এখানকার পাঁচালির দলে এখন তামাক সাজে। দত্ত-কাকার দরবারে নিয়মিত হাজিরা দেয়, দত্ত-কাকা তাহাকে কলিকাতার যাত্রার দলে চাকরি করিয়া দিবেন। ভুবন যেমন খাটিত, তেমনই খাটে। তাহার পরিশ্রমে এখানেও স্বচ্ছন্দ সংসার, কোন অভাব নাই। বলিতে ভুলিয়াছি, এখন ঘরের কাজ, ভাত রাঁধা, জল তোলা এগুলি মতিলালকেই করিতে হয়। বাড়িতে পা দিলেই ভুবনের শরীরের অসুখ দেখা দেয়।

ওই চৈত্র-সংক্রান্তির দিনই।

মতিলাল রান্নাবান্না শেষ করিয়া স্নান করিয়া আসিল। দুইখানা গামলায় হাঁড়ির ভাত ঢালিয়া ডাকিল, ভোবন, ওঠ্।

ভুবন উঠিয়া বসিল। মতিলালের গামলার দিকে চাহিয়া বলিল, এই যে বললি, ক্ষিদে নাই আজ! চারটি ভিজিয়ে রাখলে কালকের মুড়ি আসান হ'ত।

থাবা ভরিয়া গ্রাস তুলিতে তুলিতে মতিলাল বলিল, আবার লেগেছে ক্ষিদে।

ভুবন বলিল, তোর ওই কুকুরের ভাত আমার হেনসেল থেকে দোব না আজ তোর ভাত থেকে তু দে। নইলে নৈবিদ্যি আন্।

মতিলাল হি-হি করিয়া হাসিয়া বলিল, দেখবি, রেতে চেঁচাবে খিদেতে, ঘুম হবে না তোর।

ভুবন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চোখের দৃষ্টিতে যেন অগ্নিবর্ষণ করিয়া বলিল, নেতার মেরে দোব তাহ'লে আজ ওর।

মতিলাল সকাতর কণ্ঠে বলিল, আহা-হা ভোবন কেষ্টের জীব! আর জানিস, তোর যখন ছেলে হবে, তখন দেখবি কত কাজ করে গোবরা!

ভুবন উষ্মাভরেই কহিল, কি, করবে কি শুনি?

—এই—ছেলে শুয়ে থাকবে, গোবরা পাহারা দেবে, কাক তাড়াবে।

সত্য, গোবরগণেশের ওই গুণটি আছে, বাড়িতে কাক নামিতে দেয় না। ভুবন শুধু বলিল, হুঁ।

মতিলালের দৃষ্টিতে পড়িল, পার্বতী ও মদন দুয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া উকিঝুঁকি

মারিতেছে! সে গাল ভরিয়া হাসিয়া বলিল, এই দেখ্ ভোবন, এই ছেলেটার কথা বলেছেলাম।

পার্বতী মদনকে বলিতেছিল, ওই দেখ্।

ভুবন মুখ ফিরাইয়া তাহাদের দেখিয়া বলিল, এসো খোকাবাবুরা, প্যায়রা আছে দোব, ব'স।

ওরে বাবা রে, ধরবে ভাই!—বলিয়া মদন ছুটিয়া পলাইল।

পার্বতী তখনও দাঁড়াইয়া ছিল। মতিলাল বলিল, প্যায়রা খাবে এসো খোকাবাবু। যাবার সময় আমি হাতি সেজে পিঠে ক'রে দিয়ে আসব তোমাকে, —বলিয়াই সে মাটিতে হাত পাড়িয়া চতুষ্পদ সাজিয়া পার্বতীকে দেখাইল।

মদন পিছন হইতে ডাকিল, পালিয়ে আয় রে, ধরবে। পার্বতী আর থাকিতে সাহস করিল না, পলাইল।

পরদিন কিন্তু সকালেই তাহারা আসিয়া হাজির। ঢেঁকিশালে ভুবন দুমদুম শব্দে ধান ভানিতেছিল। মতিলাল দাওয়ায় বসিয়া মুড়ি খাইতেছিল।

দুয়ারের গোড়ায় দাঁড়াইয়া পার্বতী বলিল, ভালুক, প্যায়রা দিবি?

মুখে একমুখ মুড়িসুদ্ধই মতিলাল দাঁত বাহির করিয়া বলিল, এসো এসো, খোকাবাবু এসো।

মদন বলিল, ওখান থেকে ছুঁড়ে দে। তুই ভূত? সে রাক্ষুসী কই, সেই দাঁত বার ক'রে?—বলিয়াই সে দাঁত বাহির করিয়া দেখাইয়া দিল।

মতিলাল হা-হা করিয়া হাসিয়াই সারা হইল।

—কে রে, খালভরা ছেলে!—ভুবন ঢেঁকিশাল হইতে বাহির হইয়া আসিল।

পার্বতী ও মদন ছুটিয়া পলাইল। ভুবন আপন মনেই বকিতেছিল, ভদ্দনোকের ছেলে, ভদ্দনোক সব, বাক্যি দেখ দেখি! ভূত, রাক্ষুসী! অঃ!

মতিলাল তখন সবলে পেয়ারা গাছটাকে নাড়া দিতেছিল। সে হি-হি করিয়া হাসিয়া বলিল, তুও যেমন ভোবন, বলুক কেনে!

ভুবন ঝংকার দিয়া বলিল, না, বলবে কেনে, কিসের লেগে? ছেলের কথা দেখ, দিকিনি!

গ্রামের ধারে দাঁড়াইয়া মদন তখন পার্বতীকে বলিতেছিল, না, যাসনি ভাই, শুনিস নি রাক্ষুসীর গল্প? ওরা ঠিক ভূত আর রাক্ষুসী—মানুষ সেজে আছে।

খোকাবাবু, ও খোকাবাবু, প্যায়রা নিয়ে যাও।—আঁচলে করিয়া পেয়ারা লইয়া মতিলাল হাসিতে হাসিতে তাহাদের ডাকিতেছিল।

মদন বলিল, ওইখানে ঢেলে দে। তুই স'রে যা।

মতিলাল হাসিয়া পেয়ারাগুলি ঢালিয়া দিয়া সরিয়া গেল।

পেয়ারাগুলি তুলিয়া লইয়া পার্বতী বলিল, ভালুক হয়ে যা দেখি, সেই কালকের মত।

মতিলাল হি হি করিয়া হাসিয়া বলিল, দাঁড়াও তোমরা, আসছি আমি।

কয়েক মিনিট পরেই ঘোঁৎ-ঘোঁৎ শব্দ শুনিয়া পেয়ারা খাইতে ব্যস্ত মদন ও পার্বতী দেখিল, ভালুক আসিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মদন প্রচণ্ড বেগে ছুটিল। পার্বতীও তাহার অনুসরণ করিল। ভালুক উঠিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল, অ খোকাবাবু!

ছেলে দুইটির সঙ্গে মতিলালের একটু আত্মীয়তা হইল, কিন্তু সে আত্মীয়তা নিবিড় হইল না। তাহারা পেয়ারার জন্য রোজ আসে, কিন্তু মতিলালকে ধরা দিল না।

মতিলাল হাসিমুখে ডাকে, তাহারা খানিকটা সরিয়া গিয়া বলে, না।

মতিলাল তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করে, কত সাজতে পারি আমি, তোমাদিগে দেখাব।

মদন বলে, ছাই; বস্তা গায়ে দিয়ে! ভালুকের রোঁয়া নেই, যাঃ!

পার্বতী বলে, ভূত সাজতে পার?

হাসিতে হাসিতে মতিলাল বলে, হুঁ। দুধ খাও তো, না খেলে আমি ভূত সেজে ধরব।

—কই, সাজ দেখি ভূত।

—সেই ধরমপূজোর সময়।—আর দেরি নাই।

—বাঘ সাজতে পার?

—হুঁ।

—সব সাজতে পার তুমি?

—হুঁ।

ভীত অথচ মুগ্ধ-বিস্ময়ে ছেলে দুইটি মতিলালের দিকে চাহিয়া থাকে।

মতিলাল ডাকে, শোনো শোনো, একটা কথা বলি। সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেই আগাইয়া আসে। ছেলে দুইটি সভয়ে ছুটিয়া পলাইয়া যায়।

ভুবন বলে, তোর যেমন আদিখ্যেতা! উ কি তোর স্বভাব?

মতিলাল হি-হি করিয়া হাসিয়া বলে, ওরা ভয় করে; আমার ভারি ভাল লাগে ভোবন। আমি আবার বলি কি জানিস, দুধ খাও তো, না খেলে আমি ধরব! একদিন পেত্নী সাজব, দাঁড়া।

ভুবন বলিল, ভূত তো সেজেই আছিস, আর পেত্নী সাজতে হবে না বাপু, থাম্।

মতিলালের হাসি আর থামিতে চায় না।

রাঢ় দেশ। বৈশাখ মাসে বুদ্ধ-পূর্ণিমায় ধর্মরাজের পূজা, নিম্নজাতির এক বিরাট উৎসব। মতিলাল গ্রামে—মহুগ্রামে ধর্মরাজের পূজার উৎসবে প্রচুর ধূমধাম হয়। মহুগ্রামের ধর্মদেবতা নাকি ভারি জাগ্রত। চার-পাঁচখানা গ্রামের নিম্নজাতির সকলেই এই ধর্মরাজের পূজা-অর্চনা করে। এবার উৎসবের আড়ম্বর খুব বেশী। পাশের বর্ধিষ্ণু গ্রামে স্বর্ণকাররা পাল্লা দিয়া নাকি উৎসব করিবে। এবার ঢাক আসিল ত্রিশটা। মহুগ্রামে বরাদ্দ হইয়াছে পঁয়ত্রিশটা। সংবাদটা কিন্তু গোপন রাখা হইয়াছে। ও গ্রামের ভক্তের সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ, পঞ্চাশ পূর্ণ করিবার জন্য খুব চেষ্টা হইতেছে। মহুগ্রামের ভক্তের সংখ্যা ষাট ছাড়াইয়া গিয়াছে।

চুলওয়ালা দত্ত-খুড়োর সঙ্গে মতিলাল মহা উৎসাহে তদ্বির-তদারক করিতেছিল। দত্ত-খুড়ো বলিল, তুইও একজন ভক্ত হ'লি না কেন মতিলাল?

মতিলাল হি-হি করিয়া হাসিয়া বলিল, উপোস করতে লারব খুড়োমশায়। উ হবে না।

দত্ত-খুড়ো হাসিয়া বলিলেন, পেটটি না ভরলে মতিলালের আমার চলবে না, না কি বল্ মতিলাল?

মতিলাল হাসিয়া বলিল, ভোবন কি বললে জানো? বললে, প্যাটে ছুরি মার্ তু।

দত্ত বলিল, তা বেশ! তোকে কিন্তু ইদিকের কাজ ডাক-হাঁক সব করতে হবে। বোলানের দল সব আনতে হবে। আর, সঙ এবার কিন্তু খুব আচ্ছা বঁঢ়িয়া রকমের হওয়া চাই।

মতিলাল একমুখ হাসিয়া বলিল, পাঁচ জুতো খাব উ গাঁকে হারাতে না পারি তো।

সার্ধ দুই সহস্র বৎসরেরও পূর্বে যে তিথিতে অর্ধ-জগতের ধর্মগুরু মহামানব বুদ্ধ সুজাতার পায়সান্ন গ্রহণ করিয়া স্নানান্তে মরণ-পণে তপস্যায় বসিয়াছিলেন, সেই পূর্ণিমার ঠিক প্রথম লগ্নে উৎসবের প্রারম্ভ। সেই দিন হয়—মুক্তিস্নান।

দলে দলে ভক্তরা 'মুক্তচান' করিয়া উত্তরী পরিতেছিল। ঢাকের বাজনায় সচকিত পাখির দল কলরব করিয়া আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছিল, কোন স্থানে বসিতে তাহাদের সাহসই ছিল না। হনুমানের দলও দ্রুতবেগে বিপুল শব্দ করিয়া গ্রাম ছাড়িয়া পলাইতেছিল।

মতিলাল আপনার সঙের পোশাকের থলি বাহির করিয়া বসিয়াছিল, দুই টুকরা সোলাকে সে ধারালো ছুরি দিয়া চাঁচিতেছিল।

ভুবন বলিল, আ মরণ তোর, দেশের লোক গেল মুক্তচান দেখতে, আর পেটুক রাক্ষসের কাজ দেখো!

সাদা সোলা দুই টুকরা দুই গালে দুই দিকে পুরিয়া মতিলাল হাত বাড়াইয়া ছুটিয়া আসিল, ধ'রব, খাব তোঁকে।

ভুবনও দুই পা সরিয়া গিয়া বলিল, এই দেখ্, ভাল হবে না বলছি।

মতিলাল হি-হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

ভুবন বলিল, দেখ্ দেখি, মানুষকে ভয় লাগিয়ে দেয়। খোল্ বাপু, তোর দাঁত খোল্।

মতিলাল পরম পরিতুষ্ট হইয়া প্রশ্ন করিল, তোরও ভয় লাগল ভোবন?

ভুবন বলিল, হ্যাঁ, ভয় লাগতে আমার দায়! কিন্তু তু যে বললি, ধম্মরাজের মাদুলি এনে দিবি?

ট্যাঁক হইতে খুলিয়া মাদুলি বাহির করিয়া দিয়া মতিলাল বলিল, একটো পাঁঠা কিনে রাখতে হ'বে আবার। ছেলে হ'লে পাঁঠা লাগবে—দেবাংশী বলেছে।

পরদিন পূর্ণিমার অবসান-সময়ে ব্রতের উদ্‌যাপন। ঢাক শিঙা কাঁসি কাঁসর

ঘণ্টা শঙ্খ বাজাইয়া শোভাযাত্রা বাহির হইল। প্রথমেই একদল ঢাক ও বাদ্যভাণ্ড, তাহার পরেই শ্রেণীবদ্ধভাবে বারো-চৌদ্দ সারি ভক্তের দল ভাঁড়াল মাথায় করিয়া চলিয়াছে। ভাঁড়াল এক-একটি জলপূর্ণ মঙ্গল-কলস, কলসগুলির গলায় ফুলের মালা; ভক্তের দলেরও প্রত্যেকের গলায় মোটা মোটা কল্কে আউচ ও গুলঞ্চ ফুলের মালা। ভক্তদলের চারিপাশে সারি সারি ধূপদানি হইতে ধূপের ধোঁয়া উঠিতেছে। তাহারা ঢাকের বাজনার তালে তালে ভক্ত-নাচ নাচিয়া চলিয়াছে। আবার পিছনে একদল ঢাক। তাহার পিছনে দশখানা গ্রামের নিম্নশ্রেণীর নর-নারী কাতারে কাতারে চলিয়াছে।

মহুগ্রামের ভাঁড়াল আসিয়া বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামখানায় প্রবেশ করিল। মহুগ্রাম এই গ্রামের বাবুদেরই জমিদারি. চিরকাল ভাঁড়াল এ গ্রামে আসে। রাস্তার দুই পাশের ঘরের দাওয়া ভদ্র নরনারীতে পরিপূর্ণ। ভাঁড়ালের দলের ভক্তদের সঙ্গে তালে তালে তাহাদেরই মত নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে কত ছেলে। তাহার মধ্যে অগ্রবর্তী পার্বতী ও মদন।

আপনাদের দাওয়া হইতে পার্বতীর মা ডাকিল, ওরে, ও হতভাগা, উঠে আয়। এই বোশেখ মাসের দুপুর-রোদ—উঠে আয়।

পার্বতী নাচিতে নাচিতেই মাকে এক ভেংচি কাটিয়া দিল।

সমস্ত দলের পিছনে একখানা ঢাকের বাদ্যধ্বনি অকস্মাৎ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে এক ভয়ার্ত কলরব। পিছনের দিক হইতে ভিড় ভাঙ্গিয়া চতুর্দিকে সব ছুটিয়া পলাইতেছিল। বামনবুড়ী গুল্পী মাত্র হাত দুই লম্বা, সে পলাইতে না পারিয়া একটা বাড়ির দেওয়ালে মুখ গুঁজিয়া মুদিত চোখে কাঠের মত লাগিয়া গেল।

ভয়েরই কথা। ঢাকের সম্মুখে তালে তালে নাচিতে নাচিতে আসিতেছিল—বিকট এক মূর্তি! মাথায় এক আঁটি খড়ে কালো রঙ মাখাইয়া পরচুলা পরিয়াছে, বিকটাকার মুখে দুই গালের পাশে গজদন্তের মত দুই দাঁত, রাজ্যের ছেঁড়া কাঁথা পরনে, জানু পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে দুই স্তন, সর্বোপরি ভয়াল তাহার দুই হাত—প্রত্যেকটি চার-পাঁচ হাত করিয়া লম্বা, এক হাতে এক ঝাঁটা।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভক্তদল ও বাদ্যভাণ্ড ছাড়া রাস্তা পরিষ্কার হইয়া গেল। মদন যে কোথায় পলাইল, তাহার সন্ধান পার্বতী পাইল না। সে ছুটিয়া আসিয়া লুকাইল মায়ের পিছনে।

মাও ভয় পাইয়াছিল, তবু সে বলিল, যাবি, যাবি আর? ডাকব ঝাঁটাবুড়ীকে? শোন্ শোন্, ও ঝাঁটাবুড়ী!

ঝাঁটাবুড়ী ঘুরিয়া দাঁড়াইল। পার্বতীকে ঠেলিয়া সম্মুখে আনিয়া মা বলিল, এই দেখ, রাস্তায় পেলেই ধরবি একে।

ঝাঁটাবুড়ী পরমানন্দে নানা অঙ্গভঙ্গী সহকারে বিচিত্র নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল সেইখানে।

হারুবাবুর মা খপ্ করিয়া পার্বতীর চোখ ও কপাল আবৃত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, পালাও, তুমি পালাও।

নাচিতে নাচিতে ঝাঁটাবুড়ী চলিয়া গেল।

হারুবাবুর মা তখন বলিতেছিলেন, জল—জল—পাখা—পাখা।

মতিলাল বাঁড়ুজ্জে বাড়িতে বকশিশ পাইল দুই টাকা। বাবু ভারী খুশি হইয়াছিলেন। তিনি নিজে ভয়ে বু-বু করিয়া উঠিয়াছিলেন।

বাড়িতে সে তখন পোশাক ছাড়িতেছে, দত্ত-খুড়ো বাড়ি পর্যন্ত আসিয়া তারিফ করিয়া বলিলেন, খুব ভাল হয়েছে মতিলাল।

সবিনয়ে মতিলাল হি-হি করিয়া হাসিল শুধু।

দত্ত বলিল, বামন গুল্‌পী বুড়ী থাকতে থাকতে ধপাস ক'রে প'ড়ে গেল। মুখুজ্জেদের পার্বতীর চেতন করাতে তো ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল। আর বাঁড়ুজ্জে-কত্তা তো—

চমকিয়া উঠিয়া মতিলাল প্রশ্ন করিল, পার্বতীর চেতন হইছে?

দত্ত বলিলেন, হ্যাঁ, তবে একটু বেগ পেতে হয়েছিল। ওর মায়ের যেমন—

পোশাক-পরিচ্ছদ সব পড়িয়া রহিল, মতিলাল ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আবার তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া পেয়ারার গাছ ঝরাইয়া এক কোঁচড় পেয়ারা লইয়া সে বাহির হইয়া গেল। আবার কিছুক্ষণ পরে সে ফিরিয়া আসিয়া কতকগুলো কি লইয়া চলিয়া গেল।

পার্বতী শুইয়াছিল, তাহার মা শিয়রে বসিয়া বাতাস করিতেছিল। বাপ ফুলু মুখুজ্জে ক্রমাগত আপন মনে তিরস্কার করিতেছিল পত্নীকে, হুঁ, আক্কেল দেখ দেখি, হুঁঃ!

বাহির হইতে কে ডাকিল, বাবু!

কে ?—ফুলু মুখুজ্জে বাহিরে আসিয়া আঁতকাইয়া ছুটিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

বাহির হইতে সাড়া আসিল, আজ্ঞে ভয় নাই, আমি মতিলাল। খোকাবাবুকে ডেকে দেন, ভালুক সেজে এসেছি আমি, ভালুক দেখলে তার ভয় ভেঙে যাবে।

দরজা খুলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মতিলালের মাথায় পড়িল এক লাঠি। লাঠি মারিয়া মুখুজ্জে বলিল, বেরো শালা, বেরো।

এক লাঠিতে মতিলালের কিছু হইবার কথা নয়, হয়ও নাই; খানিকটা মাথার চামড়া কাটিয়া গিয়াছিল শুধু। পরদিন সে দত্ত-খুড়োর বাড়িতে বসিয়া প্রশ্ন করিতেছিল, না খেলে শরীর বাঁজবে, কাকামাশায়? আর রঙ ফরসা হয় কি সাবানে, বলেন দেখি?

বেণী ডোম—চৌকিদার আসিয়া তাহাকে ডাকিল, তোকে ডাকছে মতিলাল, পেসিডেনবাবু।

—কেন?—মতিলাল অবাক হইয়া প্রশ্ন করিল।

বেণী বলিল, কাল তোকে লাঠি মারে নাই ফুলু মুখুজ্জে? তাই নালিশ-টালিশ করতে বলবে তোকে হয়তো।

মতিলাল হাসিয়া বলিল, উ আমার লাগে নাই বেনোজেঠা। নালিশ আবার করে নেকি—ওই নিয়ে?

—তা ব'লে আয় গিয়ে বাপু।

মতিলাল উঠিল। পথে ছেলের পাল সভয়-কৌতুকে দূরে দাঁড়াইয়া বলিতে-ছিল, ঝাঁটাবুড়ী, ও ঝাঁটাবুড়ী!

মতিলাল হি-হি করিয়া হাসিতেছিল।

পথে নারাণবাবুর বাড়ির ভিতর কে বলিতেছিল, দুধ খাও খুকু, ডাকব ঝাঁটাবুড়ীকে?

মতিলাল বিনা দ্বিধায় বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া একমুখ দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, দুধ খাও খোকাবাবু।

ছেলেটা ভয়ে বিবর্ণ হইয়া উঠিল। মা ছেলেকে লইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া বলিল, বেরিয়ে যাও তুমি, বেরিয়ে যাও।

মতিলাল বাহির হইয়া আসিতেই বেণী জিজ্ঞাসা করিল, কি, হ'ল কি তোর মতিলাল, অ্যাঁ? মতিলাল—মতে!

মতিলাল বাড়ি ফিরিল প্রহারজর্জরিত দেহে।

ভুবনের চোখে আজ জল দেখা দিল, সে তাড়াতাড়ি তেলের বাটি লইয়া বসিয়া বলিল, কি হ'ল, কে মেলে?

মতিলাল ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া বলিল, ছোট ছেলে আমাকে দেখে প্যাঙাস-পারা হয়ে গেল ভোবন!

ভুবন প্রশ্ন করিল, কে, মেলে কে তোকে?

—পেসিডেনবাবুর চাপরাসী; গাঁ ঢুকতে বারণ হয়ে গেল, ছোট ছেলেতে ভয় পাবে আমাকে।—কণ্ঠস্বর তাহার রুদ্ধ হইয়া গেল।

ভুবন চকিত হইয়া বলিল, ও কি, মাদুলি ধ'রে টানছিস্ কেনে, ওই?

পট করিয়া মাদুলির সুতা ছিঁড়িয়া লইয়া মতিলাল বলিল, আমাদের ছেলে আমাদেরই মত কুচ্ছিৎ হবে তো ভোবন! কাজ নাই।

প্রতিমা

ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি সময়। আকাশে মেঘে বর্ষার সে ঘনঘোর রূপ আর নাই। মেঘের রঙ ফিরিতে আরম্ভ হইয়াছে, রৌদ্রের রঙেও পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। গত বৎসরের অনাবৃষ্টি ও অজন্মার পর এবার বর্ষা হইয়াছে ভাল, মাঠে ধানের রঙ কস্‌কসে কালো, আর ঝাড়ে গোছেও সুন্দর পরিপুষ্ট। দেশে একটা প্রশান্ত ভাব। গৃহস্থ-বাড়িতে পূজার কাজ পড়িয়া গিয়াছে, মাটির গোলা গুলিয়া ঘর নিকানোর কাজটাই প্রথমে আরম্ভ হইয়াছে, ওইটাই হইল মোটা কাজ এবং হাঙ্গামার কাজ। তাহার পর খড়ি ও গিরিমাটি দিয়া দুয়ারের মাথায় আলপনা দেওয়া আছে, খই মুড়ি ভাজা আছে, মুড়কি নাড়ুর ভিয়ান আছে। পূজার কাজের কি অন্ত আছে!

চাটুজ্জে-বাড়ির গিন্নী বলেন, মা, ও মেয়ের হ'ল দশ হাত, তারপর সঙ্গে আছে মেয়ে ছেলে সাঙ্গোপাঙ্গ, আমরা দু'হাতে উয্যুগ ক'রে কি কুলিয়ে উঠতে পারি?

আজ চাটুজ্জে-বাড়িতে প্রথম মাটির 'ছোঁপ' পড়িবে। চণ্ডীমণ্ডপে কারিগর আসিয়া গিয়াছে, প্রতিমাতে আজ প্রথম মাটি পড়িবে।

বালতিতে করিয়া রাঙা মাটি গোলা হইয়াছে। বাড়ির বউ এবং ঝিউড়ি মেয়েরা গাছকোমর বাঁধিয়া হাতে সোনার অলংকারের উপর ন্যাকড়া জড়াইয়া বসিয়া আছে, প্রতিমাতে মাটি পড়িলে হয়!

গিন্নী বলিলেন, ওরে, যা ত কেউ, দেখে আয় ত দেরি কত? ছেলেগুলো সব গেল কোথায়?

একটি মেয়ে বলিল, সব গিয়ে ঠাকুর-বাড়িতে ব'সে আছে।

সত্যই, সব ছেলে তখন চণ্ডীমণ্ডপে ভিড় জমাইয়া বসিয়াছিল। বুড়া মিস্ত্রী কুমারীশ তখন লম্ফঝম্ফ করিয়া চৌকিদারের সঙ্গে বকাবকি করিতেছিল, বলি, তোর বিত্তিগুলো আমাকে দিবি? তোর কাজ আমি করব কেন শুনি?

চৌকিদার কালাচাঁদ বলিল, ওই দেখো, আগ করো কেন গো? উ মাটি আনতে গেলে কেউ দেয় নাকি? বলে, গাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দেবে না?

—বলি, রাত্তিরে হাঁক দিতে বেরিয়ে লুকিয়ে খানিকটে আনতে পার নাই ? না, হাঁকই দাও না রাত্তিরে ?

—ওই দেখো, কি বলে দেখো, হাঁক না দিলে হয় ? একবার ক'রে ত বেরুতেই হয়। তা তুমি যে আজ আসবে, তা কি ক'রে জানব বলো ? ভুল হয়ে গেইছে।

চাটুজ্জে-গিন্নী বাহিরের দরজায় দাঁড়াইয়া বলিলেন, অ কুমারীশ, বলি, হ'ল তোমার ? মেয়েরা যে গোলা গুলে ব'সে আছে গো ! আর বকাবকি—

শীর্ণ খর্বাকৃতি মানুষ কুমারীশ, হাত-পাগুলি পুতুল নাচের পুতুলের মত সরু এবং তেমনই দ্রুত ক্ষিপ্র ভঙ্গীতে নড়ে। আর চলেও সে তেমনই খরগতিতে। কুমারীশ, গিন্নীমায়ের কথা শেষ হইবার পূর্বেই, তারস্বরে চিৎকার করিয়া আরম্ভ করিল, আর বলেন কেন মা, কালাচাঁদকে নিয়ে আমি আর কাজ করতে পারব না, কোন উয্যুগ নাই, মাথা নাই, মুণ্ডু নাই, হাত নাই, পা নাই—আমি আর কি করব বলুন ?

বলিতে বলিতেই সে গিন্নীমায়ের নিকটে আসিয়া গড় হইয়া একটি প্রণাম করিয়া একেবারে প্রশান্ত কণ্ঠস্বরে বলিল, তারপরে ভাল আছেন মা ? ছেলে-পিলেরা সব ভাল ? বাবুরা সব ভাল আছেন ? দিদিরা, বৌমারা, সব ভাল আছেন ?

গিন্নীমা হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, সব ভাল আছে। তোমার বাড়ির সব ছেলেপিলে—

কথা কাড়িয়া বলা কুমারীশের অভ্যাস, সে আক্ষেপপূর্ণ কণ্ঠে আরম্ভ করিল, আর বলেন কেন মা, হাম, পেটের অসুখ, জ্বর—সব 'পইলট্ট' খেলছে মা। ডাক্তার-বদ্যিতে ফকির ক'রে দিলে।

তারপর আবার অত্যন্ত প্রশান্তভাবে সে বলিল, শুনলাম, ছোটবাবু এসেছেন ফিরে—বড় আনন্দ হ'ল। তা এইবার বউমাকে নিয়ে আসুন, সব ঠিক হয়ে যাবে। ছেলেমানুষ, বুদ্ধির দোষে একটা—তা সব ঠিক হয়ে যাবে।

গিন্নীমা সমস্ত প্রসঙ্গটা চাপা দিয়া বলিলেন, তোমার আর দেরি কিসের শুনি ? বউরা মেয়েরা গোলা দিয়ে চান করবেই বা কখন, খাবেই বা কখন ?

কুমারীশ বলিল, আর দেরি কি ! সব ঠিক হয়ে গিয়েছে, কেবল এই বেশ্বের আগুনের মাটি লাগে কিনা, তাই—

সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর তাহার পঞ্চমে উঠিয়া গেল, তাই শুধুন কেন ওই বেটা বাউড়ীকে যে, মাটি কই? বাবু ভুলে গিয়েছেন। এ আমি কি করি বলুন দেখি, যাই, আমি আবার দেখে নিয়ে আসি। হুঁঃ, উয্যুগ নাই, আয়োজন নাই, আমারই হয়েছে এক মরণ।—বলিয়া সে অত্যন্ত দ্রুতবেগে এবং অনুরূপ দ্রুতকণ্ঠে বকিতে বকিতে ওই মাটির সন্ধানে পথ ধরিল।—আমারই হয়েছে এক দায়, যাই, এখন কোথা পাই বেশ্যের বাড়ি, দেখি। হারামজাদা বাউড়ী বলে, গাল দেবে! আরে, গাল দেবে কেন? কই, আমাকে গাল দেয় না কেন? যত সব—! দক্ষিণে ত সেই মামুলী বারো টাকা, বারো টাকায় কি মাথা কিনে নিয়েছে আমার? পারব না, জবাব দিয়ে দেব। অঃ, খাতির কিসের রে বাপু?

গণ্ডগ্রাম হইলেও পল্লীগ্রাম, এখানে শহর বাজারের মত প্রকাশ্যভাবে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া কোন রূপোপজীবিনী বাস করে না, তবে নিম্নশ্রেণীর জাতির মধ্যে কলঙ্কিনীর অভাব নাই। গ্রামের পূর্ব-উত্তর কোণাংশে ডোমপল্লী,—এই ডোমেদের পুরুষেরা করে চুরি, মেয়েরা করে দেহ লইয়া বেসাতি। মা-বাপ লইয়া সংসারের গৃহাচ্ছাদনের আবরণ দিয়া প্রকাশ্যেই তাহারা সব করিয়া থাকে। কুমারীশ এই ডোমপল্লীতে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, বলি, কই গো সব, দিদিরা সব কই, গেলি কোথা গো সব?

অদূরে একটা গাছতলায় চার-পাঁচটি মেয়ে জটলা করিয়া বসিয়া হি-হি করিয়া হাসিয়া এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছিল। কুমারীশের কণ্ঠস্বরে, ধ্বনিতে সকলে চকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল।

একজন বলিয়া উঠিল, ওলো, সেই পোড়ারমুখো আইচে লো, সেই মিস্ত্রী, মাটি নিতে আইচে মুখপোড়া—বলিতে বলিতে সে হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে অপর সকলকেও উচ্ছ্বসিত কৌতুকে হাসিয়া একটা মস্ত কলরোল তুলিয়া দিল।

—এই যে, এই যে সব ব'সে রয়েছিস। তারপর সব ভাল আছিস তো দিদিরা? বও নিয়ে আসিস্, যাস্ সব, যাস্। এবার ভাদু কেমন গ'ড়ে দিয়েছিলাম, তা বল্?

কুমারীশ এক মুঠা মাটি সংগ্রহ করিয়া লইয়াই তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

একটা মেয়ে কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া বলিয়া উঠিল, মাটি নিতে আইচ বুঝি তুমি? কেনে, কেনে তুমি লিবে, শুনি?

—লে লে, কেড়ে লে মুখপোড়ার হাত হ'তে। লে, কেড়ে লে।

কুমারীশ একরূপ ছুটিয়াই পথে নামিয়া অত্যন্ত খরবেগে চলিতে আরম্ভ করিয়া বলিল, প্রতিমে হবে দিদি, প্রতিমে হবে। যেও, যেও সব, রঙ দেব, তুলি দেব, যেও সব, পদ্ম আঁকবে দোরে।

মেয়েরা আবার হাসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল।

একজন বলিল, ধর্ ধর্ বুড়োকে ধর্।

একজন বলিল, সবাইকে রঙ দিতে হবে কিন্তুক।

কুমারীশ চলিতে চলিতেই ঘন ঘন ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই রঙ দেবার সময়, সেই—

সে একটা বাঁকের মুখে অদৃশ্য হইয়া গেল।

চাটুজ্জে-বাড়িতে মেয়েরা হুলুধ্বনি দিয়া গোলা দেওয়া আরম্ভ করিল। মেয়েদের মধ্যে সে এক আনন্দের খেলা। গোলা দেওয়ার নাম করিয়া এ উহাকে কাদা মাখাইবে, নিজেও ইচ্ছা করিয়া মাখিবে। বেলা দুই প্রহর, আড়াই প্রহর পর্যন্ত কাদা-মাখামাখি করিয়া ঘাটে গিয়া মাথা ঘষিয়া জল তোলপাড় করিয়া তবে ফিরিবে। সমস্ত বৎসরের মধ্যে তাহাদের এ একটা পরম প্রত্যাশিত উৎসব।

বাড়ির বড়মেয়ে একটা টুলের উপর দাঁড়াইয়া গোলার প্রথম ছোপটা দেওয়ালে টানিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে মেজোমেয়ে বড়-ভ্রাতৃজায়ার গায় কাদা ছিটাইয়া দিয়া বলিল, তোমার মুখে গোলা দিয়ে নিকুতে হবে আগে—তুমি বাড়ির বড়বউ।

বড়বউ কিন্তু প্রতিশোধে মেজো-ননদের গায়ে কাদা দিল না; সে বড়-ননদের গায়ে গোলা ছিটাইয়া দিয়া বলিল, তারপর বাড়ির বড়মেয়ে!

বড়মেয়ে হাতের কাদা-গোলা ন্যাকড়ার ন্যাতাটা থপ্ করিয়া মেজো-বউয়ের মুখের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল, তারপর আমাদের মেজো-গিন্নী!

মেজোবউ টুলের উপর বড়-ননদের দিকে মুখ করিয়া মুখখানি বেশ উঁচু করিয়াই ছিল, ন্যাকড়ার ন্যাতাটা থপ্ করিয়া আসিয়া তাহার মুখের উপর যেন সাঁটিয়া বসিয়া গেল। পরম কৌতুকে সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ঠিক এই সময়েই একটি সুন্দরী তরুণী আসিয়া কাদাগোলা লইয়া মেজো-ননদের গায়ে ছিটাইয়া দিয়া বলিল, তোমায় কেউ দেয়নি বুঝি ?

মেয়েদের হাসি-কলরোল থামিয়া গেল, পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া সকলে যেন বিব্রত হইয়া উঠিল।

মেয়েটি বলিল, আমাকে বুঝি ডাকতে নেই বড়দি ? আমি ব'লে কত সাধ ক'রে ব'সে আছি!

বড়বউ বলিল, ছোটবউ, তুমি ভাই মাকে জিজ্ঞেস ক'রে কাদায় হাত দাও।

মাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইল না ; চাটুজ্জে-গিন্নী নিজেই আসিয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি ছোটবউকে সেইখানে দেখিয়া বলিলেন, তুমি কাদায় হাত দিও না বউমা। অমূল্য দেখলে অনত্থ করবে মা, কেলেঙ্কারির আর বাকী রাখবে না। তুমি স'রে এসো।

ছোটবউয়ের মুখখানি ম্লান হইয়া গেল, সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সরিয়া আসিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল। মেয়েদের কলরবের উচ্ছ্বাসে পূর্বেই ভাঁটা পড়িয়াছিল, তাহারা এবার কাজ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বড়মেয়ে অত্যন্ত বিরক্তিভরে বলিল, সেই থেকে একটা বই ন্যাতা দেওয়ালে উঠল না! নে নে, ন্যাতা দে না, অ বড়বউ!

ঠিক এই সময়েই কুমারীশ চিৎকার করিতে করিতে আসিয়া বলিল, টুল নাই, মোড়া নাই, আমি কি তালগাছে চ'ড়ে মাটি দেব ? কই, গিন্নীমা কই ? একটা টুল চাই যে মা, একটা টুল না হ'লে—আমি তো এই দেড়হাত মানুষ!

বাড়ির চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়া গিন্নীমা বলিলেন, আর একটা টুল আবার গেল কোথা ? তুমি জান বড়বউমা ?

কুমারীশ বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে ছোটবউয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, এ বউটি কে গিন্নীমা ?

গিন্নীমা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, ছোটবউমা, তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছ যা ? ছি, বার বার ব'লে তোমাকে পারলাম না। যাও, ওপরে যাও।

ছোটবউ ঘোমটাটা টানিয়া দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। কুমারীশ বলিল, ইনিই আমাদের ছোটবউমা ? আহা-হা, এ যে সাক্ষাৎ দুগ্‌গা-ঠাকরুণ গো, অ্যাঁ,

এমন চেহারা ত আমি দেখি নাই! আহা-হা! অ্যাঁ, এমন লক্ষ্মী ঘরে থাকতে ছোটবাবু আমাদের, অ্যাঁ—ছি ছি ছি!

গিন্নীমা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, কুমারীশ, তুমি এসেছ প্রতিমে গড়তে, তোমার ওসব কথায় কাজ কি বাপু? অ বড়বউমা, টুল আর একটা গেল কোথায়?

কুমারীশ বার বার ঘাড় নাড়িয়া অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিল, তা, বটে, আপনি ঠিক বলেছেন। হ্যাঁ, তা বটে, আমাদের ও কথায় কাজ কি? হ্যাঁ, তা বটে; তা আপনি ভাববেন না—সব ঠিক হয়ে যাবে। আহা-হা, এমন মুখ ত আমি—

বাধা দিয়া গিন্নীমা বলিলেন, তুমিও যাও কুমারীশ, আমি টুল পাঠিয়ে দিচ্ছি। দাঁড়িয়ে গল্প ক'রো না, যাও, আপনার কাজ করোগে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই যে—আমার ব'লে কত কাজ প'ড়ে আছে, সাতাশখানা প্রতিমে নিয়েছি। আমার বলে মরবার অবসর নাই!

কুমারীশ যে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়াছিল, আহা, এ যে সাক্ষাৎ দুগ্‌গা-ঠাকরুণ গো!—সে কথাটা অতিরঞ্জন নয়। তবে উচ্ছ্বাসটা হয়তো অশোভন হইয়াছিল। চাটুজ্জে-বাড়ির ছোটবধূটি সত্যই অতি সুন্দরী মেয়ে। সকলের চেয়ে সুন্দর তাহার মুখশ্রী। বড় বড় চোখ, বাঁশীর মত নাক, নিটোল দুইটি গাল, ছোট্ট কপালখানি। কিন্তু চিবুকের গঠন-ভঙ্গীটিই সর্বোত্তম, ওই চিবুকটিই মুখখানিকে অপরূপ শোভন করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এত রূপের অন্তরালে লুকানো ছিল মেয়েটির দগ্ধ ললাট। তাহার এমন শুভ্র স্বচ্ছ রূপের অন্তরালে নির্মল জলতলের পঙ্কস্তরের মত সে ললাট যেন চোখে দেখা যাইত।

পাঁচ বৎসর পূর্বে, ছোটবধূ যমুনার বয়স তখন বারো, সে তখন সবে বাল্য-জীবনের অনাবৃত সবুজ খেলার মাঠ হইতে কৈশোরের কুঞ্জবনে প্রবেশ করিয়াছে, তখনই তাহার এ বাড়ির ছোটছেলে অমূল্যের সহিত বিবাহ হয়। অমূল্যের বয়স তখন চব্বিশ। বাড়ির অবস্থা স্বচ্ছল, খানিকটা জমিদারি আছে, তাহার উপর মায়ের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান, সুতরাং তাহার স্বেচ্ছাচারী হইবার পক্ষে কোন বাধা ছিল না। সকাল হইতে সে কুস্তি, মুগুর, লাঠি লইয়া কাটাইয়া খান দশেক রুটি অথবা পরোটা

খাইয়া বাহির হইত স্নানে। পথে সাহাদের দোকানে খানিকটা খাঁটি গিলিয়া স্নানান্তে বাড়ি ফিরিত বেলা দুইটায়। তারপর আহার ও নিদ্রা। সন্ধ্যায় আবার বাহির হইয়া ফিরিত বারোটায় অথবা আরো খানিকটা পরে, তখন সে আর বাড়ির দুয়ার খুঁজিয়া পাইত না। মা তাহার জাগিয়া বসিয়া থাকিতেন। গ্রামেও তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত ছিল না, আজ ইহাকে প্রহার, কাল তাহার মাথা ফাটাইয়া দেওয়া, কোন দিন বা কাহারও গৃহে অনধিকার-প্রবেশ প্রভৃতি নানা ধরনের বহু অভিযোগ। এই সময়েই প্রথম পক্ষ বিয়োগের পর খুঁজিয়া পাতিয়া এই সুন্দরী যমুনার সহিত তাহার বিবাহ হইল। কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রেই সে যমুনাকে নির্মমভাবে প্রহার করিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল। কয়দিন পরই গেল গঙ্গাস্নান করিতে। সেখানে এক যাত্রিনীর উপর পাশবিক অত্যাচার করার জন্য অত্যাচারীকে হত্যা করার অপরাধে তাহার কয় বৎসর জেল হইয়া যায়। তারপর এই মাসখানেক পূর্বে অমূল্য বাড়ি ফিরিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে যমুনাকেও আনা হইয়াছে। পাঁচ বৎসর পূর্বে সেদিন এজন্য চাটুজ্জে-বাড়ির মাথাটা লজ্জায় মাটিতে নত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে সে লজ্জা বেশ সহিয়া গিয়াছে; মাটিতে যে মাথা ঠেকিয়াছিল, সে আবার ধীরে ধীরে উঠিয়াছে। এখন অমূল্যকে লইয়া শুধু অশান্তি আর আশঙ্কা। অশান্তি সহ্য হয়, কিন্তু আশঙ্কার উদ্বেগ অসহনীয়, পাছে সে আবার কিছু করিয়া বসে, এই আশঙ্কাতেই সকলে সারা হইয়া গেল। সকলে আশঙ্কা করিয়াই খালাস, কিন্তু সে আশঙ্কা নিবারণের দায়িত্ব ওই বধূটির উপর আসিয়া পড়িয়াছে। তাই বধূটির প্রতি সতর্কবাণীর অন্ত নাই, অহরহ তাহাকে সকলে সে কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, যমুনা ভয়ে ঠক্‌ঠক করিয়া কাঁপে।

কুমারীশ রাত্রেও প্রতিমার গায়ে মাটি ধরাইতেছিল, তাহার ভাইপো যোগেশ হ্যারিকেনের লণ্ঠনটি উঁচু করিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কুমারীশ প্রতিমার গায়ে মাটি দিতে দিতেও ভাবিতেছিল ওই বধূটির কথা। মেয়েটিকে তাহার বড় ভাল লাগিয়াছে। আহা, এমন সুন্দর মেয়ে, আর তাহার স্বামী কিনা এমন! সে এ বাড়িতে বহুদিন প্রতিমা গড়িতেছে, ওই ছোটবাবুকে সে ছোট ছেলেটি দেখিয়াছে। এইখানেই সে এমনই করিয়া প্রতিমাতে মাটি দিত, আর ছোট ছেলেটি বলিত, দেবে না, মিস্ত্রী দেবে না?

সে বলিত, দেব গো, দেব।

—কবে দেবে ?

—কাল।

—না, আজই দাও, ও মিস্ত্রী !

—হ্যাঁ বাবু, এই ঠাকুর ত তোমার, আবার কাত্তিক দিয়ে কি হবে ?

—না, আমায় কাত্তিক গ'ড়ে দাও।

সে হাসিয়া বলিত, বাবু আমাদের ক্ষ্যাপা বাবু।

সেই ছেলে এমন হইয়া গেল ! গেল গেল, কিন্তু এমন সুন্দর মেয়ে— ! মিস্ত্রীর চোখের সম্মুখে প্রতিমার মুখখানি যেন জলজল করিতেছে। সে স্থির করিল, ছোটবাবুর সঙ্গে দেখা হইলে হয়, সে তাহাকে বেশ করিয়া বলিবে।

যোগেশ বলিল, কাকা, রাত হ'ল অনেক, আজ আর থাকুক।

কুমারীশ অত্যন্ত চটিয়া উঠিল, থাকুক ! কালও একবেলা এইখানেই কাটুক, না কি ? বলি প্রতিমে যে সাতশখানা, তা মনে আছে ?

যোগেশ ক্লান্তভাবে বলিল, তা হোক কেনে। ওই দেখ, চৌকিদার হাঁক দিচ্ছে।

হাতের কাদার তালটা থপ্ করিয়া ফেলিয়া দিয়া কুমারীশ বলিল, ওই নে, ওই নে। মর্‌গা যেয়ে তোরা, দেখে নিগে, বুঝে নিগে সব, আমি আর কিছু পারব না।

সে উঠিয়া আসিয়া বালতির জলে হাত ডুবাইয়া খল খল করিয়া ধুইতে আরম্ভ করিল।

অপ অপ, অ্যাও, অপ !

রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া শব্দ উঠিতেছিল, দৃপ্ত এবং উচ্চ কণ্ঠে শাসন-বাক্য ধ্বনিত হইতেছে। কুমারীশ অকস্মাৎ অত্যন্ত খুশি হইয়া উঠিল, বলিল, তাই ত রে, চৌকিদারই বটে ! উঃ, খুব বলেছিস বাবা ! রাত অনেক হয়েছে রে ! হুঁ, রাত একেবারে সন্‌সন করছে ! নে, একবার তামুক সাজ্ দেখি।

যোগেশ তামাক সাজিতে বসিল।

অপ অপ, কোন্ হ্যায় ? অ্যাও উল্লুক !

কুমারীশ চমকিয়া উঠিল। লণ্ঠনের আলোকে সভয়ে দেখিল, অসুরের মত দৃঢ় শক্তিশালী এক জোয়ান সম্মুখে দাঁড়াইয়া। চোখ দুইটা অস্থির, পা টলিতেছে, হাতের শক্ত বাঁশের লাঠিগাছটা মাটিতে ঠুকিয়া সে প্রশ্ন করিতেছে, অ্যাও উল্লুক !

মুহূর্তে সে চিনিল, চাটুজ্জে-বাড়ির ছোটবাবু। কিন্তু তাহার সে মূর্তি দেখিয়া ভয়ে তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। সে অতি ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বলিল, ছোটবাবু, পেনাম, ভাল আছেন ?

লণ্ঠন, প্রতিমা, মাটি এবং কুমারীশকে একসঙ্গে দেখিয়া ছোটবাবুর মনে পড়িল। সে বলিল, মিস্তিরী, তুমি মিস্তিরী ?

কৃতার্থ হইয়া কুমারীশ বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, কুমারীশ মিস্ত্রী।

লণ্ঠনের আলোটা তুলিয়া ধরিয়া বেশ করিয়া কুমারীশকে দেখিয়া বলিল, A sly fox met a hen।--Sly fox মানে খ্যাকশেয়ালী। মাটি দিচ্ছ, বেশ, মা জগদম্বা, মাগো মা!

মিস্ত্রী তাহাকে খুশি করিবার জন্যই আবার বলিল, শরীর ভাল আছে ছোটবাবু?

—শরীর, নশ্বর শরীর। Iron man—লোহার শরীর। দেখো, দেখো।—বলিয়া সে এবার তাহার ব্যায়ামপুষ্ট দৃঢ়পেশী একখানা হাত বাহির করিয়া মুঠি বাঁধিয়া আরও শক্ত করিয়া মিস্ত্রীর সম্মুখে ধরিল।

—দেখো, টিপে দেখো।—অপ!

মিস্ত্রী সভয়ে শিহরিয়া উঠিল। অমূল্য নিজের হাতের লাঠিটা প্রসারিত হাতখানায় আঘাত করিয়া বলিল,—টমটম চালা দেগা—টমটম। এই পেতে দিলাম হাত, চালিয়ে দাও টমটম।

কুমারীশ অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ওদিকে পুকুরটার পাড়ে বাঁশবনে বাতাসের বেগে বাঁশগুলি দুলিয়া পরস্পরের সহিত ঘর্ষণ করিয়া শব্দ তুলিতেছিল, ক্যাঁ-ক্যাঁ—ক্যাঁট-ক্যাঁট। নানাপ্রকার শব্দ।

অমূল্য লাফ দিয়া হাঁকিয়া উঠিল, অপ! কোন্ হ্যায়? অ্যাও!

বাঁশবনের শব্দ থামিল না, বায়ুপ্রবাহ তখনও সমানভাবে বহিতেছিল। অমূল্য হাতের লাঠিগাছটা আস্ফালন করিয়া বলিল, ভূত।

মিস্ত্রী বলিল, আজ্ঞে না, বাঁশ।

—আলবৎ ভূত, কিংবা ছেনাল লোক ইশারা করছে।

তারপর অত্যন্ত আস্তে সে বলিল, সব খারাপ হয়ে গিয়েছে। সব চরিত্র-খারাপ। ওই শালা যদো, যদো শালা বাঁশী বাজায়, শালা কেষ্টো হবে! শালা, মারে ডাণ্ডা!

বাতাসের প্রবাহটা প্রবলতর হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বাঁশের শব্দও বিচিত্রতর এবং উচ্চতর হইয়া বাজিতে আরম্ভ করিল। অমূল্য ক্ষিপ্ত হইয়া লাঠিখানা লইয়া সেই দিকে চলিল, অপ অপ অপ, আমাকে ভয় দেখাও শালা? শালা ভূত, আও আও, চলা আও—অপ!

মিস্ত্রী অবাক হইয়া অমূল্যকেই দেখিতেছিল। সহসা সে এক সময় উর্ধ্বলোকে, বোধ করি, দেবতার উদ্দেশ্যেই দৃষ্টি তুলিতে গিয়া দেখিল, শূন্যলোকের অন্ধকারের মধ্যে আলোকের দীর্ঘ ধারা ভাসিতেছে। সে দেখিল, সম্মুখেই চাটুজ্জে-বাড়ির কোঠার জানালায় আলো জ্বালিয়া জানালার শিক ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছোটবধূটি; আলোকচ্ছটায় তাহাকে যে কেহ দেখিতে পাইবে, সে খেয়াল বোধ করি তাহার নাই। সে উপরে আলোক-শিখা জ্বালিয়া নিচে অমূল্যের সন্ধান করিতেছে। কুমারীশ বিষণ্ণ অথচ বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে বধূটির দিকে চাহিয়া রহিল।

বাঁশের বনে তখন অমূল্য যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। অপ অপ—আও আও আও—অপ!—বলিয়া হাঁক মারিতে মারিতে ঠকাঠক শব্দে বাঁশের উপর লাঠি দিয়া আঘাত আরম্ভ করিল।

যোগেশ আসিয়া কুমারীশের হাতে হুঁকাটি দিয়া বলিল, চলো, টানতে টানতেই চলো বাপু। যে মশা, বাবা, এ যেন চাক ভেঙেছে! গা হাত পা ফুলে উঠল।

কুমারীশ চকিত হইয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ওগো বউমা, গিন্নী-মাকে ডেকে দাও বরং, ও কি!

অত্যন্ত ক্ষিপ্রবেগে আলোটা সরিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে জানালাটাও বন্ধ হইয়া গেল।

কুমারীশ ব'লিল, ওগো, ও ছোটবাবু! ও ছোটবাবু।

ছোটবাবুর কানে সে কথার শব্দ প্রবেশই করিল না, সে তখনও সমানে বাঁশবনের সহিত যুদ্ধ করিতেছে।

যমুনার জীবন নিজের কাছে যে কতখানি অসহনীয়—সে যমুনাই জানে, কিন্তু তাহার বহিঃপ্রকাশ দেখিয়া কিছু বোঝা যায় না। শরতের চঞ্চল চাঁদের মত তখনই তাহার মুখ মেঘে ঢাকিয়া যায়, আবার তখনই সে উজ্জ্বল চাঞ্চল্যে হাসিয়া উঠে।

কিন্তু কুমারীশ মিস্ত্রীর তাহার জন্য বেদনার সীমা রহিল না। সে মনে মনে 'হায় হায়' করিয়া সারা হইল। দিন বিশেক পরে প্রতিমাতে 'তুম্বত্তিকা' অর্থাৎ তুষ মাটির উপরে কালো মাটি ও ন্যাকড়ার প্রলেপ লাগাইয়া, মুখ বসাইয়া, হাতে পায়ে আঙুল জুড়িয়া মাটির কাজ সারিবার জন্য কুমারীশ আসিয়া হাজির হইল। চাটুজ্জে-বাড়িতে তখন পূজার কাজ লইয়া ব্যস্ততার আর সীমা ছিল না। মুড়ি-ভাজার কাজ তখন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। পূজার কয় দিনের খরচ আছে, তাহার উপর বিজয়া-দশমীর ও একাদশীর দিনের খরচ একটা প্রকাণ্ড খরচ,— অন্ততঃ পাঁচশত লোক আসিয়া আঁচল পাতিয়া দাঁড়াইবে। বড়বউ, বড়মেয়ে, মেজোবউ প্রকাণ্ড বড় বড় ধামায় মুড়ি ভরিয়া ঘরের মধ্যে তুলিতেছে। মেজো-মেয়ে ভাঁড়ারের হাঁড়িগুলি বাহির করিয়া ঝাড়িয়া মুছিয়া আবার তুলিয়া রাখিতেছে, নূতন মসলাপাতি ভাণ্ডারজাত হইবে। ছোটবধূটিকে পর্যন্ত কাজে লাগানো হইয়াছে, সে বারান্দার এক কোণে বসিয়া সুপারি কাটিতেছে।

কুমারীশ প্রতিমার গায়ে লাগাইবার জন্য পুরানো কাপড়ের জন্য আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া কলরব করিতে আরম্ভ করিল, কই গিন্নীমা গেলেন কোথায়? এ কি বিপদ দেখ দেখি! গিন্নীমা গেলেন কোথা গো? ও গিন্নীমা!

মুড়ির ধামাটা কাঁখে করিয়া যাইতে যাইতে বড়বউ বলিল, না বাপু, মিস্ত্রী দেখছি বাড়ি মাথায় করলে। তোমার কি আস্তে কথা হয় না নাকি?

বড়মেয়ে বলিল, মিস্ত্রী আমাদের পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চ'ড়ে আসে কি না, ঘোড়া দাঁড়ায় না।

কুমারীশ ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিল, দিদি-ঠাকরুণ বলেছেন বেশ। ওটা আমার অভ্যেস। আমার শাশুড়ী কি বলত জানেন? বলত কুমারীশকে নিয়ে পরামর্শ করা বিপদ, পরামর্শ করবে ত লোকে মনে করবে, কুমারীশ আমার ঝগড়া করছে।

বড়বউ অল্প হাসিয়া বলিল, তা যেন হ'ল। এখন কি চাই বলো দেখি তোমার?

পাচিকা পাঁচুদাসী বলিল, চেঁচিয়ে গাঁ মাথায় করে কুমারীশ।

কুমারীশ অত্যন্ত চটিয়া গেল, তোমার, ঠাকরুণ, বড় ট্যাকটেকে কথা। না চেঁচালে এ বাড়িতে জিনিস পাওয়া যায়? পুরানো কাপড় চাই, তা ঠাকরুণরা

জানেনা কি? আমার ত বাপু, এক জায়গায় ব'সে হাঁড়ি ঠেলা নয়। সাতাশ-খানা—

বাধা দিয়া বড়বউ বলিল, সব ঠিক ক'রে রেখেছি বাবা, গোছানো পাট করা সব ঠিক হয়ে আছে।

তারপর চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিল, কাকেই বা বলি! ও ছোটবউ, দাও ত ভাই, ওই কাঠের সিন্দুকের ওপর ভাঁজ করা আছে এক পুঁটলি কাপড়।

কুমারীশ তাড়াতাড়ি বড়বধূর নিকট আসিয়া চুপিচুপি কহিল, বড়বউমা, ছোটবাবু এখনও তেমনিই রাত ক'রে আসে?

বড়বধূ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাহার দিকে চাহিতেই অর্ধপথে সে নীরব হইয়া গেল।

বড়বধূ বলিল, কেন বলো ত?

—এই—না, বলি, ঘরথাই হ'ল নাকি, মানে, ছোটবউমা আমাদের সোনার পুতুল। আহা মা, চোখে জল আসে আমার।

বড়বউ চুপিচুপিই বলিল, আমাকে যা বললে বেশ করলে, কিন্তু ও কথা আর কাউকে শুধিও না মিস্ত্রী। মা শুনলে রাগ করবেন, ছোটবাবু শুনলে ত রক্ষা থাকবে না।—বলিয়াই সে খালি ধামাটা সেইখানেই নামাইয়া নিজেই কাপড় আনিতে অগ্রসর হইল। ইতোমধ্যে ছোটবউই কাপড়ের পুঁটলিটা বাহির করিয়া আনিয়া দাঁড়াইল। বড়বউ তাহার হাত হইতে পুঁটলিটা লইয়া কুমারীশের হাতে দিয়া বলিল, আর যদি লাগে ত মার কাছে এসে চাইবে, আমরা আর দিতে-টিতে পারব না।

ছোটবউ মৃদুস্বরে বলিল, আমাকে মেজোদিদির মত একটা হাতি গ'ড়ে দিতে বলো না দিদি।

কুমারীশ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, সে ত আমি দিয়েছি মেজোদিদিমণিকে। দেব, দেব, দুটো হাতি গ'ড়ে এনে দেব। হাতির ওপর মাহুত সুদ্ধু।

বড়বউ বলিল, ছোটবউ, তুমি ঘরের ভেতর যাও। কুমারীশ, যাও বাবা, কাপড় ত পেলে, এইবার যাও।

কুমারীশ কাপড়ের পুঁটলিটা বগলে করিয়া বাহির হইয়া গেল। চণ্ডীমণ্ডপে তখন ছেলের দল এমন ভিড় জমাইয়া তুলিয়াছে যে, যোগেশ এবং আর একজন অত্যন্ত বিব্রত হইয়া উঠিয়াছে। কে একজন মহিষের মুণ্ডটা তুলিয়া লইয়া

পলাইয়াছে। কুমারীশ পিছন হইতে বলিল, মাটি কয়লে রে বাবা, মাটি করলে! কই কই, বিষকাদা কই, দে দে, সব লাগিয়ে দে! ধর্, ধর্, যোগেশ, ধর্ সব।

বিষকাদাকে ছেলেদের বড় ভয়, বিষকাদা গায়ে লাগিলে নাকি ঘা হয়। আর, আর যে বিশ্রী গন্ধ! ছেলের দল ছুটিয়া সরিয়া গেল। কুমারীশ একটা মোটা তুলিতে গোবর ও মাটির তরল গোলা তুলিয়া ছিটাইতে ছিটাইতে বলিল, পালা সব, পালা এখন। সেই হয়ে গেলে আসবি সব।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার একটি দুইটি করিয়া জমিতে আরম্ভ করিল।

কুমারীশ একজনকে বলিল, কই, তামুক আন্ দেখি খানিক।

রাত্রে জানালার উপর আলোটি রাখিয়া যমুনা একা বসিয়াছিল! সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ। পূজার কাজে সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া যে যাহার ঘরে শুইয়া পড়িয়াছে। বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। একা ঘরে যমুনার শুইতে বড় ভয় করে। অমূল্য মদ খাইয়া ভীষণ মূর্তিতে আসিলেও সে আশ্বস্ত হয়, মানুষের সাহস পাইয়া শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়ে। অমূল্যের অত্যাচার প্রায় তাহার সহিয়া আসিয়াছে। অমূল্যের প্রহারের চেয়ে আদরকে তাহার প্রথম প্রথম বেশি ভয় হইত, সেও তাহার সহিয়া গিয়াছে। কিন্তু রাত্রির প্রথম দিকের এই নিঃসঙ্গ অবস্থায় তাহার ভয়ের আর অন্ত থাকে না। কেবল মনে হয়, যদি ভূত আসে! ঘরের দরজা জানালা সমস্ত বন্ধ করিয়া প্রাণপণে চোখ বুজিয়া সে পড়িয়া থাকে, ঘরের মধ্যে আলোটা দপ্ দপ করিয়া জ্বালিয়া দেয়।

আজ চণ্ডীমণ্ডপে মিস্ত্রীরা প্রতিমা গড়িতেছে, খানিকটা দূরেও জাগ্রত মানুষের আশ্বাসে সে জানালা খুলিয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। লাগিতেছেও বেশ। উহারা গুজ্ গুজ করিয়া কথা কহিতেছে, কাজ করিতেছে; একজন ছোট মিস্ত্রী কাঠের পিঁড়ার উপর মাটির নেচি দ্রুত পাক দিয়া লম্বা লম্বা আঙুলগুলি গড়িতেছে, একজন ছাঁচে ফেলিয়া মাটির গয়না গড়িতেছে, আর কুমারীশ প্রতিমার মুখগুলি গড়িতেছে। বাঁশের পাতলা টুকরা দিয়া নিপুণ ক্ষিপ্রতার সহিত ভ্রূ চোখ মাটির তালের উপর ফুটাইয়া তুলিতেছে। ইহার পর মুখের উপর গঙ্গামাটির প্রলেপ দিয়া মাজিবে। যমুনা ছেলেবেলায় কত দেখিয়াছে। সিমেণ্ট-করা মেঝের মত পালিশ হইবে।

—বউমা, জেগে রয়েছেন মা?

যমুনা চকিত হইয়া উঠিল, মাথার ঘোমটাটা টানিয়া দিয়া সে একটু পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। নিজেই একটু জিব কাটিল, মিস্ত্রী দেখিয়া ফেলিয়াছে।

—আমি খুব ভাল হাতি গ'ড়ে এনে দেব একজোড়া। দুটো মাটির বেরাকেট ও এনে দেব। তারই ওপর রেখে দেবেন।

যমুনা সসংকোচে আবার আসিয়া জানালায় দাঁড়াইল, তারপর মৃদুকণ্ঠে বলিল, ব্রাকেট দুটোর নীচে দুটো পরী গ'ড়ে দিও, যেন তারাই মাথায় ক'রে ধ'রে আছে।

কুমারীশ বলিল, না, দুটো পাখি ক'রে দেব? পাখি উড়ছে, তারই পাখার ওপর বেরাকেট থাকবে।

যমুনা ভাবিতে বসিল, কোন্‌টা ভাল হইবে!

কুমারীশও নীরবে কাজ করিতে আরম্ভ করিল, কয়েক মিনিট পরেই আবার সে বলিল, আর দুটো ঘোড়াও গ'ড়ে এনে দেব বউমা।

যমুনা পুলকিত হইয়া বলিল, না, তার চেয়ে বরং দুটো চিংড়িমাছ গড়ে দিও।

এবার সে ঘোমটা সরাইয়া ফেলিল। যে গরম!

—চিংড়িমাছ? আচ্ছা, ঘোড়াও আনব, চিংড়িমাছও আনব। কিন্তু শিরোপা দিতে হবে মা।

যমুনার মুখ ম্লান হইয়া গেল, সে তাড়াতাড়ি বলিল, তুমি দুটো হাতিই এনে দিও শুধু।

—কেন মা, শিরোপার কথা শুনে ভয় পেলে নাকি? সব এনে দেব মা, একখানি তোমার পুরানো কাপড় দিও শুধু। আর কিছু লাগবে না।

অন্ধকার নিষুতি রাত্রে ধীরে ধীরে ভীত তরুণী বধূটির সহিত মিস্ত্রীর এক সহৃদয় আত্মীয়তা গড়িয়া উঠিতেছিল—ওই দেবী-প্রতিমাটির মতই।

—অপ অপ, চ'লে আও, বাপকে বেটা হোয় তো চ'লে আও!

অমূল্য আসিতেছে। ভীত হইয়া মিস্ত্রী উপরের দিকে চাহিয়া বধূটিকে সাবধান করিতে গিয়া দেখিল, অত্যন্ত সন্তর্পণে জানালাটি বন্ধ হইয়া আসিতেছে। সে আপন মনে কাজ করিতে বসিল।

—অ্যাই মিস্ত্রী!

—ছোটবাবু, পেনাম।

—ওই শালা রমনা, শালা পেসিডেনবাবু হইছে, শালা। শালা, মারব এক

ঘুঁষি, শালা ট্যাঙ্গো নিবে। শালা ফিষ্টি ক'রে খাচ্ছে পাঁঠা মাছ পোলাও, শালা। হাম দেখে লেঙ্গে।

কুমারীশ চুপ করিয়া রহিল।

আজ সটান বাড়ির দরজায় গিয়া অমূল্য বন্ধ দ্বারে লাথি মারিয়া ডাকিল, অ্যাও, কোন্ হ্যায়? খোল কেয়াড়ি।

কিছুক্ষণ পরই যমুনার অবরুদ্ধ ক্রন্দনধ্বনি শোনা যায়। অমূল্য মারে এবং শাসন করে, চোপ্, চোপ্ বলছি, চোপ্।

পূজার দিন চারেক পূর্বে কুমারীশ আবার আসিয়া প্রতিমায় রঙ লাগাইয়া দিয়া গেল। যমুনার আনন্দের আর সীমা রহিল না; কুমারীশ একটা প্রকাণ্ড ডালায় করিয়া ব্রাকেট, হাতি, ঘোড়া, চিংড়িমাছ, এক জোড়া টিয়াপাখি পর্যন্ত আনিয়া তাহাকে দিয়া গিয়াছে।

মা কিন্তু মুখ ভার করিয়া বলিলেন, অমূল্যকে না ব'লে এই সব কেন বাপু? তা এখন দাম কি নেবে বলো?

কুমারীশ পুলকিত হইয়া বলিল, দাম? এর আবার দাম লাগে নাকি মা? দেখুন দেখি। আমারও ত বউমা উনি।

বড়মেয়ে হাসিয়া বলিল, সুন্দর মানুষকেই সবাই সব দেয়, আমরা কালো মানুষ—

কুমারীশ প্রচণ্ড কলরব করিয়া উঠিল, আপনাকেও এনে দেব দিদিমণি। দেখুন দেখি, দেখুন দেখি, আপনি হলেন বড়দিদি।

সে দ্রুতপদে পলাইয়া গেল।

মা আবার বলিলেন, অমূল্যকে ব'লো না যেন বউমা, যে মানুষ!

রাত্রে সেদিনও যমুনা জানালায় বসিয়া মিস্ত্রীকে বলিল, ভারি সুন্দর হয়েছে মিস্ত্রী, ভারি সুন্দর!

উচ্ছ্বসিত কুমারীশ বলিল, পছন্দ হয়েছে মা?

যমুনা পুলকিত মুখে আবার ঘাড় নাড়িয়া বলিল, খুব, খুব পছন্দ হয়েছে। হাতি দুটো মেজোদির চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে।

—তুমি একটু ব'সো মা, আমি চক্ষুদানটা করে আসি। লক্ষ্মীর হয়েছে, সরস্বতীর হয়েছে, এইবার ঠাকরুণের চোখ মা।

যমুনা ঐ স্থানটির দিকেই চাহিয়া বসিয়া রহিল।

—অ্যাও, কোন্ হ্যায়? চুরি—চুরি করেগা? ছেনালি করেগা? শালা, মারেগা ডাণ্ডা। অপ অপ!

কোন কল্পিত ব্যক্তিকে শাসন করিতে করিতে আজ একটু সকালেই অমূল্য আসিয়া উপস্থিত হইল।

মা নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু যমুনা তাহাকে খেলনাগুলি না দেখাইয়া পারিল না। তাহার অন্তরও ছিল পুলকিত, তাহার উপর আজ অমূল্য আসিয়া তাহাকে আদর করিয়া বুকে টানিয়া লইল। যমুনা উচ্ছ্বসিত আনন্দে ডালার কাপড়খানা খুলিয়া তাহাকে পুতুলগুলি দেখাইয়া বলিল, কেমন বলো দেখি? খুব সুন্দর নয়?

চিংড়িমাছটা তুলিয়া ধরিয়া অমূল্য বলিল, গলদা হ্যায়, মারেগা কামড়?

যমুনা খিল্‌খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ঘোড়াটা দেখিয়া অমূল্য বলিল, কেয়াবাৎ রে পক্ষিরাজ—চিঁ হি হি!

যমুনা বলিল, মিস্ত্রী আমাকে এনে দিয়েছে।

—মিস্তিরী—sly fox—ওই থ্যাকশেয়ালী? অ্যাই মিস্তিরী!—সঙ্গে সঙ্গে সে জানালাটা খুলিয়া বলিল, গুড ম্যান, the sly fox is a good man, আচ্ছা আদমী।

সঙ্গে সঙ্গেই আবার জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া যমুনাকে কাছে টানিয়া লইল।

* * * *

লজ্জায় আক্ষেপে আশঙ্কায় মায়ের অবস্থাটা হইল অবর্ণনীয়। দারুণ লজ্জায় চণ্ডীমণ্ডপে সমবেত প্রতিবেশীদের সম্মুখে আর মাথা তুলিয়া কথা কহিতে পারিলেন না। কোনরূপে দেবকার্য শেষ করিয়া পলাইয়া আসিয়া বাঁচিলেন; কিন্তু বাড়িতেও তখন মৃদু গুঞ্জনে ওই আলোচনাই চলিতেছিল। বড়মেয়ে গালে হাত দিয়া ফিস্‌ফিস করিয়া বলিতেছিল, বড়বউ দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া শুনিতেছিল।

মা জোড়হাত করিয়া বলিলেন, তোমাদের পায়ে পড়ি মা, ও কথা আর ঘেঁটো না। ছি ছি ছি রে! আমার কপাল!

বড়বউ বলিল, আমরা চুপ করলে আর কি হবে মা, পাড়াপড়শী ত গা-টেপাটেপি করছে!

বড়মেয়ে বলিল, মেয়েমানুষের যার রূপ থাকে, তাকে একটুকুন সাবধানে

থাকতেও হয়, বাড়ির গিন্নীকেও সাবধানে রাখতে হয়। রামায়ণ পড়, মহাভারত পড়—

বাধা দিয়া মা বলিলেন, দোহাই মা, চুপ করো, তোমাদের পায়ে ধরছি। অমূল্য শুনলে আর রক্ষে থাকবে না।

ছোটবধূটি তখন উপরে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে আয়নাখানার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। মিথ্যা তো নয়, দেবী-প্রতিমার মুখে যে তাহারই মুখের প্রতিবিম্ব।

মেয়ে-মহলে সেই কথারই আলোচনা চলিতেছে। প্রতিচ্ছবি এত সুস্পষ্ট যে, কাহারও চোখ এড়ায় নাই।

দেবতার কাছে অপরাধ, মানুষের কাছে অপরাধ, অপরাধের বোঝা যমুনার মাথায় পাহাড়ের মত চাপিয়া বসিয়াছে। তাহার উপর তাহার স্বামী! ভয়ে সে থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

কিন্তু যমুনার ভাগ্য ভাল যে, অমূল্য পূজার কয়দিন বাড়িমুখোই হইল না। গ্রামে পূজা-বাড়িগুলির বলিদানের খবরদারি করিতেই তাহার কাটিয়া গেল। হাড়িকাঠে পাঁঠা লাগাইলে সে ঘাড়টা সোজা করিয়া দেয়; খানিকটা ঘি ডলিয়া একটা থাপ্পড় মারিয়া বলে, লাগাও—অপ!

বলিদান হইলে ঢাকী ও ঢুলীদের মধ্যে লাঠি লইয়া পাঁয়তারা নাচ নাচে। রাত্রে কোনদিন লোকজনে ধরাধরি করিয়া তুলিয়া লইয়া আসে, কোনদিন কোথায় পড়িয়া থাকে, তাহার ঠিকানা কেহ জানিতে পারে না।

বিজয়া-দশমীর দিন কিন্তু কথাটা তাহার কানে উঠিল। কানে উঠিল নয়, সে সেদিন স্বচক্ষেই দেখিল। গ্রামেও সেদিন এই আলোচনাটা ওই ঢাক-ঢোলের বাদ্যের মতই প্রবল হইয়া উঠিল।

চাটুজ্জে-বাড়ির বাউড়ী ঝি মাঝপথ হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ওগো মা, দাদাবাবু আজ ক্ষেপে গেইছে! লাঠি নিয়ে সে যা করছে আর বলছে, 'আমার বউয়ের মত অ্যা—', আর 'অপ অপ' করছে।

বাড়িসুদ্ধ শিহরিয়া উঠিলেন। সমস্ত বাড়িতে যেন একটা আতঙ্কের ছায়া নামিয়া আসিল। অমূল্যের এই কয়দিনের অনুপস্থিতিতে ও চৈতন্যহীনতার অবকাশে যমুনা খানিকটা সুস্থ হইয়াছিল, কিন্তু আজ আবার সেই আতঙ্কের

আকস্মিক আগমন-সম্ভাবনায় সে দিশাহারার মত খুঁজিতেছিল—পরিত্রাণের পথ। তাহার উপর সমস্ত গ্রামটা নাকি তাহার কথা লইয়া মুখর! এ লজ্জা সে রাখিবে কোথায়? আপনার ঘরে সে লুকাইয়া গিয়া বসিল দুইটা বাক্সের আড়ালের মধ্যে। নীচে বাড়ির মধ্যে ওই আলোচনাই চলিতেছে। পাশের বাড়িতেও ওই কথা। খোলা জানালাটা দিয়া যমুনা স্পষ্ট শুনিতে পাইল, ছি ছি ছি!

কিছুক্ষণ পরই অমূল্য ফিরিল নাচিতে নাচিতে। অপ অপ! মা কই, মা, পেনাম করি, আচ্ছা বউ করেছ না, ফাস্ট, চাকলার মধ্যে ফাস্ট! দুগ্‌গা-মায়ের মুখ ঠিক বউয়ের মত মা! দুগ্‌গা-প্রতিমে! অ্যাই ছোটবউ, অ্যাই? কই ছোটবউ!

কিন্তু কোথায় ছোটবউ? সমস্ত বাড়ির মধ্যে ছোটবউয়ের সন্ধান মিলিল না। সমস্ত রাত্রি অমূল্য পাগলের মত চিৎকার করিয়া ফিরিল।

পরদিন চণ্ডীমণ্ডপে পূজার খরচের জন্য রাজ্যের লোক আসিয়া জমিতেছিল। সকলে বৃত্তি পাইবে। নানা বৃত্তি—কাপড়, পিলসুজ, ঘড়া, গামছা, পূজার যত কিছু সামগ্রী, মায় নৈবেদ্য পর্যন্ত বৃত্তি বিলি হইবে। কুমারীশও এই গ্রামের মুখে আসিতেছিল, তাহারও পাওনা অনেক। পরনে তাহার নতুন লালপেড়ে কোরা কাপড়, গলায় কোরা চাদর, বগলে ছাতা, হাতে একটা পুঁটলিতে বাঁধা কয়টি মাটির পুতুল ও খেলনা। সে হন হন করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিল।

প্রতিমা-বাহকেরা জল হইতে দেবী-প্রতিমার খড়ের ঠাট তুলিয়া আনিয়া চণ্ডীমণ্ডপে নামাইয়া দিয়া বিদায়ের জন্য দাঁড়াইল। তাহারা চাহিল, মা, বেসজ্জনের বিদেয় আমাদের—মুড়কি নাড়ু!

ঠিক এই সময়েই বাড়ির ঝি-টা দেখিল, বাড়ির খিড়কির ঘাটেই যমুনার দেহ ভাসিতেছে। তাড়াতাড়ি তোলা হইল—বিবর্ণ শবদেহ। অমূল্য আছাড় খাইয়া কাঁদিয়া পড়িল।

কুমারীশ বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া গেল।

নারী ও নাগিনী

ইটের পাঁজা হইতে খোঁড়া শেখ ইট ছাড়াইতেছিল। খোঁড়া শেখের নাম যে কি, তাহা কেহ জানে না, বোধ করি খোঁড়ার নিজেরও মনে নাই। কোন্ শৈশবে তাহার বাঁ পা'খানি ভাঙ্গার পর হইতেই সে খোঁড়া নামেই চলিয়া আসিতেছে। শুধু পা'খানিই তাহার খোঁড়া নয়, যৌবনে কদাচারের ফলে কুৎসিত ব্যাধিতে খোঁড়ার নাকটা বসিয়া গিয়াছে—সেখানে দেখা যায় শুধু একটা বীভৎস গহ্বর। তারপর হয় তাহার বসন্ত, সেই বসন্তের দাগে কুৎসিত খোঁড়া দেখিতে ভয়ংকর হইয়া উঠিয়াছে।

আপনার মনেই খোঁড়া ইট ছাড়াইতেছিল।

অদূরে অদাই ওরফে ওয়ায়েদ শেখ গাড়ি লইয়া আসিতেছিল। গরু দুইটার লেজ দুমড়াইয়া সে গান ধরিয়া দিল—একটা অশ্লীল গান। কিন্তু অকস্মাৎ তাহার তালভঙ্গ হইয়া গেল। গরু দুইটা হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। অদাই একটা ঝাঁকানি খাইয়া গান ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল, শালার গরু, কিছু না বলেছি—

প্রচণ্ড ক্রোধে পাচন-ছড়িটা সে তুলিল গরু দুইটার অবাধ্যতার শাস্তি দিতে। গরু দুইটাও ক্রমাগত ফোঁস ফোঁস করিয়া গর্জন করিতেছিল। অদাইয়ের কিন্তু প্রহার করা হইল না, সে চিৎকার করিয়া উঠিল, খোঁড়া, খোঁড়া, সাপ—সাপ!

অদাইয়ের গাড়ির সম্মুখেই একটি কিশোর সাপ ফণা তুলিয়া অল্প অল্প দুলিতেছিল। অদাই গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িয়া একটা ইট উঠাইল।

ওদিক হইতে খোঁড়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ছুটিতেছিল, সে বলিয়া উঠিল, মারিস না অদাই, মারিস না। যাই, আমি যাই।

অদাইয়ের হাতের ইট তোলাই রহিল, সে বলিল, কি বাহারের সাপ মাইরি! মুখখানা সিঁদুরের মত টকটকে লাল। মাথার চক্করই বা কি বাহারের! কিন্তু পালাল—পালাল যে, শীগ্‌গির আয়।

সাপটা এইবার দ্রুতবেগে পলাইয়া চলিয়াছিল। কিন্তু চলিয়াছিল খোঁড়ার

দিকেই, অদাইকে পিছনে ফেলিয়া পলায়নই তাহার উদ্দেশ্য। খোঁড়াকে সে দেখে নাই।

খোঁড়া হাঁকিল, দে তো অদাই, তোর পাচনখানা ছুঁড়ে। যাঃ রে, ঢুকে পড়ল পাঁজার ভেতর। উদয়নাগ রে সাপটা, এ সাপ বড় পাওয়া যায় না। ধরতে পারলে কিছু রোজগার হ'ত রে!

খোঁড়া সাপের ওঝা। শুধু ওঝা নয়, সাপ লইয়া খেলাও সে করে। ঘরের চালের কানাচে বড় বড় মুখ-বন্ধ হাঁড়ি তাহার খাটানোই আছে। তাহারই মধ্যে সাপগুলাকে সে বন্দী করিয়া রাখে। জীর্ণ হইলে দূর মাঠে গিয়া তাহাদের ছাড়িয়া দিয়া আসে। কত সাপ মরিয়াও যায়। সাপ যখন থাকে, তখন খোঁড়া মজুর খাটে না। তখন দেখা যায়, বিষম-ঢাকি ও তুবড়ী-বাঁশী লইয়া খোঁড়া সাপের খেলা দেখাইতে চলিয়াছে। রোজগারও মন্দ হয় না। কিন্তু গাঁজা আফিংয়ের বরাদ্দ তখন বাড়িয়া যায়। কখনও কখনও মদও চলে। ফলে সাপগুলি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে খোঁড়া আবার ঝুড়ি ও বিড়া লইয়া বাহির হয়। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে বীভৎস মুখখানি ঈষৎ বাড়াইয়া বলে, মজুর খাটাবে গো—মজুর ?

তোষামোদ করিয়া সে হাসে, বীভৎস ভয়ংকর মুখ আরও বীভৎস, আরও ভয়ংকর হইয়া উঠে; মজুরি মিলিলে সে প্রাণপণে খাটে, সেখানে সে ফাঁকি দেয় না। যে দিন না মেলে, সে দিন ঝুড়ি কাঁধেই ভিক্ষা আরম্ভ করে। যাহা পায়, তাহা দিয়াই খানিকটা গাঁজা-আফিং কেনে। কিনিয়াও যদি কিছু থাকে, তবে খানিকটা পচাই-মদ গিলিয়া বাড়ি ফিরিয়া জোবেদা বিবির পা ধরিয়া কাঁদিতে বসে, বলে, আমার হাতে প'ড়ে তোর দুদ্দশার আর সীমা থাকল না! না খেতে দিয়ে তোকে মেরে ফেললাম।

জোবেদা হাসিতে হাসিতে স্বামীর মাথায় হাত বুলাইয়া বলে, লে—লে, খেপামি করিস না, ছাড়্ আমাকে—দুটো চাল দেখে আনি।

খোঁড়ার কান্না বাড়িয়া যায়, সে এবার জোবেদার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলে, একজেরা লতুন কানি কখনও দিতে লারলাম। পুরানো তেনা প'রেই তোর দিন গেল।

যাক ওসব কথা। পরদিন অতি প্রত্যূষে খোঁড়া ইটের পাজাটার কাছে

আসিয়া হাজির হইল। হাতে ছোট একটি লাঠি। বগলে একটা ঝাঁপি। সম্মুখে পূর্ব-দিক্‌চক্রবালে সবে রক্তাভা দেখা দিতে সুরু করিয়াছে।

গাছের বুকের মধ্যে বসিয়া পাখিরা মুহুর্মুহু কলরব করিতেছিল। গ্রামের মধ্যে কোন্ হিন্দু দেব-মন্দিরে মঙ্গলারতির শঙ্খঘণ্টা বাজিতেছে। একটা উঁচু ঢিপির উপর বসিয়া খোঁড়া চারিদিকে সতর্ক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছিল।

পূর্বাচলের রাঙা রঙ ক্রমশ গাঢ় হইয়া পরিধিতে বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল। সে রঙের আভায় পাঁজার পোড়া ইটগুলো আরও রাঙা হইয়া উঠিল। খোঁড়ার ময়লা কাপড়খানায় পর্যন্ত লাল রঙের ছোপ ধরিয়া গিয়াছে। খোঁড়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ওই —ওই না ?

ঈষদ্দূরে প্রান্তরের বুকে বোধ হয় সেই কিশোর সাপটিই পূর্বাকাশের দিকে মুখ তুলিয়া ফণা নাচাইয়া খেলা করিতেছিল। প্রাতঃসূর্যের রক্তাভায় তাহার রঙ দেখাইতেছিল যেন গাঢ় লাল। সেই লাল রঙের মধ্যে ফণার ঘন কালো চক্রচিহ্ন অপূর্ব শোভায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রজাপতির রাঙা পাখার মধ্যে কালো বর্ণলেখার মতই সে মনোরম। খোঁড়া মুগ্ধ হইয়া গেল। আপনার মনেই মৃদুস্বরে সে বলিয়া উঠিল, বাঃ !

তারপর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। সর্পশিশু উদীয়মান সূর্যের অভিনন্দনে এত মাতিয়া উঠিয়াছিল যে, খোঁড়ার পদশব্দেও তাহার খেলা ভাঙ্গিল না। অতি সন্নিকটে আসিতেই সে সচকিত হইয়া মুখ ফিরাইল। পরমুহূর্তে সে গর্জন করিয়া ছোবল মারিল। কিন্তু ফণা আর সে তুলিতে পারিল না। খোঁড়া ক্ষিপ্রহস্তে বাঁ হাতের লাঠিখানি দিয়া তখন তাহার মাথা চাপিয়া ধরিয়াছে। ডান হাতে সাপের লেজ ধরিয়া গোটা-দুই ঝাঁকি দিয়া খোঁড়া বেশ করিয়া সাপটাকে দেখিয়া বলিল, সাপিনী।

মাস ছয়েক পর। গাঁজার দোকান হইতে ফিরিয়া খোঁড়া জোবেদাকে বলিল, কি এনেছি দেখ্।

উঠানে ঝাঁটা বুলাইতে বুলাইতে জোবেদা বলিল, কি ?

কাপড়ের খুঁট খুলিয়া খোঁড়া ছোট চিক্‌চিকে একটি বস্তু বাহির করিয়া হাতের

তালুর উপর রাখিয়া জোবেদার সম্মুখে ধরিল। বস্তুটি ছোট একটি মিনি—নাকে পরিবার অলংকার।

জোবেদা প্রশ্ন করিল, এত ছোট মিনি কি হবে?

হাসিয়া খোঁড়া বলিল, বিবিকে পরিয়ে দেব।

জোবেদা অবাক্ হইয়া গেল, হাসিতে হাসিতে খোঁড়া ঘরে প্রবেশ করিল। তারপর গলায় একটি সাপ জড়াইয়া বাহির হইয়া আসিল। সেই সাপটি। এতদিনে আরও একটু বড় হইয়াছে। কিন্তু সে তেজ নাই। শান্ত আক্রোশহীনভাবে ধীরে ধীরে মুখটি ঈষৎ তুলিয়া খোঁড়ার গলায় কাঁধে ফিরিতেছিল। জোবেদা বলিল, দেখো, ও ক'রো না। যতই তেজ না থাক, ও জাতকে বিশ্বাস নাই।

হাসিয়া খোঁড়া বলিল, বিশ্বাস নাই ওদের বিষ-দাঁতকে। নইলে ওরাও তো ভালবাসে জোবেদা। বিষ-দাঁতই নাই, কিন্তু আর দাঁত তো রয়েছে, কই আমাকে ত কামড়ায় না। কেমন ভাল মেয়ের মত বিবি আমার ফিরছে বল্ দেখি!—বলিয়া সে সাপটির ঠোঁট দুইটি চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখে একটা চুমা খাইয়া বসিল।

জোবেদা বিস্মিত হইল না, কারণ এ দৃশ্য তাহার নিকট নূতন নয়। কিন্তু সে বিরক্তিভরে বলিল, ছি ছি ছি! তোমার কি ঘেন্না-পিত্তিও নাই? কতবার তোমাকে বারণ করেছি, বলো ত?

সে কথায় খোঁড়া কানই দিল না। সে বলিল, দেখ্ দেখ্, কেমন আমার হাতটা জড়িয়ে ধরেছে. দেখ্ দেখি! জানিস, সাপিনী আর সাপে যখন খেলা করে তখন ঠিক এমনই ক'রে জড়াজড়ি করে ওরা। দেখেছিস কখনও? আঃ, সে যে কি বাহারের খেলা মাইরি!

জোবেদা বলিল, দেখে আমার কাজ নাই, তুই দেখেছিস সেই ভাল। কিন্তু তোর খেলাও ওই শেষ করবে, তা বুঝিস!

খোঁড়া তখন একটা সূচ লইয়া বিবির নাক ফুড়িতে বসিয়াছে। পায়ের আঙুল দিয়া সাপটার লেজ চাপিয়া ধরিয়াছে, আর বাঁ হাতে চাপিয়া ধরিয়াছে মুখটা। ডান হাতে সূচ ধরিয়া নাক ফুঁড়িয়া মিনি পরাইয়া দিয়া সাপটাকে ছাড়িয়া দিল। যন্ত্রণায় ক্রোধে গর্জন করিয়া বিবি বারংবার খোঁড়াকে ছোবল মারিতে আরম্ভ করিল। ঝাঁপির ডালাটা ঢালের মত সম্মুখে ধরিয়া বিবির আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে করিতে

সে বলিল, রাগ করিস না বিবি, রাগ করিস না। দেখ্ তো কেমন খুবসুরত লাগছে তোকে! দে তো, জোবেদা, আয়নাটা দে তো। দেখুক একবার নিজের চেহারাখানা।

জোবেদা বলিল, লারব আমি।

—দে দে, তোর পায়ে পড়ি, একবার দে। দেখি না, নিজের চেহারা দেখে ও কি করে!

জোবেদা স্বামীর এ অনুনয় উপেক্ষা করিতে পারিল না। সে আয়না আনিবার জন্য ঘরে প্রবেশ করিল।

খোঁড়া বলিল, একজেরা সিঁদুরও আনিস তো মেহেরবানি ক'রে।

জোবেদা ঘর হইতে প্রশ্ন করিল, কি, হবে কি?

পরম কৌতুকে হাস্য করিয়া খোঁড়া বলিল, দেখবি, কি হবে। আগে হতে বলছি না।

জোবেদা আয়না সিঁদুর ঈষদ্দূরে নামাইয়া দিল। খোঁড়া সুকৌশলে বিবিকে ধরিয়া একটি কাঠির ডগায় সিঁদুর লইয়া সাপটির মাথায় একটি লাল রেখা আঁকিয়া দিল। তারপর হা-হা করিয়া হাসিয়া বলিল, ওয়াকে আমি নিকা করলাম জোবেদা, ও তোর সতীন হ'ল।

পরে বিবিকে বলিল, দেখ্ দেখ্ বিবি, কি বাহার তোর খুলেছে, দেখ্ দেখি! সাপটাকে ছাড়িয়া দিয়া সে আয়নাটা বিবির সম্মুখে ধরিল। তারপর বিষম-ঢাকিটা বাজাইয়া কর্কশ অনুনাসিক স্বরে গান ধরিল—

জানি না গো এমন হবে
গোকুল ছাড়িয়া কেষ্ট মথুরা যাবে
ও জানি না গো—

আরও মাস কয়েক পর।

বর্ষার মাঝামাঝি একটা দুরন্ত বাদলা করিয়াছে। খোঁড়া কোথায় গিয়াছে, বাদলে দুর্যোগে ফিরিতে পারে নাই। জোবেদা অনুভব করিল, ঘরের মধ্যে কেমন একটা গন্ধ উঠিতেছে—গন্ধটা ক্ষীণ। কিন্তু মিষ্ট এবং কেমন নূতন রকমের। এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়াও সে কিছু বুঝিতে পারিল না।

দিন দুই পরে খোঁড়া ফিরিল, জলের দেবতাকে একটা অশ্লীল গালি দিয়া বলিল, কিছু [illegible] দেখি জোবেদা, [illegible]ড় ভুখ লেগেছে।

জোবেদা ঘরের মধ্যেই একটা থালায় পান্তাভাত বাড়িয়া দিল। পায়ের কাদা ধুইয়া ফেলিয়া খোঁড়া ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, গন্ধ কিসের বল্ দেখি জোবেদা?

জোবেদা বলিল, কে জানে বাপু, আজ ক'দিন থেকেই ঘরে এমনই গন্ধ উঠছে।

খোঁড়া কথা কহিল না. সে শুধু ঘন ঘন শ্বাস টানিয়া গন্ধটার স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছিল। এদিক ওদিক ঘুরিয়া সে বিবির ঝাঁপির কাছে দাঁড়াইল। মানুষের পদশব্দে ঝাঁপির ভিতর নাগিনীটা গর্জন করিয়া উঠিল।

খোঁড়া বলিল, হুঁ।

জোবেদা ঔৎসুক্যভরে প্রশ্ন করিল, কি বল্ দেখি?

খোঁড়া বলিল, বিবির গায়ের গন্ধ। সাপিনী তো, সাপের সঙ্গে দেখা হবার সময় হয়েছে, তাই। ওই গন্ধেই সাপ চ'লে আসে।

জোবেদা অবাক্ হইয়া গেল। বলিল, কে জানে বাপু, তোদের কথা তোদেরই ভাল। নে, এখন পান্তি ক'টা খেয়ে ফেল্।

ভাত খাইতে খাইতে খোঁড়া বলিল, ওটাকে ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে মাঠে। এ সময় ধ'রে রাখতে নাই।

একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে কথাটা শেষ করিল।

জোবেদা পরম আশ্বাসের একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, সেই ভাল বাপু, ওটাকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। এত সাপ মরে, ওটা মরেও না ত!

ভাত খাইয়া খোঁড়া ঝাঁপি হইতে বিবিকে বাহির করিল। মুখটি চাপিয়া ধরিয়া সে কত আদরের কথা কহিল।

জোবেদা বলিল, এই দেখ্, ক'দিন ওকে কামানো হয় নাই, ওর দাঁত গজিয়েছে। আর মায়াই বা কেন বাপু? যা না, ওকে ছেড়ে দিয়ে আয়।

খোঁড়া বলিল, দেখ্, দেখ্, কেমন আমার হাতটা জড়িয়ে ধরেছে দেখ্!

অপরাহ্ণে খোঁড়া বিমর্ষ হইয়া বসিয়াছিল। বিবিকে পার্শ্বের জঙ্গলটায় ছাড়িয়া দিয়াছে। জোবেদা বলিল, এমন ক'রে ব'সে কেন বল্ তো? গাঁজা-টাজা খা কেনে।

খোঁড়া কহিল, বিবির লেগে মন কি করছে রে।

জোবেদা হাসিয়া বলিল, মর্ মর্। তোর কথা শুনে কি হয় আমার!

—না রে জোবেদা, মনটা ভারি খারাপ করছে।

জোবেদা এবার স্বামীর পাশে বসিয়া আদর করিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, কেনে রে আমাকে তোর ভাল লাগে না?

সাদরে তাহাকে চুম্বন করিয়া খোঁড়া বলিল, তোর জোরেই তো বেঁচে রইছি, জোবেদা। তু আমার জানের চেয়ে বেশি।

জোবেদা বলিয়া উঠিল, দেখ্ দেখ্, বিবি ফিরে এসেছে। ওই দেখ্—নালার মধ্যে।

জলনিকাশী নালার মধ্যে সত্যই বিবি ফণা তুলিয়া বেড়াইতেছিল।

খোঁড়া উঠিতে চেষ্টা করিয়া বলিল, ধ'রে আনি, দাঁড়া।

জোবেদা স্বামীকে প্রাণপণে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, না।

তারপর কর্কশকণ্ঠে বলিল—বেরো, বেরো, হেট, হেট।

বাঁ হাতে করিয়া একখানা ঘুঁটে ছুঁড়িয়া সে বিবিকে মারিল। সাপটা সক্রোধে মাটির উপর কয়েকটা ছোবল মারিয়া ধীরে ধীরে নালা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর বোধ হয়, জোবেদা চিৎকার করিয়া উঠিল, ওঠ্, ওঠ্, কিসে আমায় কাট্‌লে!

খোঁড়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আলো জ্বালিয়া দেখিল, সত্যই জোবেদার বাঁ পায়ের আঙুলে এক ফোঁটা রক্ত জলবিন্দুর মত টলটল করিতেছে।

জোবেদা আবার চিৎকার করিয়া উঠিল, বিবি—তোর বিবি আমাকে কেটেছে, ওই দেখ্।

একটা হাঁড়িতে বেড় দিয়া নাগিনী ধীরে ধীরে চলিয়াছিল। খোঁড়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া সাপটাকে ধরিয়া ঝাঁপিতে বন্দী করিয়া বলিল, জোবেদা যদি না বাঁচে, তবে তোকেও শেষ করব আমি।

জোবেদা কিন্তু বাঁচিল না। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহে মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পাইল। মাথার চুল টানিতেই খস খস করিয়া উঠিয়া আসিল। ওঝারা চলিয়া গেল। বীভৎস ভয়ংকর মুখ সকরুণ করিয়া শিয়রে খোঁড়া বসিয়া রহিল।

একজন ওস্তাদ বলিল, তুইও যেতিস খোঁড়া, খুব বেঁচে গিয়েছিস। ভারি আক্রোশ ওদের, হয়তো তোকে কামড়াইতেই এসেছিল।

সাশ্রুনেত্রে খোঁড়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

খোঁড়া ফকিরি লইয়াছে। তাহার ভিটাটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে। খোঁড়ার বাড়ির পাশ দিয়াই একটা পায়ে-চলা পথ ছিল, সে পথটা এখন বন্ধ, সে দিক্ দিয়া এখন কেহ হাঁটে না। বলে, বড় সাপের ভয়। সাপগুলো বড় খারাপ সাপ—উদয়নাগ। প্রত্যূষে সূর্যোদয়ের সময় দেখা যায়, রাঙা রঙের সাপ ফণা তুলাইয়া খেলা করিতেছে।

বিবিকে খোঁড়া বধ করিতে পারে নাই। তাহাকে সে ছাড়িয়া দিয়াছিল। বলিয়াছিল, শুধু তোর দোষ কি, মেয়েজাতের স্বভাবই ওই। জোবেদাও তোকে দেখতে পারত না।

এক রাত্রি

গ্রাম হইতে প্রায় মাইলখানেক দূরে জনহীন প্রান্তরে ছোট একটি জঙ্গলের মধ্যে দেবস্থলটি মনোরম। দেখিয়া বেশ বোঝা যায়, বহুবর্ষ পূর্বে নদীর সিকতা-ভূমির উর্বরতায় জঙ্গলটির জন্ম হইয়াছিল। এখন নদীটি প্রায় আধ মাইলের উপর সরিয়া গিয়াছে। অর্জুন, শিমুল, বন্য জামগাছের সুদীর্ঘ কাণ্ডগুলি জনতার মত ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নিচে নানা প্রকারের লতা আর গুল্মে সমাচ্ছন্ন। এই ঘন বন-সন্নিবেশের মধ্যে—প্রায় কেন্দ্রস্থলে, পরিচ্ছন্ন খানিকটা—বিঘা দুয়েক জমির উপর প্রাচীন একটি মন্দির। মন্দিরটির রঙ কালো কঠিন, দেখিয়া মনে হয়, যেন অখণ্ড একটা ছোট পাহাড় হইতে খোদাই করিয়া গড়া। বিগত হইয়া যাওয়া শতাব্দীর অন্ধকারের ছায়া দিন দিন যেন ঘন গাঢ় হইয়া উঠিতেছে। মন্দিরের সম্মুখে জীর্ণ একটি নাট-মন্দির। এমনই কালো, তবে অখণ্ড বলিয়া মনে হয় না। খিলানে খিলানে ফাট ধরিয়াছে। নাট-মন্দিরের দুই পাশে দুইখানি মাটির ঘর। একখানি ভোগ-মন্দির, অপরখানি সাধক সন্ন্যাসী কেহ আসিলে থাকিতে দেওয়া হয়। তান্ত্রিক সাধনার বহু-বিখ্যাত সিদ্ধপীঠ। এককালে নাকি নরবলি হইত; এখন পশুবলি হয়—ছাগল, ভেড়া, মহিষ; এক এক বিশিষ্ট পর্বে শতাধিক পশুর রক্তে নাট-মন্দিরের চত্বর ভাসিয়া যায় এবং দেবী-মন্দিরের দুয়ারের সম্মুখে পশুমুণ্ডের স্তূপ গড়িয়া উঠে। মন্দিরের ডান দিক্ ভৈরবতলা—প্রাচীন একটি শিমুলগাছের তলায় একটি শিবলিঙ্গ। মন্দিরের বাঁ দিকে সিন্দুর লিপ্ত কতক-গুলা নরকপাল। রাত্রে দেবী নাকি মন্দির হইতে বাহির হইয়া ভৈরবের সহিত ঐ নরকপাল লইয়া গেণ্ডুয়া খেলিয়া থাকেন। নিত্য প্রভাতে দেখা যায়, নরকপাল-গুলি ছড়াইয়া পড়িয়া আছে; পুরোহিত নিত্য সেগুলিকে গুছাইয়া রাখে। দেবীর খলখল হাসিতে, ভৈরবের হুম হুম ধ্বনিতে, কৌতুকোচ্ছল দর্শক শিবা, পেচক, শকুনের আনন্দ-ধ্বনিতে আশেপাশের পল্লীর অধিবাসীরা সুষুপ্তির মধ্যেও শিহরিয়া উঠে; গাছে গাছে পাতাগুলি মৃদু কম্পনে থর থর করিয়া কাঁপে। রাত্রে এ দেবস্থলে কেহ বড় থাকে না। প্রাচীন কাল হইতে ভূমি-বৃত্তিভোগী পুরোহিত

সকালে আসিয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকিয়া সন্ধ্যারতি শেষ করিয়াই গ্রামে আপন গৃহে চলিয়া যায়। তাহার পর হইতেই আরম্ভ হয় দেবলীলা। কখনও কখনও দুই-দশজন অসমসাহসী তান্ত্রিক সন্ন্যাসী থাকিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু দুই-একজন ছাড়া কেহ থাকিতে পারে নাই। বাকি সকলে অর্ধরাত্রেই পলাইয়া গিয়াছে; দুই-একজন পাগল পর্যন্ত হইয়া গিয়াছে। দুই-চারিজন সন্ন্যাসী আসে প্রত্যহই, কিন্তু দিনে প্রসাদ পাইয়া সন্ধ্যার পূর্বেই গ্রামে বা স্থানান্তরে চলিয়া যায়।

পুরোহিত কন্যার মত আদর করিয়া দেবীকে বলেন, ভয়ংকরী আমার ক্ষেপা মেয়ে।

সেদিন শ্রাবণসন্ধ্যায় আকাশ-জোড়া ঘন মেঘ; কিন্তু বর্ষণ ছিল না। গুমট গরমে দেবস্থলের বনসমারোহের মধ্যে নিথর স্তব্ধতা থম থম করিতেছিল। নিচে লতাগুল্মের অন্তরালে গুমট-ক্লিষ্ট সরীসৃপের সঞ্চরণ আজ ইহারই মধ্যে স্পষ্ট এবং প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। পুরোহিত সন্ধ্যারতি শেষ করিলেন। অন্যদিন বরং দুই-চারিজন ভক্তিমান গ্রামবাসী আরতির সময় আসিয়া থাকে, কিন্তু আজ আর কেহ আসে নাই; কেবল ঢাক লইয়া আসিয়াছিল চাকরান-জমিভোগী ঢাকীটা। আর ছিল দুইজন আগন্তুক সন্ন্যাসী। একজন আসিয়াছে সকালে, একজন দ্বিপ্রহরে, দেবীর ভোগের পূর্বেই; ওবেলায় এইখানেই প্রসাদ পাইয়াছে। পুরোহিত ভাবিয়াছিলেন, অপরাহ্ণেই চলিয়া যাইবে। তিনি এ দেবস্থলের ভয়ংকরত্বের কথা সবই বলিয়াছেন! আরতি শেষ করিয়া পুরোহিত দেখিলেন, জোয়ান সন্ন্যাসীটি আপনার জিনিসপত্র গুছাইতেছে; কিন্তু প্রৌঢ় সন্ন্যাসীটি এখনও স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছে। অদ্ভুত ঘুম লোকটার, ঢাকের বাজনাতেও ঘুম ভাঙিল না। কিন্তু পুরোহিত কাছে আসিয়া দেখিলেন, লোকটা ঘুমায় নাই, চুপ করিয়া চোখ মেলিয়া শুইয়া আছে। পুরোহিত ডাকিল, বাবাজী! ওহে গোঁসাই!

লোকটা উঠিয়া আসিয়া আমড়ার আঁটির মত চোখ দুইটা মেলিয়া বোকার মত বলিল, অাঁ?

—তুমি যাবে না নাকি? এত কথা বললাম তোমাকে—

লোকটা অত্যন্ত কৌতুকে হেঁ-হেঁ-হেঁ করিয়া হাসিয়া উঠিল, হাসিটা কিন্তু রূঢ়

নয়, বিনীত এবং নির্বোধ। হাসিয়া সে বলিল, বেশ থাকব বাবা এইখানে। বলিয়া আবার সে হাসিয়া উঠিল, হেঁ-হেঁ-হেঁ। তিনটি দ্রুত হেঁ শব্দে এক টুকরা বিনীত নির্বোধ হাসি।

পুরোহিত বলিলেন, এই দেখ, এ মহাভয়ংকর স্থান। এখানে ওসব পাকামি ক'রো না।

সবিনয়ে অকারণে অর্থহীনভাবে হাসিয়া লোকটা বলিল, আজ্ঞে, বেশ থাকব বাবা। 'কালী কালী' ব'লে কাটিয়ে দোব—হেঁ হেঁ-হেঁ। সেই নির্বোধ দ্রুত হাসি।

পুরোহিত এবার নীরবে লোকটার আপাদমস্তক ভাল করিয়া দেখিলেন। মাথায় কাঁচাপাকা একমাথা বড় বড় রুক্ষ চুল, একমুখ দাড়ি-গোঁফ, স্থূল সরল দৃষ্টিভরা বড় বড় দুইটা চোখ, দন্তহীন তোবড়ানো মুখ—লোকটার উপর মায়া হয় না, দয়া হয়। অতিথিশালার দাওয়ার উপরেই একটা ধুনি জ্বলিতেছিল—লোকটা ধুনিতে কাঠ ফেলিয়া দিয়া গাঁজা টিপিতে বসিল। পুরোহিত তাহাকে তখনও দেখিতেছিলেন; সন্ন্যাসী তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আবার হাসিল, হেঁ-হেঁ-হেঁ।

পুরোহিতের সহসা মনে হইল, লোকটি বোধ হয় গুপ্ত সাধক। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত উত্তাপও যেন তিনি অনুভব করিলেন। বলিলেন, তা হ'লে বাবা, আপনি—

হেঁ-হেঁ-হেঁ করিয়া হাসিয়া লোকটি বলিল, হ্যাঁ বাবা, যান আপনি, বেশ থাকব আমি।

অপর সন্ন্যাসীটি ততক্ষণ জিনিসপত্র বগলে করিয়াও নীরবে দাঁড়াইয়া সব দেখিতেছিল। সেও এবার জিনিসপত্র নামাইয়া বলিল, তাহ'লে আমিও থাকি বাবা এইখানেই।

লোকটি ভরা জোয়ান; একচাপ কালো রুক্ষ দাঁড়ি-গোঁফে সমাচ্ছন্ন মুখ, মাথায় তৈলহীন চুলগুলি লম্বা, কিন্তু বেশ বিন্যস্ত। পরনে গেরুয়া বহির্বাস, গায়ে একখানা গেরুয়া চাদর।

প্রৌঢ় সন্ন্যাসী বলিল, কেন বাবা, বেশ ত থাকতে গাঁয়ে! এবার আর সে হাসিল না। কণ্ঠস্বরে বিরক্তির সুর সুপরিস্ফুট। কিন্তু পুরোহিত বলিলেন, থাকুন

বাবা, উনিও থাকুন; একা না বোকা। তা উনি না হয় ওদিকে রান্নাঘরের দাওয়ায় থাকবেন।

জোয়ান সন্ন্যাসী বিনাবাক্যব্যয়ে নাট-মন্দিরের ওপাশে রান্নাঘরের দাওয়ার উপর গিয়া আস্তানা গাড়িয়া বসিল। পুরোহিত আর অপেক্ষা করিলেন না, আলোটি হাতে করিয়া সংকীর্ণ বনপথের মধ্য দিয়া চলিয়া গেলেন।

* * *

আলোটা চলিয়া যাইতেই দেবস্থান মুহূর্তে ভয়াবহ অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়া গেল। সে অন্ধকার যেন পৃথিবীর দিবারাত্রির অন্ধকার নয়, কুটিল, নিথর, গম্ভীর। সন্ন্যাসী মুহূর্তের জন্য শিহরিয়া উঠিল, তারপর ফুঁ দিয়া ধুনিটা জ্বালাইয়া তুলিল। শূলবিদ্ধ অন্ধকারের বুকের উচ্ছ্বসিত রক্তধারার মত আলোকশিখা জ্বলিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী হাসিল, হেঁ-হেঁ-হেঁ। হাসিয়া সে ছোট কল্কেতে হাতের গাঁজাটুকু সাজিয়া আগুন চড়াইল। আপন মনেই বলিল, গেরামে গিয়ে ফেসাদে পড়ি আর কি। হাজার কৈফিয়ত। তার চেয়ে বাবা অরণ্য ভাল। দশ বছর অরণ্যে অরণ্যে কেটে গেল বাবা, হেঁ-হেঁ-হেঁ।

—মহাদেবের প্রসাদ পাব বাবা? জোয়ান সন্ন্যাসীটি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রৌঢ় সন্ন্যাসী ফিরিয়া চাহিল, ধুনির আলোতে অন্ধকারের মধ্যে অদ্ভুত দেখাইতেছে তাহাকে।

—প্রসাদ পাব বাবা?

—হেঁ-হেঁ-হেঁ। ব'স বাবা, ব'স। প্রৌঢ় সন্ন্যাসী সজোরে দম দিয়া কল্কেটি বাড়াইয়া দিল; কিছুক্ষণ পরে দমটা ছাড়িয়া সে প্রশ্ন করিল, কোথা আশ্রম বাবাজীর?

—আশ্রম? তরুণ সন্ন্যাসী হাসিল। তারপর বলিল, দুনিয়াময়ই আশ্রম বাবা; যেদিন যেখানে থাকি, সেইখানেই আশ্রম।

—হেঁ-হেঁ-হেঁ। আমারও তাই বাবা। প্রৌঢ় আবার সেই হাসি হাসিল, হেঁ-হেঁ-হেঁ। কল্কেতে আবার দম দিয়া সে নীরবে কল্কেটি বাড়াইয়া দিল। তরুণ সন্ন্যাসী দম দিয়া কল্কেটি উপুড় করিয়া দিল, আর নাই। দুইজনেই কিছুক্ষণ ভোম হইয়া বসিয়া রহিল।

লঘু দ্রুত পদশব্দ—তাহার পরই খট্‌ খট্‌ শব্দে দুই-তিনটা নরকপাল স্তূপচ্যুত হইয়া গড়াইয়া পড়িল। দুইজনেই চমকিয়া উঠিল। সচকিত বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ঘাড় উঁচু করিয়া চাহিল। আবার লঘু পদশব্দ, আবার দুইটা নরকপাল গড়াইয়া পড়িল।

প্রৌঢ় বলিল, শেয়াল। মড়ার মাথার ওপর দিয়ে বেটাদের পথ। হেঁ হেঁ-হেঁ।

তরুণ সন্ন্যাসীও হাসিল, সেও দেখিয়াছে। প্রৌঢ় বলিল, জমল না। আর একটু হোক, কি বল? সে গাঁজা বাহির করিয়া বসিল।

তরুণ সন্ন্যাসী একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া রহিল। প্রৌঢ়ই বলিল, কে কে আছে বাবা, তোমার বাড়িতে?

—কেউ না। মা ছিল, ম'রে যেতেই আমি বেরিয়ে পড়েছি।

—কোথা বাড়ি ছিল?

—বাড়ি?

—হ্যাঁ, বাড়ি।

—সে শুনে আর কি করবে?

প্রৌঢ় হাসিয়া উঠিল, হেঁ-হেঁ-হেঁ। বলিল, রাত কাটান নিয়ে কথা বাবা।

তরুণ বলিল, তোমার বাড়ি কোথা ছিল বাবা?

কল্কেতে গাঁজা সাজিতে সাজিতে প্রৌঢ় হাসিয়া উঠিল, বলিল, কে জানে? আমি সন্ন্যাসী সেই ছেলেবেলা থেকে। অঘোরপন্থীরা চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে। কল্কেতে আগুন চড়াইতে চড়াইতে বলিল, অঘোরপন্থীরা মড়ার মাংস খায় চিমটেতে ক'রে ধ'রে চিতার আগুনে ঝলসিয়ে—বেশ লাগে। হেঁ-হেঁ-হেঁ। সে হাসিয়া উঠিল! তারপর সে গাঁজায় দম দিল। পালা করিয়া গাঁজার কল্কে হাতে হাতে ফিরিতে আরম্ভ করিল।

গাঁজার কল্কে উপুড় করিয়া তরুণ বলিল, কঙ্কালী মহাপীঠে এক সাধু ছিল, ছেলেবেলায় আমরা দেখেছি; সে খেত।

—কঙ্কালীতলা? বীরভূম জেলা?

—হ্যাঁ। গিয়েছ সেখানে? কোপাইয়ের উপর মহাশ্মশান।

—হেঁ-হেঁ-হেঁ। প্রৌঢ় হাসিয়া উঠিল। নবগ্রামের রামবাবুকে জানতে? অ্যাই দশাশয়ী পুরুষ; এই একগুলি আফিম খেত। 'পাট-ভাণ্ডার' প'ড়ে থাকত

কাছারির সিমেণ্ট করা দাওয়াতে। 'ফ্রুক ফ্রুক' গড়গড়ার নলে আর মুখে। তামাক ফুরুলেই হাঁক—লাল-রূ-প! সঙ্গে সঙ্গে কল্কে হাজির—হোজোর! প্রৌঢ় নিজেই হাত বাড়াইয়া যেন কল্কে আগাইয়া দিল।

তরুণ সন্ন্যাসীর নেশা বেশ জমিয়া আসিয়াছিল; চোখ দুইটি অস্তি করুষ্ট বিস্ফারিত করিয়া সে বলিল, রূপলাল?

প্রৌঢ় বলিল, হঁ্যা, রূপলাল, সেই ইয়া দুটো বড় বড় দাঁত! এই বড় বড় চোখ! 'বক্তিতা' করত! বলত, "করকে বলি রে—কর, তুই হরি-মন্দির পরিষ্কার কর—কর আমার সে কর্ম দুষ্কর মনে ক'রে তস্কর কর্মে প্রবৃত্ত হ'ল। একবার সবাই হরি হরি বল।" সে হেঁ-হেঁ করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল গমকে গমকে। হেঁ-হেঁ-হেঁ। হেঁ-হেঁ-হেঁ।

তরুণ স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। প্রৌঢ় আবার বলিল, নারদের বক্তিতে' বাবু শুনতে খুব ভালবাসতেন। বাবু খুব ভালবাসতেন রূপলালকে। আদর ক'রে বলতেন, লালরূপ।

অকস্মাৎ কাহার ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাসের শব্দে দুইজনেই চমকিয়া উঠিল। কে? ঘাড় উঁচু করিয়া দুইজনেই নাট-মন্দিরের দিকে চাহিল। প্রৌঢ় জ্বলন্ত কাঠটা হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

শালা! তরুণ সন্ন্যাসী চিমটা লইয়া উঠিল। একটা সাপ, আলো ও মানুষ দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। প্রৌঢ় সন্ন্যাসী তরুণের হাত ধরিয়া বসাইল। মরুক বেটা, তুমি ব'স।

তরুণ বসিয়া এবার প্রশ্ন করিল, রূপলালকে তুমি চিনতে? এতক্ষণে তাহার প্রশ্নটা সম্বন্ধে খেয়াল হইয়াছে।

প্রৌঢ় হাঁসিয়া উঠিল, হেঁ-হেঁ-হেঁ। বলিল, রামবাবুর কাছে আমি যেতাম যে, হরদম যেতাম! ঠাকুর-বাড়িতে থাকতাম। রূপলাল আমার কাছে থাকত। এই এতটুকু বেলা থেকে রূপলাল বাবুদের বাড়িতে থাকত। রামবাবুর কাকার কাছে শিখেছিল গাঁজা খেতে। লোকে তাকে বলত ছোটকর্তা। ছোটকর্তা গাঁজা খেতেন—ইয়া রূপোর কল্কে; আর সকাল থেকে গাঁজা ভিজানো থাকত গোলাপজলে। আতর দিয়ে সেই গাঁজা টিপে, চন্দনকাঠের কাটনিতে কেটে, সেজে দাঁত-বাঁকা বাড়ুজ্যে হাতে ক'রে ধরত, ছোটকর্তা মুখ লাগিয়ে টানতেন।

রূপলাল তখন ছোকরা। ছোটকর্ত্তা ডেকে বলতেন, লে বেটা, পেসাদ লে। একটান টেনে রূপলাল তিনদিন প'ড়ে ছিল নেশার ঘোরে। সে আবার সকৌতুকে নির্বোধের মত হাসিল, হেঁ-হেঁ-হেঁ। হেঁ-হেঁ-হেঁ। যেন মনশ্চক্ষে সে দৃশ্য তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিয়াছে।

হাসি থামাইয়া সহসা সে গদ্‌গদ হইয়া উঠিল, বলিল, মহাশয় লোক ছিলেন ছোটকর্ত্তাবাবু। তিনিই ছিলেন বাবুদের মেনেজার। তাঁর হাতেই ছিল সব। রূপলালের দুধের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন তিনি রোজ এক পো ক'রে, ঠাকুরদের পেসাদী দুধ। তারপর আরম্ভ করলে দুধ চুরি ক'রে খেতে। চাষবাড়ি থেকে—

তরুণ সন্ন্যাসী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, তুমি কি জান হে বাপু?

প্রৌঢ় এবার হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল, বলিল, জানি জানি, সব জানি। চাষবাড়ি থেকে দুধ আনবার পথে পোঁ পোঁ ক'রে মেরে দিত আধ সের তিন পো। তারপর ঝরনার জল মিশিয়ে—। হা-হা করিয়া হাসিয়া সে আবার গড়াইয়া পড়িল। অকস্মাৎ হাসি থামাইয়া বলিল, ধরেছিলাম আমি একদিন রূপলালকে। তা—রূপলাল কি করবে বলো? ছোটকর্ত্তাবাবুর বরাদ্দ বাবুরা সব বন্ধ ক'রে দিলে। তখন আবার গাঁজার ওপর আফিম, মদ দুই ধরেছে রূপলাল। রামবাবু ধরিয়েছিলেন আফিম, রামবাবুর ছেলে ধরিয়েছিল মদ। তা একটু দুধ না হ'লে—

বাধা দিয়া তরুণ সন্ন্যাসী বলিল, দুধ চুরি ক'রে থাক, রূপলাল ভাল লোক ছিল।

প্রৌঢ় বলিল, শুধু দুধ? রূপলাল ঘোড়ার দানাও চুরি করত। তা বাবুদের বউরা কিছু বলত না, বলত নিক, দু-চারমুঠো ছোলাই তো!

তরুণ কঠিন হাসি হাসিয়া বলিল, বলবে কি? বলবে কি বউয়েরা? বউরা বলতে গেলে, বউদের কীর্তিও যে রূপলাল ব'লে দেবে ব'লে শাসাত। বউরা যে দোকান থেকে সন্দেশ আনিয়ে খেত গুবগুব ক'রে।

প্রৌঢ় কিন্তু হাসিতেছিল। সে হাসি তাহার অকস্মাৎ স্তব্ধ হইয়া গেল, তরুণ সন্ন্যাসীর চোখে চোখ পড়িতেই প্রৌঢ় দেখিল, চোখ তাহার ঝক্‌মক করিয়া যেন জ্বলিতেছে। তাহার ভ্রূ দুইটি কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, সে প্রশ্ন করিল, কি?

খপ্ করিয়া প্রৌঢ়ের হাত ধরিয়া যুবক সন্ন্যাসী বলিল, তুমি এতসব জানলে কি ক'রে?

প্রৌঢ়ের দৃষ্টি ভয়াবহ হইয়া উঠিল, বলিল, জানিস আমি কে?

—কে ?

—হেঁ-হেঁ-হেঁ। অঘোরপন্থী। আমি মড়ার মাংস খাই। আমার বয়স কত জানিস ?

—কত ?

—দেড়শ বছর। আমি কত্তাবাবুকে যখন দেখেছি, তখনও আমি এমনই। এখনও আমি এমনই। হেঁ-হেঁ-হেঁ।

নিমেষহীন দৃষ্টিতে প্রৌঢ়ের দিকে চাহিয়া তরুণ সন্ন্যাসী বসিয়া রহিল। আপনার চামড়ার বালিশটি টানিয়া লইয়া তাহার উপর আরাম করিয়া বসিয়া প্রৌঢ় আবার হাসিতে আরম্ভ করিল, আমি সব জানি। কোথা কি হচ্ছে, তুই কি ভাবছিস, সব আমি জানতে পারি। চাষবাড়ি থেকে দুধ আনা ছাড়িয়ে দিলে রূপলাল দুধ খেত কি ক'রে জানিস ? দুধের কড়াতে সরের ভিতর লম্বা একটা খড়ের নল পুরে দিত, হেঁ-হেঁ-হেঁ। বাস্ কে ধরবে ধরুক।

তরুণ সন্ন্যাসী বলিল, রূপলালের শুধু নিন্দেই করছ তুমি! অনেক গুণও ছিল তার! ছাই জানো তুমি!

—হেঁ-হেঁ-হেঁ। ছাই জানি আমি ? তবে বলব, রূপলালের চাকরি কি ক'রে গেল ? শুনবি ? রসগোল্লা চুষে রস খেয়ে জলে চুবিয়ে নিয়ে এসেছিল, তাতেই তো চাকরি গেল রূপলালের। সব জানি আমি।

তরুণ সন্ন্যাসী বলিল, তারপরে ?

—তারপর আবার কি ? রূপলাল পালিয়ে গেল।

—ছাই জানো তুমি। খুঁটিতে বেঁধে জুতো পেটা করেছিল তাকে। লঘু পাপে গুরুদণ্ড। রূপলালকে খুঁটিতে বেঁধে রেখেছিল আর এক পাটি জুতো সেখানে রেখেছিল। যে পথ দিয়ে যাচ্ছিল, তাকেই ডেকে বলে, মার এক জুতো। তাহার চোখে হিংস্র দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল।

প্রৌঢ় সন্ন্যাসী কোন উত্তর দিল না। এ লোকটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর সেই নির্বোধ হাসি হাসিয়া বলিল, রূপলাল মারের দাম তুলে নিয়েছিল, তিনটে ঘড়ি ভেঙ্গে দিয়েছিল ঢুই ঢাই ক'রে। একটা সোনার চেন—

—মাইনে দিলে না কেনে, তাই মায় সুদ উসুল ক'রে নিলে রূপলাল। তরুণ প্রতিবাদ করিয়া উঠিল।

প্রৌঢ় হাসিয়া উঠিল, হেঁ-হেঁ-হেঁ। সে খানিকটা গাঁজা বাহির করিয়া যুবক সন্ন্যাসীর হাতে দিয়া বলিল, লে তৈরি কর।

দুইজনেই স্তব্ধ ; এতক্ষণে অরণ্যের রহস্যময় শব্দরূপ তাহাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া উঠিল। লক্ষ লক্ষ ঝিঁঝির ঝিল্লি, ছোট পেঁচার কুঁক কুঁক শব্দ, বড় পেঁচার কর্কশ ধ্বনি, বাচ্চাগুলার অস্ফুট ভাষা—ঠিক শিসের শব্দ, কলহরত শৃগালের ডাক, সরীসৃপের বুকে হাঁটার পত্রমর্মর-শব্দ, দ্রুত-ধাবমান চতুষ্পদের পদধ্বনি, সকলের উপরে সুদীর্ঘ গাছগুলির মাথার উপর পুরাতন শোকের বিলাপধ্বনির মত শকুনের ডাক, রবহীন মূকের হাসির মত বাদুড়ের পাখার শব্দসমন্বয়ে স্থানটি তন্ত্রোক্ত মায়াপুরীর মতই রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে। গাঁজা টানিয়া প্রৌঢ় হাসিল, সেই হাসি—হেঁ-হেঁ হেঁ। বলে, এখানে দানাদত্যি নাচে, ভৈরবনাথ ত্রিশূল হাতে ঘুরে বেড়ায়, মা কালী মড়ার মাথা নিয়ে ভাঁটা খেলে। হেঁ-হেঁ-হেঁ। মিছে কথা—সব মিছে কথা।

যুবক সন্ন্যাসী শিহরিয়া উঠিল, বলিল, উঁহু, ভূত মিছে নয়। জেলখানায় ফাঁসির আসামী যে ঘরে থাকে, সেই ঘরে—। অকস্মাৎ সে আর্তনাদ করিয়া উঠিল, বাপ রে ; থর থর করিয়া সে কাঁপিতেছিল।

প্রৌঢ় তাহাকে ধরিয়া হাসিল, হেঁ-হেঁ-হেঁ। ভয় লাগছে ? হেঁ-হেঁ-হেঁ।

অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া যুবক বলিল, খু-ব করুণ সুরে উঁ-উঁ ক'রে কাঁদে। ফোঁস ফোঁস ক'রে ফোঁপায়। ঠিক রাত্রি দুপুর থেকে রাত চারটে পর্যন্ত।

—কাঁদে ? ফোঁপায় ?

—হ্যাঁ। উঃ, সে যে কি দুঃখ তার ! যুবক আবার শিহরিয়া উঠিল।

প্রৌঢ় এবার ঝুলি-ঝাপটা হইতে একটি বোতল বাহির করিয়া বলিল, তোর পাত্তর আছে ? নিয়ে আয়। নিজে একটা নারিকেল খোলা বাহির করিল।

যুবক ধুনি হইতে একটা জ্বলন্ত কাঠ লইয়া ওদিকে অগ্রসর হইল, বলিল, সে শালা আবার কোথা আছে—

প্রৌঢ় হাসিয়া বলিল, দূ-র বেটা। বাসুকির ফণার ওপর থেকে সাপের ভয় ? হেঁ-হেঁ-হেঁ।

পাত্র আনিয়া রাখিতেই প্রৌঢ় খানিকটা মদ তাহাতে ঢালিয়া দিল, নিজের পাত্র তুলিয়া লইল।

যুবক আশ্চর্য হইয়া বলিল, সাধন-ভজন করবে না? নিবেদন করবে না?

—ধে-ৎ! নিবেদন! নিবেদন ক'রে কি হবে রে? খেয়ে লে। পেটে গেলেই কাজ করবে। হেঁ-হেঁ-হেঁ।

যুবক বলিল, রামবাবু থাকলে কিন্তু রূপলালের এমন দুর্দশা হ'ত না। ভারি ভালবাসত, রামবাবু কখনও রূপলাল বলত না, বলত—লালরূপ। রূপলালও বাবুকে ভারি ভক্তি করত। বাবুর দুধে সে কখনও মুখ দিত না। বাবু ডাকত—লাল-রূ-প! না, হোজোর! জোড়হাত ক'রে রূপলাল দাঁড়াত। বাবুর অসুখ হ'লে লালরূপকে না হ'লে চলত না। অহরহ লালরূপকে চাই, টেপ্‌ বেটা, পা টেপ্‌। সমস্ত রাত ব'সে ব'সে বাতাস করত। ঝুড়ি ঝুড়ি ময়লা, মেথরের মত রূপলাল ফেলত। বাবু বলত, তুই বেটা, আমার ছেলে ছিলি রে আর জন্মে।

প্রৌঢ় হাসিয়া বলিল, জানি রে জানি, একটুকুন অসুখ হ'লেই বাবুর পেট খারাপ হ'ত যে। হেঁ-হেঁ হেঁ।

তরুণ সন্ন্যাসী উদাসকণ্ঠে বলিল, গিন্নীরা সব প'ড়ে প'ড়ে ঘুমোত, ছেলেরা ঘুমোত। রূপলাল সারারাত জেগে ব'সে থাকত। টাকাকড়ি, বোতাম, ঘড়ি সবসুদ্ধ জামা বাবু রূপলালের হাতে দিত; একটি আধলা কখনও যায় নাই।

প্রৌঢ় হাসিল, সেই নির্বোধের হাসি—হেঁ-হেঁ-হেঁ। তারপর বলিল, ওই দুধ মিষ্টি, ওতেই ছিল রূপলালের যত লোভ। লোভের জিনিস কিনা! হেঁ-হেঁ-হেঁ। আর বাবুদের বাড়িতে একজনা ঝি ছিল, জানতে তাকে? কামিনী, কামিনী তার নাম। সে-ই রূপলালের ছিল সব। রূপলালই তাকে বাবুদের বাড়িতে এনেছিল। একটি ছেলে ছিল কামিনীর। ভারি সুন্দর ছেলে—

—কাত্তিক? তরুণ নেশায় আড়ষ্ট চোখ বিস্ফারিত করিয়া সজাগ হইয়া বসিল।

—হ্যাঁ, কাত্তিক।

যুবক বলিল, হ্যাঁ, সেই কাত্তিককে রূপলাল দিত কিনা দুধ সন্দেশ। লুকিয়ে লুকিয়ে দিত তাকে। কাত্তিক রামবাবুর নাতিকে কোলে নিয়ে থাকত। বাবুদের থিয়েটারে সে রাধা সাজত। প্রৌঢ়ের মুখের দিকে চাহিয়া সে হাসিয়া বলিল, আমরা সব খেলা করতাম কাত্তিকের সঙ্গে। ভারি ভাব ছিল।

প্রৌঢ় হাসিয়া বলিল, জানো, কাত্তিক যখন ছোট ছিল, তখন রূপলাল তাকে

। করত। কামিনী কাজ ; রূপলাল তাকে ঘুম পাড়াত। । কাত্তিক আবার বলত, বাবা, তোমাকে আদর করি! রূপলাল বলত, কর কেনে। কাত্তিক বলত, তোর চোখে খুঁচে দি! বলিয়া প্রৌঢ় গমকে গমকে হাসিতে লাগিল। সে আবার নিজের পাত্র পূর্ণ করিয়া সঙ্গীর পাত্রও পূর্ণ করিয়া দিল।

অকস্মাৎ শৃগালের সমবেত উচ্চধ্বনিতে পেঁচার দীর্ঘ কর্কশ রবে বনভূমি মুখর চকিত হইয়া উঠিল, বাসায় বাসায় পক্ষবিধুনন ও দলে দলে উড়ন্ত বাদুড়ের পাখার শব্দে নিশীথিনী যেন উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। আকাশ হইতে দুই-এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।

তরুণ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, কিন্তু যাবার সময় রূপলাল একবার দেখাও করলে না কাত্তিকের সঙ্গে।

প্রৌঢ় বলিল, জুতো খেয়ে রূপলালের ভারি লজ্জা হয়েছিল, তাই কামিনীর সঙ্গে, কাত্তিকের সঙ্গে দেখা করতেই পারে নাই। পালিয়ে গিয়েছিল। তা নইলে—

যুবক একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, কাত্তিক ভারি কেঁদেছিল কিন্তু। খু—ব কেঁদেছিল।

প্রৌঢ় বলিল, তার পরেও রূপলাল একদিন গিয়েছিল, লুকিয়ে কামিনী-কাত্তিকের সঙ্গে দেখা করতে। তা ভাবলে, দেখলে তো তারা সঙ্গ ছাড়বে না। রূপলালের কি-ই বা ছিল যে, তাদের খাওয়াত, বলো? তাতেই আর—

রূঢ় স্বরে যুবক বলিল, রূপলালও যা খেত তারাও তাই খেত। না হয় উপোস ক'রেই থাকত। কাত্তিক তো বাঁচত তা হ'লে!

—কাত্তিক ম'রে গিয়েছে?

যুবক চুপ করিয়া উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

প্রৌঢ় বলিল, বাবুর নাতি যে রূপলালকে দেখে 'রূপলাল রূপলাল' ব'লে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে এল। রূপলাল ছুটে পালাল। ধরলে তো ছাড়ত না বেটা বাবুরা, ধ'রে পুলিসে দিত চুরির জন্যে। খানিকটা দূরে গিয়ে রূপলাল দেখলে, ছেলেটা নেই! তার পরই দেখলে, ছেলেটা পুকুরের জলে প'ড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। রূপলাল ছুটে যাচ্ছিল তুলতে, কিন্তু দারোয়ানটা তার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। সে কোথা কাছেই ছিল। পাছে দেখতে পায়, এই ভয়ে রূপলাল পালিয়ে গেল, দেশ-দেশান্তর কত জায়গা ঘুরে চ'লে গেল হিমালয়। আর দেখা হয় নি আমার সঙ্গে।

যুবক বলিল, দারোয়ান কেনে তুলবে? ছেলে ম'রে ভেসে উঠেছিল। কাত্তিক তখন খোকাকে ছেড়ে গাছের ছায়াতে একটা ছুঁড়ী ঝিয়ের সঙ্গে হাসি মস্করা করছিল।

প্রৌঢ় দাঁত খিঁচাইয়া উঠিল, ভাগ বেটা, তুই কিছুই জানিস না। কাত্তিক খুব ভাল ছেলে।

তরুণ এবার হাসিয়া উঠিল, বলিল, বাপ জিন্দে বেটা, কাত্তিক তখন উড়তে শিখেছে। ছুঁড়ী ঝিটার সঙ্গে তখন খুব ম'জে গিয়েছে।

প্রৌঢ় শাসন করিয়া উঠিল, অ্যাই!

যুবক গ্রাহ্য করিল না, হাসিল, তুমি জানো না, এখন শোনো। অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া সে বলিল, মেয়েটা চ'লে গেলে কাত্তিক এসে খোকাকে খুঁজে না পেয়ে ভয়ে পালিয়ে গেল। বিকেলে ছেলে ভেসে উঠল জলে। গায়ে একখানি গয়না নাই। লোক বললে, কাত্তিকই জলে ডুবিয়ে মেরেছে গয়নার লোভে। পুলিস ধ'রে নিয়ে গেল কাত্তিককে। কাত্তিকের ফাঁসির হুকুম হয়ে গেল। কথা শেষ করিয়া সে মদের বোতলটি টানিয়া লইল।

প্রৌঢ় বাঘের মত ঝাঁপ দিয়া বোতলটা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া আছাড় মারিয়া সেটাকে চূর্ণ করিয়া দিল। উগ্র সুরার গন্ধ ধুনির ধোঁয়ার সঙ্গে মিশিয়া বায়ুস্তর ভারী করিয়া তুলিল। যুবক অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। প্রৌঢ় উঠিয়া তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে ঠেলিয়া নিচে ফেলিয়া দিল, শালা, মদ খেতে এসেছে, গাঁজা খেতে এসেছে? নিকালো শালা। বেরোও বলছি।

যুবক অকারণে অতর্কিতে মার খাইয়া ভীষণ ক্রোধে উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রৌঢ় তখন চিমটা লইয়া উঠিয়াছে। যুবক আর সাহস করিল না, নাট-মন্দিরের বিষ-নিঃশ্বাস স্মরণ করিয়াও সে অন্ধকারে অন্ধকারে ভোগ-মন্দিরের দাওয়ায় গিয়া বসিল।

দুইজনেই স্তব্ধ। ধুনির অগ্নিশিখা নিবিয়া গিয়াছে, আর ফুঁ দেওয়া হয় নাই। জলন্ত অঙ্গারের উপর ভস্মের আবরণ পড়িয়াছে। নিরন্ধ্র অন্ধকার। মৃদু ধারার বর্ষণ এখন ঘন হইয়া উঠিয়াছে। লক্ষ লক্ষ ঝিল্লির অবিরাম ধ্বনি—রাত্রির চরণের নূপুরধ্বনির মত বাজিতেছে, রাত্রি চলিতেছে। কেবল একটা পেঁচার অস্পষ্ট অথচ উচ্চ স্যাঁ—স—স্যাঁ—স শব্দ গুপ্ত অস্ত্রের মত অন্ধকার রাত্রির স্তব্ধতা চিরিয়া চিরিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

প্রৌঢ় আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। আকাশ নাই, মেঘের অস্তিত্বও দেখা যায় না, দেখা যায় শুধু অন্ধকার।

মুহূর্তের পর মুহূর্ত বহিয়া চলিয়াছিল, অরণ্যের বহু এবং বিচিত্র ধ্বনি তেমনই ধ্বনিত হইয়া চলিয়াছে। তৃতীয় প্রহর-শেষে আবার একবার ধ্বনি উচ্চ হইয়া উঠিল; কিছুক্ষণ পরেই ডাকিয়া উঠিল পাখি। ঘন মসীলিপ্ত আকাশেও আলোর দীপ্তি দেখা দিয়াছে। অরণ্যের মায়াপুরী স্তব্ধ হইয়া আসিল। এখন চারিদিক বেশ দেখা যায়।

যুবক সন্ন্যাসী দেখিল, প্রৌঢ়ের মুখে চোখে অদ্ভুত পরিবর্তন, লোকটা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে, যেন আর কখনও কথা বলিবে না।

যুবক আপনার জিনিসপত্র গুটাইয়া লইয়া উঠিয়া যাইতে যাইতে একবার দাঁড়াইল, বলিল, যাবে না?

প্রৌঢ় স্তব্ধ হইয়া যেমন বসিয়াছিল, তেমনই বসিয়া রহিল; কোনও উত্তর না পাইয়া যুবক পথে পা বাড়াইল। সহসা প্রৌঢ় ধরা গলায় ডাকিল, শোন।

—কি?

—কামিনীর খবর জানিস? কামিনী?

—কাত্তিকের মা?

—হ্যাঁ।

—সে—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া যুবক বলিল, ছেলের ফাঁসির হুকুম শুনে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।

প্রৌঢ় অঘোরপন্থী দীর্ঘায়ু সাধু বোধ হয় সংবাদটা জানিত, সে কোন বিস্ময় প্রকাশ করিল না, কেবল বিমূঢ়ের মত বার কয়েক সম্মতি জানানোর ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়িয়া বোধ হয় জানাইল, হাঁ হাঁ, ঠিক-ঠিক মনে ছিল না, মনে পড়িয়া গিয়াছে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, মা বেটা দুজনের ফাঁসি হয়ে গেল। আবার সে ঘাড় নাড়িতে লাগিল। অকস্মাৎ সে হাসিয়া উঠিল, হেঁ-হেঁ-হেঁ। রূপলালেরও ফাঁসি হবে।

যুবক সন্ন্যাসী বলিল, তুমি খানিকটা ক্ষ্যাপাও বটে। কাত্তিকের ফাঁসি কেন হবে? জজ কাত্তিকের ফাঁসির হুকুম দিয়েছিল, কিন্তু অল্প বয়স ব'লে লাটসাহেব ফাঁসির বদলে দ্বীপান্তর পাঠিয়ে দিয়েছিল।

—ফাঁসি হয় নাই?

—না।

যুবকের মুখের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিতে থাকিতে প্রৌঢ় সেই নির্বোধ বিনীত হাসি হাসিল। তারপর সাদরে আহ্বান জানাইয়া বলিল, ব'স, গাঁজা খা। হেঁ-হেঁ-হেঁ! পেভাতী ভাতি শুতি, পেভাতে পেভাতী, ভাতের পর ভাতি, শোবার সময় শুতি। হেঁ-হেঁ-হেঁ। পেভাতীটা হয়ে যাক।

যুবক বসিল। গাঁজা তৈয়ারি করিয়া নিজে টানিয়া যুবকের হাতে দিয়া বলিল, খা। কষিয়া টান মারিয়া যুবক দম ধরিয়া বসিল। কল্কেটি হাতে লইয়া প্রৌঢ় বলিল, দ্বীপান্তর সে কোথা বটে?

চোখ বিস্ফারিত করিয়া যুবক বলিল, আ—ন্দা—মান। সমুদ্দুরের ভেতর দ্বীপ। জাহাজে ক'রে যেতে হয়।

—হ্যাঁ?

—হ্যাঁ।

প্রৌঢ় কল্কেতে টান দিল। যুবক এবার বলিল, আচ্ছা, রূপলাল হিমালয়ে আছে বলছিলে! তা—

প্রৌঢ় ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, কোন্ গুহাতে-মুহাতে থাকে, কে জানে! হাজার হাজার গুহা তো সেখানে।

যুবক কল্কেতে আবার টান মারিয়া কল্কেটি উপুড় করিয়া দিল। আর নাই। ঝুলির মধ্যে কল্কেটি পুরিয়া প্রৌঢ় উঠিল, সঙ্গে যুবকও উঠিল।

বিদায়সম্ভাষণ-ব্যঞ্জক হাসি হাসিয়া যুবক বলিল, আচ্ছা।

প্রৌঢ়ও সেই নির্বোধ হাসি হাসিল, হেঁ-হেঁ-হেঁ। আচ্ছা।

দুইজনে দুই বিপরীত মুখে পথ ধরিল। যুবক উত্তর মুখে—উত্তর দিকে হিমালয়, প্রকাণ্ড পাহাড়, তাহাতে হাজার গুহা। দেড়শ বছর বয়সের অঘোরপন্থী বলিয়াছেন, হাজার হাজার গুহা সেখানে। তাহার মধ্যে—কোথায় লুকাইয়া আছে একটি মানুষ!

প্রৌঢ় চলিল, দক্ষিণ মুখে—দক্ষিণ দিকে নাকি সমুদ্র। সেই সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপ আন্দামান। কূলে পৌঁছিতে পারিলে দাঁড়াইয়া হয়তো দেখা যাবে। নয়তো নৌকা-টৌকাও ত যায় আসে। অন্ততঃ এ-দিকের তীরে দাঁড়াইয়া ওপারের মানুষকেও ত দেখা যাইবে। কয়েদীর দলের মধ্যে ছোট একটি ছেলে।

ইমারত

শিবপ্রতিষ্ঠা করছেন শ্যামাদাসবাবু। লোকের কাছে পরম বিস্ময়ের কথা। কৃপণ লোক; কার্পণ্যের তপস্যায় তাঁর পিতামাতাও নাকি মুদ্রাত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। লোকে বলে এক পয়সা মা-বাপ শ্যামাদাসবাবুর। তাঁর টাকাও গল্পের টাকা। গল্পের বস্তু অল্প হয় না—কেউ বলে লাখ—কেউ বলে দু'লাখ—কেউ বলে লোকটা যত বড়—টাকার স্তূপটিও তত বড়। তাঁর সিন্দুকের সর্বশেষ স্তরের যে টাকাগুলি সেগুলি ওজনে ঠিক থাকলেও আকারে ঠিক নাই, উপরের টাকার রাশির ভারের চাপে চেপ্টে বড় হয়ে গিয়েছে এবং চেহারাতেও কালো হয়ে গিয়েছে, ছাতা ধরেছে। অনেকে বলে—সেগুলি অচল; কেন না সরকার নোটিস দিয়ে ঘোষণা করেছেন মহারানী ভিক্টোরিয়ার প্রথম আমলের টাকা—যেগুলিতে মুকুটহীন রানীর মূর্তি মুদ্রিত—সেগুলি অচলিত হয়ে গেল। একটি সময়ও তাঁরা দিয়েছিলেন, এই টাকা স্থানীয় রাজকোষে দিয়ে তার পরিবর্তে নতুন টাকা বদল নেবার জন্য। কিন্তু শ্যামাদাসবাবুর স্বভাবই অন্য রকমের, সিন্দুকে যা তিনি রাখেন তা আর বা'র করেন না। লোকে বলে—শ্যামাদাসবাবুর ধারণা—বা'র করলেই বাইরের বাতাসে সে উড়ে যাবে। শ্যামাদাসের তৃপ্তি—সঞ্চয়ের তৃপ্তি—সেখানে অচল হ'লেও ক্ষতি নাই—যেহেতু চালাবার প্রশ্নই নাই সেখানে। সেই লোক শিবপ্রতিষ্ঠা করবে এতে লোকের বিস্মিত হবারই কথা।

বিস্ময়ের প্রধান কারণ এবং মূল রসটা আকস্মিকতার মধ্যে নিহিত থাকে। এবং তার বৈচিত্র্য ও মহার্ঘতা অল্পক্ষণ স্থায়িত্বের মধ্যেই আবদ্ধ—ফ্রেমে ঘেরা ছবির মত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তারও ব্যতিক্রম হ'ল।

মন্দিরের উপকরণ যখন এল তখন পাকা ইঁট দেখে লোকের মনে হ'ল,—তাদের কল্পনাকে এটা ছাড়িয়ে গেল। বললে—ইট পাকা হ'লেও কাদা দিয়ে গাঁথবে।

কয়েকদিন পর দেখা গেল—চুন এসেছে, মজুরে সুরকি ভাঙছে। লোকে থমকে দাঁড়াল। গাঁথনি পাকাই হবে তাহ'লে! ছোটখাটো পাকা মন্দির একটি।

বিস্ময় আবার একদফা উৎপাদিত হ'ল—জনাব শেখ রাজমিস্ত্রীকে দেখে। এ অঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ পাকা কারিকর। এবং তার হাতে কাজ কম খরচে হয় না।

মাঝখানে চেরা সিঁথিটা তার ওলংয়ের সুতোয় পাকানো সরু দড়িটির মত সাদা এবং সোজা, বাবরি-কাটা সাদা চুলগুলি পরিপাটি ক'রে আঁচড়ানো কর্ণি দিয়ে মাজা পঙ্কের পলেস্তারার মত চকচক করছে। ঘাড়ের চুলগুলির প্রান্তভাগ সযত্নে কেটে নিচে থেকে ঘাড়টা কামিয়ে ফেলেছে, গোল থামের মাথায় বেড় দেওয়া কার্নিসের বিটের মত—সবচেয়ে পাতলা কর্ণি দিয়ে দড়ি ধ'রে কাটা হয়েছে যেন। গোঁফ এবং গাল কামিয়ে চিবুকের নিচে নূর দাড়িটিও ঠিক এমনি সযত্নে কাটা। ধপ্‌ধপে পরিচ্ছন্ন দাঁতগুলির ফাঁকে কালো মিশির দাগ—পয়েন্টিং করা আসলের মত। চক্‌চকে ছোট একটি হুঁকোতে ইঞ্চি চারেক লম্বা একটি বাঁশের নল লাগিয়ে, ভাল তামাকের মিষ্টি গন্ধে চারিদিকে বেশ একটা নেশার আমেজ ছড়িয়ে জনাব তামাক টানছে আর দীর্ঘ হাতখানির সরু আঙুল দেখিয়ে নির্দেশ দিয়ে কাজ করাচ্ছে। গলায় দু'হালি কালো কারে বেড় দিয়ে বাঁধা একটি পাকা সোনার চৌকা তক্তি। গায়ে চেক-কাটা পরিচ্ছন্ন ফতুয়া, কাঁধে বাহারে রঙের ডোরাকাটা, সযত্নে পাট-করা একখানি গামছা। পরনে ময়ূরকণ্ঠী রঙের লুঙ্গি। পায়ের চটি জোড়াটা এককালে শৌখিন ছিল—এখন কিন্তু পুরানো হয়েছে।

ইটের থাক দেওয়া হচ্ছে। মজুরেরা ইটের উপর ইট সাজিয়ে থাকবন্দী ক'রে রাখছে; যাতে ইট তুলতে সুবিধে হয়, বরবাদ না যায়, এমনকি দু'খানা ইট সরলেই ধরা যায়।

জনাব বলছিল—ই ক'রে রাখ বাপ, হুঁশ ক'রে—হুঁশ ক'রে রাখ। সুঁ-জু সমা-ন ক'রে একটির উপর একটি রেখে যা বাপ। গাঁথনি করা ইমারতের নতুন বাহার দিবে। বেটাল হয়ে ট'লে প'ড়ে যাবে না—এই দেখ। সর। দেখে লে।

সে তাকে সরিয়ে নিজেই ইটের উপর ইট সাজিয়ে রাখতে লাগল—নিপুণ হাতে—অবলীলাক্রমে।—হাঁ। হুঁশ আর হিসাব। আর কাম করবার সময় মনে মনে বলিস না—বাবা রে! মন যখন বলবে—বাবারে, তখুন একবার তামুক খেয়ে লিবি। লে টেনে লে একটান—। খুসবইওয়ালা তামাক।—কাঁধের গামছাখানি দিয়ে হাত দু'খানি থেকে ইটের ধুলো ঝেড়ে নিয়ে কল্কেটি সে মজুরটির হাতে দিলে।

বিস্মিত রামপ্রসাদ জনাবের পিছনের দিকে থমকে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ। এবার জনাব এ দিকে ফিরতেই প্রশ্ন করলে—তুমি এখানে জনাব? ব্যাপার কি বলো তো?

কপালে হাত ঠেকিয়ে অভিবাদন করলে জনাব—সেলাম গো বাবু। শ্যামাদাস বাবুজীর মন্দিল হবে। আমি গাঁথছি।

—তা তো দেখছি। কিন্তু শ্যামাদাসবাবুকে তুমি মেরে ফেলবে নাকি?

জনাব একটু হাসলে। বললে—আজ্ঞে না, অল্প খরচে সেরে দিব—সে বুলেছি আমি বাবুকে।

—তোমার হাতে অল্প খরচে হবে তো?

জনাব হা-হা ক'রে হেসে উঠল। হঠাৎ হাসি থামিয়ে ব'লে উঠল—আঃ হায়—হায়—হায় গো। বলি—উ-কি ইটা ভাঙচিস গো তু? এঁ্যা! নোড়ার মতুন—মোটো—মোটো! এঁ্যা!

সে এগিয়ে গেল লম্বা পা ফেলে।

এদিকে এক জায়গায় জমায়ত হয়ে ব'সে—বেশ যেন মজলিস করার ভঙ্গিতে মজুরনীর দল ছোট হাতুড়ি দিয়ে ইট ভেঙে খোয়া তৈরি করছিল।

বাছাই-করা মজুরনী সব জনাবের। জনাবের নিজের মজুরীও বেশি, ওর মজুরনীদের মজুরীও চড়া। পরিচ্ছন্ন কাপড় আঁট ক'রে বেড় দিয়ে সর্বশেষ উদ্বৃত্ত অংশটুকু কোমরে ফেরতা দিয়ে জড়িয়ে পরেছে, হাতে এক হাত ক'রে কাচের চুড়ি, স্বাস্থ্যবতী তরুণী নিয়ে জনাবের মজুরনীর দল। আরও একটা বিশেষত্ব আছে, সাধারণে না জানলেও মজুরনীরা জানে, তরুণী হ'লেও যদি কেউ বেঁটে আর মোটা হয় তবে তাকে তারাই বারণ ক'রে দেয়—তু বুন যাস না। লেবে না। বুড়ো বলে—ঢ্যাপসা মেয়ে কাম করতে পারে না। লড়ে বসতেই উদের ছ-মাস। তরুণী মেয়েদের মধ্যে আবার যাদের চোখ ডাগর, চুল বেশি—তারাই থাকে জনাবের পাশে; জনাবের হাতে ইট জুগিয়ে দেয়, মসলা ঢেলে দেয় গাঁথনির উপর, ওলং এগিয়ে দেয়, জলের মগ-পাটা দেয় হাতে হাতে, রাজমিস্ত্রীর হুঁকো কল্কে তামাক টিকে রাখে সযত্নে, বরাত মত সেজে দেয়। মধ্যে মধ্যে জনাব ভরা দুপুরের রোদের সময় বলে—লাতবউ, একটা গায়েন কর না ভাই! বেশ মিহি গলায়, তু গাইবি—আমি আর লাতিন শুনব। হ্যা।

মিহি কাজের সময় মধ্যে মধ্যে কাজ বন্ধ ক'রে ঘাড়টা একটু পিছনের দিকে হেলিয়ে দেখতে দেখতে বলে—দেখ ত ভাই লাতনী লাতবউ তুদের ডাগর চোখে, দেখ ত এক লজর। বল দেখিনি কুথা কি খারাপ লাগছে?

অন্য সব মজুরনীরা সব দিদি। বড়দিদি, মেজদিদি থেকে ছোটদিদি পর্যন্ত। আগেকার কালে যারা পাশে থাকত তাদের কেউ ছিল ঠাকুর-ঝি, কেউ ছিল ভাবী। দু'চারজনকে বউ বলেও ডাকত। তাদের দু'জন প্রৌঢ়া এখনও আছে জনাবের দলে। তারা সর্দারনী। দেখাশুনা করে মজুরনীদের কাজ। নিজেরাও করে টুকিটাকি এটা ওটা। এরাই আড়কাটির মত সংগ্রহ ক'রে আনে নতুন মজুরনী। আনলে জনাব খুশি হয়; সংগ্রহকারিণী প্রৌঢ়া দিনকয়েকের জন্য জনাবের কাছে পুরানো কালের সমাদরের খানিকটা যেন ফিরে পায়।

জনাব এগিয়ে গেল, মজুরনীদের খোয়া ভাঙ্গার জায়গায়। নতুন একটি মজুরনী খোয়া ভাঙছে—খোয়াগুলি ঠিক ভাঙা হচ্ছে না, অনভ্যস্ত হাতের হাতুড়ির আঘাতে কতক হচ্ছে বড় বড়, বাকী খানিকটা ভেঙ্গে গুড়ো হয়ে যাচ্ছে, কতক হচ্ছে নেহাত ছোট যা দিয়ে কোন কাজ হবে না।

জনাব তার হাত থেকে হাতুড়ি নিয়ে ভাঙ্গার কৌশলটা দেখিয়ে দিলে—এই দেখ্—এই দেখ্, চোখ দুটি ত বড় বড়, লজর ক'রে দেখ। বেশি মোটোও হবে না—বিচি বিচি ছুটুও হবে না; বেশি জোরে হাতুড়ি মারবি না, আবার আস্তে ঠুকুস্ ঠুকুস্ ক'রে মারলেও হবে না। এক তালে ঘা; হ্যাঁ—এই দেখ্—এই দেখ্!

শ্যামাদাসবাবু এসে দাঁড়ালেন। খাটো মানুষটি, গৌরবর্ণ রঙ, পাকা চুল, চঞ্চল প্রকৃতি ছেলের মত অস্থির লোক। বারকয়েক এদিক থেকে ওদিক ঘুরে বেড়ালেন, তারপর এসে দাঁড়ালেন মজুরনীদের খোয়া ভাঙ্গার জায়গায়—জনাবের কাছে। দাঁড়িয়েও তিনি স্থির থাকতে পারেন না—অনবরত দোলেন। হাতের আঙুলগুলি অহরহ সক্রিয়, অঙ্গুষ্ঠের নখ দিয়ে মধ্যমার নখটা অবিরাম খুঁটে চলেছেন। লোকে বলে টাকা বাজিয়ে ঐ অভ্যাসটা হয়েছে তাঁর। শ্যামাদাসবাবু বললেন—জনাব! এঁকে বলে—এই ছুঁড়ীগুলোকে লাগালে কেন হে?

জনাব হাসলে, বললে—জোয়ানী বয়েস না হ'লে কাজ হবে কেনে হুজুর? খাটবে কে? তা ছাড়া পাতলা হাত ওদের এখুন—হাল্কা পা—হাল্কা শরীল, হাঁটবে বন বন ক'রে, ভারায় উঠবে থর থর ক'রে।

শ্যামাদাস বললেন—না—না—না, হারামজাদীরা ভারি পাজী। ক্রমাগত ফ্যাক ফ্যাক ক'রে হাসবে। মজুরগুলো কাজ করবে না, ফষ্টি নষ্টি করবে। ভাগাও—ওগুলোকে তাড়িয়ে দাও।

জনাব বললে—আপুনি যান ইখান থেকে হুজুর। আমি রইলাম—আপনার কাম রইল। বরবাদ হয় আমাকে ফজিয়ৎ করবেন। আমি জবাবদিহি করব।

একটু চুপ ক'রে থেকে শ্যামাদাস বললেন—এই মাঝারি একটি মন্দির হবে। বেশি ছোটও না হয়, বেশি বড়ও না হয়। বুঝেছ ত? আবারও একটু চুপ ক'রে থেকে তিনি বললেন—লোকে বলছে, তুমি লাগলে আর থামো না।

জনাব হাসলে; বললে—ইমারত আপনার, আমার লয়—আমার বাবার লয়। আপুনি যেমন হুকুম করবেন তেমনি হবে। পাঁচ হাত বুলেন পাঁচ হাত; দশ হাত বুলেন দশ হাত। আবার বুলেন এক শ হাত দেড় শ ফুট তাই হবে। একটা হিসাব ত আছে। যেমন ভিত করবেন তেমনি মন্দির হবে। আবার মাঝখানে বুলেন থেমে যাও জনাব, তাই হবে! কর্ণি পাটা নিয়ে চ'লে যাব বাড়ি।

শ্যামাদাস উত্তর খুঁজে পেলেন না এর। নিরুত্তর হয়ে চঞ্চলভাবেই চ'লে গেলেন সেখান থেকে।

* * * *

মন্দির উঠছে।

লোকে যেতে যেতে দেখে পথে দাঁড়ায় সবিস্ময়ে। মন্দির ত ছোট হবে না!

ভারা বাঁধা হয়েছে, একখানা বাঁশের দৈর্ঘ্য ছাড়িয়েছে—প্রথম বাঁশের মাথায় আবার নতুন বাঁশ বাঁধা হয়েছে, তারও দুটো থাক ছাড়িয়ে তৃতীয় থাকে তক্তা পেতে জনাব কাজ ক'রে যাচ্ছে। পাশে দুটি তরুণী—কাহারদের বউ মতিবালা, আর হাড়ীদের মেয়ে দাসী! জনাবের বিপরীত দিকে আর একটা ভারায় দু'জন রাজ কাজ করছে—আব্দুল আর রসিদ।

শ্যামাদাসবাবু নিচে এসে কখন দাঁড়িয়েছেন। লোকের কথাই সত্য। জনাব সহজে থামবে না। এখনও চারখানা দেওয়াল সোজা উঠে যাচ্ছে। কাটান দিয়ে এখনও একখানা ইটও গাঁথা হয় নাই। সুতরাং কত উঁচুতে যে মন্দিরের চূড়া গিয়ে ঠেকবে সে বুঝতে পারা যাচ্ছে না। তার উপর কাজ অগ্রসর হচ্ছে যেন শামুক

চলছে। জনাবকে দোষ দেওয়া যায় না, সে কাজ ক'রে যায় ঠিক, কিন্তু ওই যে তুটো রাজমিস্ত্রী ওরা ক্রমাগত বিড়ি খাচ্ছে। বিশেষ ক'রে সবচেয়ে অল্প-বয়সীটা। শুধু বিড়ি খাওয়াই নয়—অল্পবয়সী মজুরনীগুলোর সঙ্গে হাসাহাসির আর বিরাম নাই। তিনি ডাকলেন—জনাব!

জনাব নিচে তাকিয়ে বললে—আজ কাটান দিব হুজুর।

—তা বেশ। কিন্তু একে বলে—ঐ ছোকরা রাজমিস্ত্রীটাকে কাজ করতে বলো।

জনাব ছোকরার দিকে দৃষ্টি ফেরালে। জনাবের মনে আছে আজ ও কোন্‌খান থেকে ইট গাঁথতে শুরু করেছে। কত ফুট গেঁথেছে সে-ও সে মাপ না ক'রে একবার নজর দিলেই বুঝতে পারে। তার ভুরু কুঁচকে উঠল। সত্যিই ছোকরার কাজ মোটেই এগোয় নাই।

সে বললে—কি রে? তু কি ভেবেছিস বুলত? মতলব কি রে তুর?

ছোকরা ব্যস্তভাবে কাজ করতে আরম্ভ করলে—কোন উত্তর দিলে না।

জনাব বললে—দেখ, একটি বাত তুকে বুলি শুনে রাখ। এই টাকা বড় খারাপ চিজ। চাঁদি লয় পারা। পারাকে পুড়ায়ে ভসম্‌ লিয়ে খা—সি তখুন ওষুধ। কাঁচা খা—গায়ে ফুটে নিকলে যাবে।

একখানা ইট হাতে নিয়ে তার উপর কর্ণির ঘা দিতে দিতে আবার বললে—পরের ষোল আনি টাকা, যখুন ষোল আনি কাম ক'রে লিবি, তখুন সি হ'ল পারা ভসম্‌ (ভস্ম)। তাতে যা খাবি সে দিবে তুকে তাগদ। আর ফাঁকি দিয়ে লিবি—তো সি টাকা লয়, সি পারা। তাতে যা খাবি—সে হবে বদহজমী।

রাগ হ'লে জনাবের হাতের কাজের গতি বেড়ে যায়। বাঁ-হাত বাড়িয়ে সে বললে—ইটা লাও বউ! হাঁ। মসলা—জল। লাতিন। আচ্ছা—বাস করো।

খং—খং—খং—খং, ইটার উপর কর্ণির আঘাত কামারশালায় লোহার উপর হাতুড়ির আঘাতের শব্দের মত বাজতে লাগল।

জনাব বললে শ্যামদাসবাবুকে—আপুনি যান বাবু। আজ থেকে আমি ফিতা মেপে হিসাব ক'রে কাম লিব। এই—এই রসিদ! এই হারামজাদী 'শুষনি'! এই!

জনাবের হাঁকে ডাকে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠল, সচকিত হয়ে উঠল সকলে। চালাও চালাও। কাম চালাও। হাঁ।

খস খস শব্দে কর্ণি চলতে লাগল, জল-সপ-সপে চুন-সুরকি-মেশানো মসলার উপর। গাঁথনির ইটের গায়ে পাটা বসিয়ে তার গায়ে হাতুড়ির আঘাত পড়তে লাগল—ঠক—ঠক—ঠক—ঠক!

জনাব আবার কিছুক্ষণের মধ্যে খুশি হয়ে উঠল। হ্যাঁ। এই ত! তারপর সে কাহারদের বউ মতিবালাকে বললে—লে তো ভাই নাতবউ, দুপুরের আমেজে ধর্ ত একখানা মিহি গলায়। ধর্ ত! নাতিন তু ভাই একবার তামাক সাজবি।

মতির বড় বড় চোখ—মাথায় একরাশ রুক্ষ চুলে মস্ত বড় খোঁপা। জনাবের ভারি প্রিয় সে। এরই মধ্যে জনাব তার লজ্জার সংকোচকে অনেকখানি সহজ ক'রে এনেছে। গান গাইতে বললে সে আর সলজ্জভাবে মুখ নামিয়ে মৃদু হেসে নিরুত্তরভাবে ঘাড় নেড়ে অস্বীকৃতি জানায় না। দিব্য গান গেয়ে যায়। এদের লজ্জা সংকোচকে জয় করবার শক্তি এবং দক্ষতা জনাবের অদ্ভুত।

দাসী তামাক সাজতে বসল—মতি মৃদুস্বরে গান ধরলে—

"বাবুদের চি-লে কো-ঠার ছাদে
চিল কাঁদিছে গো ভরা দুপুরে—
চিলি পালায় কোথা বাসা
বেঁধেছে কোন তালপুকুরে।"

জনাব বললে—উঃ, কতকালকার গান! ছেরকাল রেজারা গায়।

দাসী হুঁকো কল্কে এগিয়ে দিলে। জনাব কল্কে খসিয়ে মতির হাতে দিয়ে বললে—লে পেসাদ ক'রে দে ভাই। তু খেয়েছিস তো ভাই নাতিন? তারপর আবার বললে—দে উয়াদিকে এক ছিলম ভাল তামাক দে। লে রে ভাই —খা, খুসবয়ওয়ালা তামুক এক টান খেয়ে—লে জমিয়ে কাম কর্।

আবার বললে, সান্ত্বনার সুরে—দেখ্ তুদের ভালর তরেই বুলি। ষোল বছর বয়সে বাবা কর্ণি হাতে দিয়েছিল, আর ওই কথাটি বুলেছিল আমাকে। বুলেছিল—বাপ্, এই কথাটি মনে রাখিয়ো; আগে ষোল আনি কাম দিবে তার বাদে ষোল আনি টাকাটি লিবে।

কর্ণির আঘাতে একখানা ইট ভেঙে আধখানা নিচে প'ড়ে গেল। জনাব একবার দেখে নিলে নিচেটা। তারপর বললে—জোয়ানী কাল হ'ল খাটবার আর কাম শিখবার কাল। যে শিখবে আখেরে ভাল হবে। নইলে আখের তার ঝরঝরে! ওই তিনকড়ে আর আমি এক সাথে কাম শুরু করেছিলাম। তা দেখ্ কেনে—তিনকড়েকে কেউ ডাকে? গারার (কাদার) গাঁথনি গেঁথেই তার দুনিয়ার বিস্তি কাবার হয়ে গেল।

মতি হেসে বললে—তিনকড়ি মিস্ত্রীর ওপর তোমার ভারি রাগ, লয়?

হা হা ক'রে হেসে উঠল জনাব। তুকে কে বুললে গো সাতবউ?

মতি সলজ্জ কৌতুকে বললে—রঙ্গুকে নিয়ে ঝগড়া আমরা জানি না বুঝি? হাড়ীদের মেয়ে রঙ্গু!

উত্তরে জনাব মতির ডাগর-চোখের সলজ্জ দৃষ্টি নিয়ে রসিকতা ক'রে বসল।

মতি মুখে কাপড় দিয়ে বললে, মরণ!

জনাব বললে—ঠিক তুর মত চোখ আর চুল ছিল রঙ্গুর। তবে তুর চেয়ে অনেক কালো ছিল। তেমন কালোই আর চোখে পড়ল না।

জনাব হঠাৎ ভারার উপর উঠে দাঁড়াল।

বর্ধিষ্ণু গ্রাম। তবে পাকা গাঁথনির ঘরের সংখ্যা কম। দক্ষিণে হরিশবাবুর দোতলা দু'মহলা দালান, মধ্যে শ্যামাদাসবাবুর এবং শ্যামাদাসের ভাইয়ের পাকা বাড়ি। তারপর মাধববাবুর প্রকাণ্ড বাড়ি। তার মধ্যে একখানা তিনতলা। তারই ওধারে রামবাবুদের একতলা দালান। মধ্যে মন্দির। রামবাবুদের পাঁচটা শিবমন্দির পাশাপাশি। ও পাড়ায় দুটো খুব প্রাচীনকালের মন্দির। ওই উত্তর দিকে একটা মন্দির। উত্তর-পশ্চিম কোণে জনাবের পাড়ার মসজিদ। মিনার দুটো সোজা উঠে গিয়েছে।

জনাব বললে—ওই দেখ্ সাতবউ। ওই রামবাবুর একতলা দালান। ওই দালানে আমার হাতে খড়ি। তিনকড়িরও হাতেখড়ি ওই হোথাকেই। রঙ্গু এল খাটতে। আমাদের থেকে রঙ্গু বয়সে বড়। এই তুর মতুন চোখ, দাসীর মতুন চুল, আর সে কি কালো রঙ! দেখে আমি মাতাল হয়ে গেলাম। ইটা দিতে এল রঙ্গু। দিতে গিয়ে ঝুড়ির কিনারাটা হাত থেকে খসে প'ড়ে গেল। রঙ্গু মুচকি হেসে বললে—ফেললে তো! দেখো নিজে প'ড়ে যেয়ো না।

দাসী হেসে বললে—তা বাদে তুমি ত রঙ্গুকে নিয়ে ভাগলে। তিনকড়ির ভয়ে।

—ভাগলাম? জনাবের ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল। সে বললে—তিনকড়ির ভয়ে ভাগি নাই।

* * * *

জনাবের বয়স এখন ষাটের কাছাকাছি। আঠার বৎসর বয়সে হাড়ীদের মেয়ে রঙ্গুকে নিয়ে সে একদিন এখান থেকে পালিয়েছিল। লোকে বলে—তিনকড়ি রাজমিস্ত্রীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে রঙ্গুকে ছিনিয়ে নিয়ে আত্মরক্ষার জন্যই জনাব পালিয়েছিল। জনাবের আত্মসম্মান এতে যেন আহত হয়। সে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। তিনকড়ি? আরে—শরম কি বাত, লজ্জার কথা! মর্কটের মত চেহারা, উল্লুকের মত তরিবত, তার সঙ্গে পিয়ারীর দিল নিয়ে লড়াইয়ে না কি জনাবকে পালিয়ে যেতে হয়! সেকালের জনাবের চেহারা এরা দেখে নাই, তাই এমন কথা বলে।

পালিয়েছিল সে অন্য কারণে। রঙ্গু যদি যেতে রাজী না হ'ত তবু সে পালাত। বাপের সঙ্গে গিয়েছিল সে পাথর চাপড়ীর মেলা। বড় জাগ্রত পীরসাহেব সেখানে। দশ-বিশ হাজার লোক জমায়ত হয় পীরের অর্চনার জন্য। তার অসুখের জন্যই তার বাপ পীর সাহেবের কাছে মান্নত করেছিল। মান্নতের টাকা ধান মোমবাতি তেল নিয়ে সপরিবারে তার বাপ পাথর চাপড়ী গিয়েছিল। পথে কিছু দূরে পড়ে রাজনগর। এককালে নবাব ছিলেন এখানে। সেকালের অনেক ইমারত আছে। পাথর চাপড়ীর ফেরত রাজনগর দেখতে গিয়েছিল তারা।

জনাব অবাক্ হয়ে গেল। জঙ্গলের মধ্যে প্রকাণ্ড এক তিনখিলানি ফটক। আশপাশ সব ভেঙে গিয়েছে, কিন্তু তিনখিলান দাঁড়িয়ে আছে জমাটবন্দী পাথরের মত। কি তার বাহার, কি সব নক্সা! রাজমিস্ত্রীর ছেলে সে—নিজে রাজ-মিস্ত্রীর কাজ শিখছে কিন্তু এ জিনিস সে কল্পনাও করতে পারে নাই কখনও! মনে মনে হাজারো বার, লাখো বার সেলাম জানালে এই ইমারতের ওস্তাদ কারিগরকে। সবিস্ময়ে সে বারবার উচ্চারণ করলে—'শোভান আল্লাহ্!'

ছেলের বিস্ময় দেখে বাপের কৌতুক হ'ল। সে ফিরিবার পথে জেলার সদরের ইমারতগুলো দেখিয়ে নিয়ে এল। হিন্দুদের এক পুরানো মন্দির আছে। সে দেখেও তার তাজ্জব মনে হ'ল।

জনাব চোখে যেন যাদুর সুরমা প'রে ঘরে ফিরল, হাজার সেজের ঝাড়-লণ্ঠনের হাজার-বাতির আলোর জলসা থেকে ফিরে কাঠের পিলসুজের উপর প্রদীপ দেখে যেমন মেজাজ খারাপ হয়ে যায় তেমনি তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। একমাত্র সান্ত্বনাস্থল ছিল রঙ্গু। গ্রামের বাইরে বিশ-পঁচিশটা ঝুরিওয়ালা বটতলায় রাত্রে কেউ যায় না। বলে ভূত আছে ওখানে। জনাবের ওই জায়গাটা খুব ভাল লাগে। বুড়া গাছটার ঘন ছায়ার তলায় কোন গাছ এমন কি ঘাস পর্যন্ত জন্মায় না,—পাকা মেঝের মত তকতক করে, মাথার উপরে ডালে পাতায় ছাউনীটি সুডৌল গোল, যেন ছাদের মত—গম্বুজের মত মনে হয়। মূল কাণ্ডটাকে চারিদিকে ঘিরে বিশ-বাইশটা মোটা ঝুরি নেমে মাটির বুক ফুঁড়ে চ'লে গিয়েছে—বিশ-বাইশটা থামের মত। ছেলেবেলা থেকেই জনাবের এই গাছতলাটিকে বড় ভাল লাগত। এখন শুধু ভালই লাগে না, এখন তার মনে হয় খোদাতায়লার এ এক বাহারে ইমারত। ছেলেবেলায় এসে গাছটার কাছে ব'সে থাকত দিনের বেলা। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহস বাড়ল—তখন বিকেলের দিকে এসে গাছটার তলায় গিয়ে বসত, ঘুরে ফিরে দেখত। রঙ্গুর সঙ্গে পরিচয় যখন প্রেমে পরিণত হ'ল, তখন সেই প্রেমে তার সাহস হয়ে উঠল দুঃসাহস। সন্ধ্যার পর সে এসে এই গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকত একটা মোটা ঝুরিতে ঠেস দিয়ে। ঝুরিটিতে এবং জনাবে যেন এক হয়ে যেত। গাছটার ঝুলে-পড়া ডালে ঝুলিয়ে দিত তার সাদা গামছাখানা। দূর থেকে অন্য লোকে দেখে ভয় পেত, ভাবত সাদা কাপড় প'রে কেউ গাছের ডালে ব'সে দোল খাচ্ছে; রঙ্গু দূর থেকে বুঝতে পারত জনাবের নিশানা। সে নির্ভয়ে চ'লে আসত। রঙ্গুর সঙ্গে যতক্ষণ থাকত ততক্ষণ ছিল তার আনন্দ।

রঙ্গুর কাছে সে গল্প করত রাজনগরের তিনখিলানি ফটকের, সদরের চূড়ার, মন্দিরের, সদরের বড় বড় ইমারতের। এর ওর কাছ থেকে শোনা শহর মুরশিদাবাদের নবাবী আমলের ইমারতের। শহর কলকাত্তায় এক মিনার আছে—নাম বলে মনুমেণ্ট, তলাতে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে তাকালে মাথার টুপি পাগড়ী খ'সে মাটিতে প'ড়ে যায়।

রঙ্গুর শুনতে ভাল লাগে—কিন্তু অবসর হয় না। তারও ঘর-দুয়ার আছে—মা-বাপ-ভাই আছে, স্বামী আছে। রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে যারা মজুরনী খাটে তাদের

সঙ্গে রাজমিস্ত্রীদের অপবাদ রটে, অভিভাবকেরা জানে—অপবাদের মূলে সত্যও আছে ; তবুও নিয়ম হ'ল সবদিক মানিয়ে চলার। সেইটাই ভাল। রাজমিস্ত্রীদেরও এ-বিষয়ে একটা নিয়ম আছে, সেটা তারাও মেনে চলে, গোপন প্রেম যতই প্রবল হোক তারা প্রণয়িনীদের ঘরছাড়া ক'রে নিজের ঘরে আনে না। এতে বদনামী হয় তাদের। ব্যবসার ক্ষতি হয়। লোকে কাজ দিতে চায় না, মজুরনীদের কাজ করতে পাঠাতে চায় না তার কাছে।

অকস্মাৎ একদিন জনাব তাকে বললে—আমার সঙ্গে যাবি ?

—কোথা ? কোলকাতা না মুরশিদাবাদ, না ডিল্লী, না লাহোর ? তুমি ত নিয়ে গেছো আমাকে কত জায়গা ! হাসলে রঙ্গু।

রঙ্গুর হাত চেপে ধরলে জনাব বললে, বললে—না। ইবার আমি পালাব। খোদার কসম। একটু চুপ ক'রে থেকে জনাব বললে—বাপজীকে এত ক'রে বুললাম, তা সি যেতে দিবে না। বুলে, মা-মরা ছেলে আমার তু—তুকে ছেড়ে থাকতে লারব আমি। আর গাঁয়ে মায়ে সমান কথারে বাবা, ইখানেই কাল কেটে যাবে, খেয়ে প'রে কোন রকমে—উ সব খেপামি করিস না।

—তা তো হ'ল। কিন্তু যাবে কোথা ? জায়গাটা শুনি ?

—সাহেবডাঙ্গার কুঠি জানিস ?

—হঁ্যা। রেশম-কুঠি আছে সাহেবদের।

—সেথাকে।

—রেশম-কুঠিতে কি করবা ?

—সিখানে লতুন ক'রে সব ইমারত হবে। পুরানো সব ভেঙ্গে নয়া নয়া কারখানা করছে সাহেবানেরা। মোটা মজুরি। যাবি ?

রঙ্গু এই অল্প বয়সের মধ্যে বহুজনের প্রলোভনে পড়েছে, অর্থ-সামগ্রীও সে অনেক পেয়েছে, কিন্তু তাদের কেউ জনাবের মত নিজেকে দেয় নাই এমনভাবে। ফলে—সব দিক মানিয়ে, ঘর-সংসার এবং জনাব—এই দুইকেই বজায় রেখে মানিয়ে চলা তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠেছে। সে প্রকাশ্যভাবে জনাবকে তার নিজের ব'লে এবং নিজেকে একান্তই জনাবের ব'লে ঘোষণা ক'রে দাঁড়াতে চায়। সে বললে—চলো, তাই চলো।

পরদিন সন্ধ্যায় আর তারা মিলিত হ'ল না। রাত্রি একটু গভীর হ'লে জনাব

এসে দাঁড়াল গাছতলায় একটি পুঁটলি নিয়ে। ছোট বড় পাটা দু'খানা হাতে নিয়েছিল। রঙ্গুও এল একটি পুঁটলি নিয়ে। দু'জনে তারা বেরিয়ে পড়ল।

নদীর ধারে সাহেবডাঙ্গায় রেশম-কুঠি। একেবারে নদীর কিনারার উপর। সাহেবানদের কীর্তি দেখে জনাব বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। শোভান আল্লাহ্! ক্রোশ ভর কিনারা একদম নিচে থেকে উপর পর্যন্ত বাঁধিয়ে ফেলেছে। বাঘিনীর মুখের মধ্যে লোহার দস্তানা-পরা হাত পুরে দিলে যেমন হয়, দরিয়ার হাল হয়েছে ঠিক তেমনি। কষের দাঁত দিয়ে বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে চিবুতে চেষ্টা করছে সে। বাঁধানো সীমানা বরাবর নদীর এখানে ধনুকের মত বাঁক ঘুরতে বাধ্য হয়েছে।

বাঁধানো কিনারার উপর উঠেছে কুঠি। পাঁচিল চ'লে গিয়েছে তীরের মত সোজা। তার ভিতরে দেখা যাচ্ছে গোল থামওয়ালা দোতলা বাড়ি। সব চেয়ে বিস্ময়কর চৌপলা মিনারের মত উঠে গিয়েছে ইটের তৈরী চিমনী।

ঘাটে উঠবার সময় জনাব পোস্তার গাঁথনিটা বেশ ক'রে হাত দিয়ে নেড়ে দেখলে। এ্যায় বাপরে বাপ! জলে একদম পাথর ব'নে গিয়েছে। ইটের উপরে ইট—তার উপরে ইট, মাঝখানের মসলা কোথায় কতটুকু, ধরতে পারা দূরে থাক আন্দাজও করা যায় না।

সাহেবের সামনে গিয়ে সেলাম ক'রে সে দাঁড়াল। কুঠির তখন অনেক কাজ, নতুন বয়লার বসবে, চিমনি তৈরি হবে; নতুন ক'রে পাচ শ 'ধাই' তৈরি হবে, তার শেড চাই। নতুন গুদাম হবে, কোয়ার্টার হবে, আণ্টাঘর হবে। অনেক কাজ, অনেক মিস্ত্রী চাই, অনেক লোক চাই। কাজ পেয়ে গেল জনাব। কুঠির দারোয়ান তাকে সঙ্গে ক'রে জিম্মা ক'রে দিলে বড় মিস্ত্রীর—শেখ খুরসেদ আলি।

ঘাড় কামানো বাবরি চুল—চেরাসিঁথি, মাথায় মলমলের টুপি, গায়ে পাঞ্জাবি আস্তিন, পরনে চেকদার লুঙ্গি, পায়ে ফুলদার চকচকে জুতা—নাম পামশু। দোষে-গুণে বেশ মানুষ ছিল খুরসেদ। বয়স তখন তার চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ। জনাবকে একনজর দেখলে—জনাবকে দেখতে গিয়ে পিছনে রঙ্গুকে দেখে সে বললে—ও? ও কে?

জনাব বললে—আমার লোক। তারপরই নিজেকে সংশোধন ক'রে নিয়ে বললে—আমার বিবি।

খুরসেদ হেসে বললে—ঝুট্।

তারপর আবার হেসে বললে—তাতেও কোন হরজা নেই। তুম্ রাজমিস্ত্রী হ্যায়—উ তুমারা রেজা হ্যায়। লেগে যাও কাজে। পিঠের দিকে জামার গলায় ঝুলানো ছিল ভাঁজকরা ইঞ্চি মাপের স্কেলটা—সেটা সে টেনে নিয়ে মাপতে বসল গাঁথনিটা। অবাক্ হয়ে গেল জনাব। সেও লাগল কাজে পরের দিন থেকে।

নদীর ধারের পলিমাটির তৈরী ইট—পগমিলে মাটি তৈরী হয়েছে, বাক্স ফর্মায় ছ'খানি পিঠ একেবারে যেন র্যাঁদা করা কাঠের মত সমান; একখানির উপর আর একখানি রাখলে বেমালুম ব'সে যাবে—কেতাবের ভিতরের সমান মাপে কাটা কাগজের উপর কাগজের মত। পাতলা গঁদের আঠার মত এক আস্তরণ মসলা কর্ণি চালিয়ে টেনে দিয়ে একখানার পর একখানা ইট বসিয়ে যাচ্ছে। সোহাগার পান দিয়ে জোড়া সোনার দানা দানার সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে। খিলান হচ্ছে—সাহেব লোকের আণ্টাঘর—গান হবে, বাজনা হবে, সাহেব মেম লোক নাচবে—জোড়া বেঁধে; গোটা ঘর জোড়া এক খিলান, দুই ধারে দুই থাম, বিশ ফুট চওড়া খিলান। মোটা শালের রোলা দিয়ে মাচা বেঁধে খিলানের ঠেকা বাঁধা হয়েছে, তার উপর ইট গাঁথা হচ্ছে। খিলানের ইট সোজা বসছে না, বসছে আড়াআড়ি। মসলা নিজে দাঁড়িয়ে তৈরি করিয়েছে বড় মিস্ত্রী। 'বিলাইতী মাটি' আর কাশীর চিনির মত মিহি বালি মিশিয়ে শুকনা অবস্থায় তাকে কেটে ঘেঁটে মিশিয়ে জল ঢেলে ক্ষীরের মত পাতলা ক'রে তৈরী সে মসলা। সেই মসলা ঢেলে দিচ্ছে ফাঁকে ফাঁকে, কর্ণি দিয়ে মেজে-ঘষে জোড় মিলিয়ে দিচ্ছে। বিলাইতী মাটি ওই এক তাজ্জবের মসলা। বালিতে আর 'বিলাইতী মাটিতে' মিশিয়ে তাল পাকিয়ে রেখে দাও ঠাণ্ডায়, একটু শুকালে ফেলে রাখ পানিতে; একদিন পর তুলে নাও—বাস্—পাথরের গুলী হয়ে যাবে।

আণ্টাঘরের গাঁথনি শেষ হ'ল। আরম্ভ হ'ল পলেস্তারা। সাহেব বলেছিল—বিলাইতী মাটিতে বালি মিশিয়ে পলেস্তারা করো। খুরসেদ বললে—হুজুর, পঙ্কের কাম হোক—মার্বেলকে মাফিক জিল্লা দেগা। উসকে পর আঁখ রাখনেসে দরদ নেহি লাগে গা।

তিনকড়ি রাজ পক্কের কাজ হয়তো চোখে দেখেছে। এখানে জনাব কিছু করেছে। কিন্তু সে কাজের হদিস সে জানে না। 'বিলাইতী মাটি' এখানেও আমদানি হয়েছে অনেকদিন। তিনকড়ি বুদ্ধি খাটিয়ে বেশি মজবুত করবার জন্য 'বিলাইতী মাটি'র সঙ্গে মেশাবার বালির ভাগ কমিয়ে চুন মিশিয়েছিল তার বদলে। উল্লুক—বুরবক—গিধ্বড় কাঁহাকা! মনে পড়লে জনাবের হা-হা ক'রে হাসতে ইচ্ছা করে। মদের সঙ্গে দুধ! আরে উল্লুক। হায় নসিব জনাবের! বিলাইতী মাটির সঙ্গে চুনা! তোবা! তোবা!

ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল গাঁথনি!

হায় খোদা! হে ভগবান! একাজ এত সোজা? একি এম্‌নি হয়! খোদাতায়লা দুনিয়া তৈরি করলেন—কোথাও গড়লেন পাহাড়, কোথাও গড়লেন নদী, কোথাও গড়লেন বন—সমান মেঝের মত দুনিয়ার ক্ষেত গড়লেন—কিনারায় কিনারায় সমুদ্দুর। তাঁর কাছ থেকেই না বড় বড় মানুষ দামী মগজে ভ'রে নিয়ে এল সেই বিদ্যা। সে কি সোজা! কত বড় বড় কেতাব লিখেছে সব বড় বড় ইঞ্জিনীয়ার, কত নক্সা—কত মসলা, কত মাপ—কত হিসাব। সে দেখেছে। চোখে দেখেছে সে সব কেতাব সাহেবানদের টেবিলের উপর। খুরসেদ কতক শিখেছিল তাদের কাছে, কতক শিখেছিল তার পুরানো দেশী ওস্তাদের কাছে—মুরশিদাবাদের বুড়া ওস্তাদ কারিগর, মগজের খোপে খোপে ছিল তার নবাবী আমলের ইমারতী এলেম। খুরসেদের কাছে জনাব অনেক কষ্টে আদায় করেছে এই সব বিদ্যা, এই সব এলেম। বহুৎ দাম তাকে দিতে হয়েছে এর জন্যে তাকে। রঙ্গুকে দিতে হয়েছে খুরসেদকে।

রঙ্গুকে দেখে নেশা জাগল খুরসেদের। জনাবের উপর সে সদয় হ'য়ে উঠল। জনাবের কাছে সে পান চাইত রোজ। বলত রঙ্গিলা বিবির হাতের সাজা পান খাওয়াও মিয়া। এই সূত্রপাত। তারপর একদিন বললে রঙ্গিলা বিবির হাতের রান্না খাওয়াও জনাব ভাই। তখন জনাবকে রাখত সে ঠিক নিজের পাশে। জনাবও তখন কাজের নেশায় বিভোর। তখন খুদসেদের এই নেকনজরের কারণ ঠিক ধরতে পারে নাই। ভাবত, তার কাজে খুশি হয়ে বড়মিস্ত্রী তাকে ভালবাসছে, তাকে ঠিক ভাইয়ের মত দেখছে, তাই তার বাড়িতে নিজে থেকে যেচে নিমন্ত্রণ নিলে। রঙ্গুর হাতের রান্না খেতে চাওয়ায় খুরসেদের কিছু মতলব ঠাওর করবার

মতন কিছু ছিল না। সে নিজেই পঞ্চমুখে রঙ্গুর রান্নার প্রশংসা করত। রঙ্গু হাসত কাজের যোগান দিতে দিতে।

রঙ্গু সেদিন হাসতে হাসতে বলেছিল—তাই নেমন্তন্ন করো বড়মিস্ত্রীকে। খুব আচ্ছা ক'রে কলিজার কালিয়া রেঁধে খাওয়াব।

জনাব সেদিনও বুঝতে পারে নাই কথাটা।

বুঝতে পারলে, হঠাৎ একদিন খুরসেদ তাকে বললে—রঙ্গিলা বিবিকে তুমি ছেড়ে দাও জনাব ভাই।

চমকে উঠল জনাব।

—আমি ওকে কলমা পড়িয়ে নেকা করব।

স্তম্ভিত হয়ে গেল জনাব।

বড় মিস্ত্রী হেসে বললে—রঙ্গু চলেও গিয়েছে আমার বাসায়। সেও রাজী আছে। আর বেশি গোলমাল করলে কোন ফায়দাও হবে না এতে। সেটা তুমি সহজেই সমঝাতে পার।

সমঝাতে হ'ল বৈকি। সারারাত নদীর বালিতে বুক চাপড়ে কেঁদে সে বুঝলে। মনকে বুঝালে। তার পরের দিনটাও সে বুঝলে। তার পরদিন সে হাসিমুখে এসেই খুরসেদকে বললে—তাই হ'ক বড়ভাই। হাজার হ'লেও তুমি ওস্তাদ।

বড় মিস্ত্রী বললে—তুই বেছে নে, এত কামিন রয়েছে—যাকে পছন্দ হবে তোর বল্।

পছন্দ সে করলে একজনকে, কিন্তু সে-কথা বললে না বড়মিস্ত্রীকে। খুরসেদের বাসায় ছিল কিছুদিন আগে নেকা করা এক স্ত্রী। তাকেই নিয়ে একদা সে সাহেবডাঙ্গা থেকে গভীর রাত্রে বেরিয়ে পড়ল। তখন আঁটাঘরের মেঝে হয়ে গিয়েছে—ছাদ হয়েছে, পলেস্তা হয়েছে—থামে পঙ্কের কাজের পালিশ হয়েছে। গাঁথা হচ্ছিল তখন চিমনি। মাঝের জায়গায় গাঁপনি চলছিল, ভারার উপর থেকে নিচের দিকে চাইলে শরীর শির-শির করে, মাথা ঝিম-ঝিম করে। খুরসেদ তখন কিছু কিছু সন্দেহ করতে শুরু করেছে। তার ভয় হ'ল হঠাৎ খুরসেদ তাকে ভারা থেকে ঠেলে ফেলে দিতে পারে। শয়তান, ও সব পারে। পুরো চিমনিটা গাঁথতে সে পারলে না—এই আপসোস নিয়েই সে হামিদনকে নিয়ে পালাতে বাধ্য হ'ল।

ঘণ্টা বাজছে। ঢং ঢং ক'রে পাঁচটা ঘণ্টার আওয়াজ হ'ল। ইস্কুলের ঘণ্টা, পাঁচের ঘণ্টা শেষ হ'ল, বাজল তিনটে। জনাবের চমক ভাঙল—কতকালের কথা! কাজ করতে করতেই সে ভাবছিল। হাতের শেষ ইটখানি বসিয়ে সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল।

মতিবালা প্রশ্ন করলে—কি ভাবছিলা গো ওস্তাদ? রঞ্জুকে?

হেসে জনাব বললে—উঁহু।

—তবে?

—তুর ডাগর চোখ দু'টি ভাবছিলাম। সে তার গালে একটি টোকা মেরে দিলে।

রাগের ভঙ্গীতে মুখ গম্ভীর ক'রে মতি বাঁকা দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—উ কি? না! হঁ্যা!

নিচে থেকে ডাকলেন শ্যামাদাসবাবু—জনাব!

—এই যাই আজ্ঞা। আজ দেখেন কাজ। মেপে দেখেন।

—কাটান দিলে?

—কাল দিব। ভেবে দেখলাম—আজ দিলে জেরাসে খুঁত থাকত।

শ্যামাদাস চঞ্চল হয়ে নখ খুঁটতে আরম্ভ করলেন—শোনো ত তুমি, শোনো ত। একে বলে—তোমার মতলবটা কি একবার খুলে বলো ত শুনি।

জনাব বললে—পেটে এখুনও দানাপানি প'ড়ে নাই বাবু। এখুন লয়। আসব সনজের সময়। এখুন হয়তো খারাপ বাত বেরিয়ে যাবে, সনজেতে আসব।

* * * *

সন্ধ্যায় সে এল। এখন তার গায়ে ফতুয়ার বদলে জামা। পরনের কাপড় বহরে বড়। কোঁচাটি উল্টে গুঁজে প্রৌঢ়ত্বের সঙ্গে মাননসই ক'রে নিয়েছে।

শ্যামাদাসবাবু বললেন—লোকে যা বলে সে মিছে নয়। লাগলে একে বলে থামতে চাও না।

জনাব হেসে বললে—এ আপুনি কি বুলছেন হুজুর? কাম শেষ না হ'লে থামব কি ক'রে গো। সবেরই একটা সময় আছে, থামাবারও একটা সময় আছে। এক্কি বাজিকরের হুকার জল—হুই বসায়ে দিলে—দিয়ে বুললে পড়, জল পড়তে লাগল—বুললে থাম, ব্যস থেমে গেল।

শ্যামাদাসবাবু বললেন—আজ কাটান মারবার কথা—তুমি নিজে—

—হাঁ বলেছিলাম। তা দেখলাম আজ যদি এইখানে কাটান মারি তবে জেরা খুঁত হয়, খারাপ হয়ে যায় মন্দিল। ধরেন সবেরই একটা হিসাব আছে। ফিতা ধ'রে মাপ – ফুট ইঞ্চির হিসাব।

—কিন্তু এরই মধ্যে কত উঁচু হয়েছে দেখেছ?

জনাব ভুরু কুঁচকে হাসলে—উঁচু হয়েছে! ওই কি উঁচু? উচাই যদি না হবে, তবে মন্দিল করছেন কেন হুজুর? একখানা সাত ফুট বাই আট ফুট গারার গাঁথনি ঘর করলেই তো হ'ত। মাথার উপর একটা তেকোনা পেরাপেট গেঁথে একটা ত্রিশূল বসায়ে দিলেই হ'য়ে যেত। তা বুলেন না কেনে—এখুনও হবে। তাই ক'রে দিচ্ছি আপনার। গাঁথনি বন্ধ থাক, কড়ির অডার পাঠায়ে দিন, টালি আনিয়ে নি—

বাধা দিয়ে শ্যামাদাস বললেন—আঃ, তুমি বড় একে বলে বাজে বকো জনাব। তা কে বলেছে হে বাপু? চঞ্চল হয়ে তিনি চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন, ঘুরতে লাগলেন ঘরময়, আঙুল দিয়ে নখ খোটার মাত্রা বেড়ে গেল।

জনাব বললে—তবে আপুনি বুলছেন কি? মন্দিল হবে আপনার। আমার লয়। আমি লিয়ে যাব না ঘরে। লোকে বুলবে না জনাব সেখের মন্দিল, বুলবে অমুক বাবুর মন্দিল। হুজুর, মন্দিল লোকে করে কেনে? ঘর করলেই তো হয়। হুই মাথা লম্বা ক'রে আকাশের গায়ে মার দিয়ে মন্দিল করে কেনে? তার উপরে দেয় আপনার কলস, তার উপর ত্রিশূল—কেউ দেয় চক্র। কেউ বা দেয় পিতলের—কেউ বা দেয় সোনার। কেনে দেয় হুজুর? উচার জন্যেই মন্দিল। আপনার দেবতা—আপনার ঠাকুর যে ইমারতে থাকবেন, সে নিচু হবে মানুষের 'থনি' (চেয়ে)? আপুনি থাকবেন দোতলা ঘরে, তার চিলকোটা হুই উচা আর ঠাকুরের মন্দিল এই নিচু হবে? মন্দিল হবে, দেবতার মন্দিল, আকাশের গায়ে মার দিবে মাথা উচা ক'রে খাড়া থাকবে, সুরুযের আলো প'ড়ে সোনার কলস ঝলবে। গাঁয়ের লোকের ঘুম ভাঙবে সকালে, আল্লাহ্‌কে—ভগবানকে প্রণাম করতে মুখ তুলবে, আপনার মন্দিলের চূড়া চোখে পড়বে। তারা প্রণাম করবে আপনার ঠাকুরকে। বুলবে—হ্যাঁ, অমুক বাবু একটা আদমীর মতন আদমী ছিল, ভকত ছিল বটে, মন্দিল ক'রে গিয়েছে বটে। যেহেতু

থেকেও শুনবেন সেকথা আপুনি। মন্দিলের চূড়া ক্রোশ বরাবর দূর থেকে দেখা যাবে। তবে সে মন্দিল। গাঁয়ের চারপাশে গাছপালা. জঙ্গল মনে হয় দূর থেকে। সেই জঙ্গলের মাঝখানে গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে আশ্বিনের টুকরাভর মেঘের মত মন্দিলের মাথা দেখা যাবে। লোকের প্রথমে মনে হবে মেঘই বটে। তা'পর মনে হবে—না, মেঘ তো লয়; মন্দিল—এ মন্দিল। তারিফ করবে লোকে। বুলবে—হ্যাঁ, ইমানদার লোকের কীর্তি বটে। দেশদেশান্তরের লোক কেউ আসছে ই গাঁয়ে। পথে রাহীকে শুধালে অমুক কত দূর ভাই? লোকে বুলবে আর খানিকটা এগিয়ে গেলেই নজরে আসবে, পহেলেই দেখতে পাবে—এক মন্দিলের চূড়া। ওই চূড়াতে চোখ রেখে চ'লে যাও। কার মন্দিল ভাই? অমুক বাবুর মন্দিল। হ্যাঁ!

শ্যামাদাসবাবু কথার মাঝখানেই পায়চারি ছেড়ে এসে চেয়ারে বসেছিলেন। স্তব্ধ হ'য়ে তিনি ব'সে ছিলেন। নখ খুঁটছিলেন অত্যন্ত মৃদুভাবে। জনাব তার কল্কের স্তিমিত আগুনে ফুঁ দিতে দিতে বাইরে গিয়ে বসল। সেখানে আড়ালে ব'সে তামাক খেতে লাগল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে,—বাবু।

—উঁ।

—বুঝেন, কথাটা আমি ঠিক বুলেছি কিনা।

শ্যামাদাসবাবু বললেন—হুঁ! কথা তো ভালই বটে। একে বলে শুনতেও ভাল লাগছে। কিন্তু—

—উয়াতে আর কিন্তু নেই হুজুর। সাহেবডাঙ্গার কুঠি 'থনে' গেলাম বর্ধমান। শুনলাম রাজবাড়িতে ইমারত হবে নতুন। বুঝলেন? পথে পেরথম চোখে পড়ল-সারি সারি মন্দিল—একশো আট শিবমন্দিল। দুধের মতন সাদা মন্দিলের সারি; আঃ, মাঠের মধ্যেখানে—দু'কোশ দূর থেকে নজরে পড়ছে, আর মাঝে মাঝে গাছের আড়াল পড়ছে। তারপর কাছে এলাম; হুজুর সেখান থেকেই এক শ আট সেলাম দিলাম রাজাকে—আর এক শ আট সেলাম দিলাম কারিগরকে। তা বাদে আপনার রাজবাড়ির ইমারত, সে কথা বাদই দেন। রাজা বাদশা নবাবদের কীর্তিই আলাদা। কিন্তু আপুনিও তো আমীর লোক —আমীরের মতন কীর্তি তো আপনাকে করতে হবে। রাজার বাড়ির থাম নিচে তলা থেকে উঠে গিয়েছে তিন তলার ছাদ পর্যন্ত। পঙ্কের কাজ করা গোল

থাম। সে সব কথা না হয় বাদই দিলাম। রাজবাড়ির কাম হয়ে গেল, শুনলাম কাম হবে কাছেই এক জমিদার বাড়ির—মন্দিল হবে। ন'টা চূড়া হবে মন্দিলের, দাওয়া হবে মানুষের গলাভর উচা, কলকাতার ইঞ্জিনীয়ার নক্সা করেছেন।

শ্যামাদাসবাবু বেরিয়ে চ'লে গেলেন।

জনাব অপেক্ষা ক'রে ব'সে রইল। কিছুক্ষণ পর সেও উঠল। কি করবে সে ব'সে থেকে। ঝকমারীর কাম করেছে সে এই বাবুটির কাজ হাতে নিয়ে। দিলদার লোকের কাম করেও সুখ আছে। তাতে মজুরি কম হয় সেও আচ্ছা। দিলদার লোক ছিল বর্ধমানের সেই জমিদার। ঘুর ঘুর ক'রে বাবুসাহেব মন্দিলের চারিপাশে ঘুরচেই। —হাঁ, ওখানটা কেমন যেন বেঁকে গেল মিস্ত্রী?

—না হুজুর, ঠিক আছে. নিচে থনে উচাতে এমন দেখায়।

—মিস্ত্রী দেখ, আমার ভারি ইচ্ছে—

—বলুন হুজুর, বলুন কি ইচ্ছে?

—ইঞ্জিনীয়ার করেছেন বটে, মাঝখানের চূড়াটি এই রকম, কিন্তু আমার ইচ্ছে, বর্ধমানের সর্বমঙ্গলার মন্দির তুমি দেখেছ তো? সেই রকম হয়।

—হবে—সেই রকমই হবে।

—আর দেখ, ভেবেছিলাম মন্দিরের সামনে যে খিলানের বারান্দা ওইখানেই শুধু মার্বেল দেব। তা না, সামনের যে খোলা বারান্দা ভিজে রোয়াক ওটাতেও মার্বেল দেব। কি বলো?

—হাঁ হুজুর। খুব ভাল হবে।

বর্ধমানের ওই গাঁয়েই হামিদন মরেছিল। বিশ্রী ঘা হয়ে মরেছিল হামিদন। হামিদনের দোষ নাই। সে ঘা তাকে ধরিয়েছিল জনাব। জনাবকে ধরিয়েছিল বর্ধমানের কামিন সৈরভী। ছিপ-ছিপে পাতলা চেহারা, কোঁকড়ানো চুল, ঢুল-ঢুলে চোখ; ঠোঁট দুটো একটু উঁচু ছিল সৈরভীর; হাসলে দাঁতের সঙ্গে মাড়ি বেরিয়ে পড়ত। নেশা লাগত তাকে দেখে। কিন্তু বিষ ছিল তার মধ্যে। সেই জনাবের জীবনে প্রথম বিষ। জনাব নিজের চিকিৎসা করিয়েছিল। হামিদন লুকিয়েছিল প্রথমটা। তারপর যখন প্রকাশ করতে বাধ্য হ'ল, তখন সে বর্ধমান ছেড়েছে। দূর পাড়াগাঁ থেকে চিকিৎসা ভাল হ'ল না। ম'রে গেল হামিদন।

—নসিব—নসিব জনাবের। হামিদন ম'রে গেল—মন খারাপ হয়ে গেল

জনাবের। জমিদার বাড়ির কাজ শেষ হতেই সে ফিরে এল এ গাঁয়ে। বাপজানও সেই সময় অসুখে পড়েছিল। বাপজান বললে, আর বিদেশে যাস না বাপ। যে ক'টা দিন আমি বাঁচি ইখানেই থাক। মাধববাবু বড়লোক হয়েছে। ইমারত করবে অনেক। থাক এইখানেই। কাজকাম কর। শাদি নিকা কর।

জনাব থেকে গেল! নসিব জনাবের।

জনাব বেরিয়ে আসছিল শ্যামাদাসবাবুর ওখান থেকে। থমকে সে দাঁড়াল শ্যামাদাসবাবুর বৈঠকখানা থেকে বেরিয়েই পতিত জায়গাটায়—মন্দিরের সামনে।

মন্দিরের পিছনে পুকুর। পুকুরের ওপারে বোধ হয় চাঁদ উঠেছে।

ওঃ—মন্দির যখন শেষ হবে, তখন এমন বাহার দেবে!

কে? কে উখানে? মন্দিরের সামনে উপরের দিকে মুখ ক'রে কে দাঁড়িয়ে আছে? জনাব এগিয়ে গেল। সে বিস্মিত হয়ে গেল। শ্যামাদাসবাবু উপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। জনাবের বুঝতে দেরি হ'ল না—বাবু অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মনে মনে মন্দিরটাকে ছকে দেখে নিচ্ছেন।

—হুজুর?

শ্যামাদাস চমকে উঠলেন।

—আজ্ঞা আমি জনাব। সেলাম। তা হ'লে যাই আমি।

—একে বলে, কাল থেকে জোর দিয়ে আজ আরম্ভ করো। একে বলে, বড় হ'ক ছোট হ'ক তাড়াতাড়ি শেষ করো।

—যো হুকুম হুজুর।

জনাবও একবার আকাশের দিকে তাকালে। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল গোটা মন্দিরটা।

* * *

মন্দিরের কাজ চলেছে। খাঁজে খাঁজে অল্প অল্প ভেঙ্গে চারখানি দেওয়াল পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসছে, সঙ্গে সঙ্গে উপরের দিকে উঠে চলেছে। মন্দিরের চূড়ার মাঝখান ছাড়িয়ে গিয়েছে মনে হচ্ছে। জনাব ভারার উপর দাঁড়িয়ে দেখে। হুই দেখা যাচ্ছে—তাদের পাড়ার মসজিদের মিনার। ও মিনারের আধখানা জনাবের হাতে গড়া। যে বৎসর সে ফিরল—সে সালটা পুরানো লোকের

সবার মনে আছে। বড় ভূমিকম্প হয়েছিল। দু'তিন বাঁশের উপরে বাঁধা ভারা যখন ঝড়ে দোলে, তখনই জনাবের সে দিনকার কথা মনে পড়ে। দুনিয়াটা দুলে গেল ঝড়বাজা ভারার মত। বড় বড় দালান ভেঙ্গে পড়ল। ছাদে ফাটল ধরল। সে ভূমিকম্পে ভেঙ্গে গেল মসজিদের দক্ষিণ তরফের মিনার। এ গাঁয়ে তখন দালান কোথা? হরিশবাবুর দালান, শ্যামাদাসবাবুর দালান হয়েছে সবে। রামবাবুদের একতলা দালানটাকে সে ইমারতই বলে না। ইটের পাজা। পলেস্তারা নাই, পয়েন্টিং পর্যন্ত না। আরে, আসল মানুষের গাঁথনিটা তো হাড়ের; গাছের ভিতরটা তো কাঠ; হাড়ের কাঠামোর উপর মাংস লাগিয়ে পঙ্কের কামের পলেস্তারার মত চামড়া দিলে তবে না সে মানুষ, গাছের গায়ে বাকল না হ'লে কি সে গাছ? নোনা ধরেছে এর মধ্যে।

মিনারটার মাপ তার মনে আছে। তার ইচ্ছা ছিল মিনারটাকে আরও খানিকটা উঁচু ক'রে সে তৈরি করে—কিন্তু তাহ'লে উত্তর তরফের মিনারটার সঙ্গে বেমানান হ'ত। অনেক ভেবে তার মনে হয়েছিল, তাতেই বা ক্ষতি কি? এ দিকেরটা হোক না বড়। পাশাপাশি ছোট বড় তালগাছ দাঁড়িয়ে থাকে—সে কি খারাপ লাগে দেখতে! গড়তে পারলে বেমানানের মধ্যে এমন বাহার আনা যায়, সে একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারা যায়। ট্যারা কামিন টুনীর দিকে সব মাতালের মত চেয়ে থাকে অথচ ওটা কেউ ধরতে পারে না। মুশকিল তো ওই, সমঝদার লোক মেলে না। বড় বড় ইঞ্জিনীয়ার হ'লে বুঝতে পারে। এখানকার লোকে বুঝতে পারে নাই তার কথা। সেই পুরানো মাপে উত্তরের মিনারের সঙ্গে জুড়ি মিলিয়েই গড়তে হয়েছিল তাকে। হায় আল্লাহ্—নিজের বাড়ির দিকে কেউ খেয়াল ক'রে চেয়ে দেখে না? আপনার বাচ্চাদের বড় থেকে ছোট তক পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দেখ দেখি!

আঃ! একটা ছোট্ট ইটের টুকরো লেগেছে জনাবের হাঁটুতে। কে? হুঁ! রসিদটা ছুঁড়েছে মতির গায়ে। ছুটোতে চুলবুল করছে। গম্ভীরভাবে জনাব বললে—কাম কর রসিদ। কাম করে যা।

মসজিদের মিনারের চেয়ে মন্দির উঁচু হবে অনেক।

মাধববাবুর তিনতলা নয়া দালানটাই এখানকার সবচেয়ে উঁচু বাড়ি। তিনতলার ছাদের সিঁড়ির মাথাটা অনেক দূর থেকে দেখা যায়। ওইটাই

এখানকার সবচেয়ে ভাল বাড়ি। কলকাতার মিস্ত্রী এসে ওর চারিপাশে নক্সা কেটে গিয়েছে, থামের মাথায় কার্নিসে কারিগিরি ক'রে গিয়েছে। হাঁ, সে লোকটা মিস্ত্রী একটা। বিলাইতী মাটি আর বালিতে কার্নিসের মাথা জমিয়ে কেটে কেটে বার করত নক্সা। দুই হাতে সাদা ফুল। ঠোঁটে গালে সাদা ফুল—খাটো মানুষটা পাজামা পরত, মাথায় দিত মখমলের কালো টুপি, গায়ে রঙিন কামিজ। নক্সায় মিস্ত্রী ভাল। কিন্তু ছাদ খিলানের কিছু জানে না। সে ছাদ খিলানে এই জনাব আলী শেখ!

এখানকার ওই পুরানো কয়টা মন্দির—মসজিদের গম্বুজে খিলান ছাড়া তামাম ছাদে জনাবের কর্ণির দাগ আছে। ভূমিকম্পে সব ছাদে ফাটল ধরেছিল, জনাব কতক তার তুলে ফেলে নতুন তৈরি করেছে। কতক—যে সব ফাটল অল্প স্বল্প—সে সব বহুৎ হুঁশিয়ারির সঙ্গে মেরামত ক'রে জোড় মিলিয়ে দিয়েছে। বেমালুম জমে ফের এক হয়ে গিয়েছে। বড় বড় সার্জন ডাক্তার ভাঙা হাড়কাটা অঙ্গ জুড়ে দেয়—এমন জুড়ে দেয় যে একটু দাগ ছাড়া কিছু বুঝতে পারা যায় না, তাও কাটা চামড়া সেলাই করলে, তবে দাগটা থাকে, নইলে বেমালুম জুড়ে যায়। শুধু জুড়েই যায় না—ঠিক সহজ শরীরের মত জোরালো হয়। জনাবের ছাদ জোড়ার কেরামতিও ঠিক তেমনি। এক ফোঁটা জল পড়ে না আজও।

শ্যামাদাসবাবু ডাকলেন নিচে থেকে—জনাব।

—বাবু!

—ঝিনুক তা হ'লে কিনতে আরম্ভ করি। এনেছে আজ ক'জন।

—হাঁ হুজুর। উয়াতে আর কথা কি।

পঙ্ক চুন তৈরি হবে। মন্দিরের একদম মাথার অংশটা পঙ্কচুনে পলেস্তারা হবে—মাজাই হবে। নেশা ধরেছে শ্যামাদাসবাবুর।

চার দেওয়ালের উপর 'পারা লেবেল' বসিয়ে দেখলে জনাব, মাঝখানে চার কোণায় বসিয়ে দেখে নিলে, ঠিক মাঝখানটিতে মুক্তার দানার মত টল-টল করছে পারা!

—ঠিক হ্যায়, চালাও, হাত চালাও, হুঁশ ক'রে রসিদ—হুঁশিয়ারি ক'রে কাম করবি।

ইটের উপর কর্ণির ঘা পড়ছে খন-খন-খন-খন। চূড়ার কাটান যেখান থেকে

আরম্ভ হয়েছে, সেখানে লোহার কড়ি বেরিয়ে নিচের দাওয়ার কিনারায় গোল থামের মাথায় বসেছে। বরগা পড়েছে, তার উপর হচ্ছে ছাদ। কামিনের দল তালে তালে কোপা পিটছে, বাজনা বাজছে যেন। জনাব ভারা বেয়ে গেল ছাদে। মাটির বড় জালায় মসলা ভিজানো জল রয়েছে, জনাব নিজ হাতে মগে ভ'রে সেই জল ঢেলে দেয়। চালা দিদিরা—হাঁ। সমান জোরে। এক ঘা বেশি জোরে এক ঘা কম জোরে যেন না হয়। আচ্ছা—বহুৎ আচ্ছা!

যে দিকে বারান্দার ছাদ পিটছিল কামিনরা—তার বিপরীত দিকে গিয়ে জনাব দাঁড়াল। ডাকলে—ঠাকুরঝি, ইদিকে ভাই শুন ত একবার।

ঠাকুরঝি এখন প্রৌঢ়া—এককালে সে জনাবের পাশে থাকত, মতির এবং দাসীর মত। প্রৌঢ়া এসে দাঁড়াল।

নিম্নস্বরে জনাব বললে—মতিটার সঙ্গে রসিদটার কাণ্ডটা কি রকম বল্ দেখি?

ঠাকুরঝি একটু বিরক্তিভরেই বললে—মরণ, ওই আবার শুধাতে হয় না কি।

—হুঁ। জনাব উঠে চ'লে গেল।

ঠাকুরঝি আপন মনে বললে—মরণ, বুড়ো বয়সে উদিকে চোখ কেনে?

জনাব কাজে লাগল। হঠাৎ বললে—উঁহু—ই—হচ্ছে না। মতি তু নিচে ছাদের কাজে যা গো। এত উপরে ভারায় তু লারবি। হেই রাণী—তু উপরে উঠে আয় গো।

রাণী মধ্যবয়সী মেয়ে। সে সদ্য এ পদ থেকে খারিজ হয়েছিল।

মন্দিরের গাঁথনি শেষ ক'রে জনাব দাঁড়াল মাথায় কলস বসাবার শিকটা ধ'রে।

শ্যামাদাসবাবু নিচে দাঁড়িয়ে দেখলেন—জনাবকে দেখাচ্ছে ঠিক তাঁর মত খাটো মাথার মানুষ। খুশি হয়ে উঠল তাঁর মন। তবু মনটা খুঁত খুঁত করে। অনেক টাকা বেশি খরচ হয়ে গেল। অনেক টাকা!

জনাব দেখছিল—গ্রামের ঘরবাড়ি গাছপালার উপর দিয়ে তার নজর চলেছে—ওই নয়াগাঁ—ওই বামনপাড়া—ওই দেবীপুর—ওই মাঠে চৌধুরী দীঘি—ওই নয়ানজুলির মাঠ—ওই নদী কিনারের আঁকা-বাঁকা জঙ্গল—ওই সরকারী পাক্কা সড়ক লাল ফিতার মত চ'লে গিয়েছে—পুতুলের মত লোক চলছে—গাড়ি চলছে। বাহবা, বাহবা! বুড়ো বয়সে ছাতিও তার ফুলে উঠল।

এইবার পলেস্তারা, নক্সা, কার্নিস, বিট, পাতলা ছুরির মত ধারালো মিহি কর্ণির কাজ। কাগজে পেন্সিল দিয়ে ছ'কে নিতে হবে নক্সা। শাদির কনেকে যেমন টিপ দিয়ে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে সাজায়—তেমনি ক'রে সাজাবার পালা।

ভারা থেকে সে নেমে এল। শ্যামাদাসবাবুকে সেলাম ক'রে বললে—সেলাম হুজুর—দেখে লেন কাম। ইঞ্জিনীয়ার নিয়ে এসে কাম দেখে লেন।

ঠাকুরঝিকে ডেকে বললে—শুন ইদিকে।

পকেট থেকে নীল কাগজে মোড়া দু'টি সোনার কানের টাপ তার হাতে দিয়ে বললে—মতিকে দিস। আর এই লে ভাই তুর। একটি টাকাও তার হাতে দিলে।

—মতিকে?

—হঁ্যা। মন্দির শেষ হ'ল। বকশিশ দিলাম লাতবউকে।

—কি বলব?

—আমি কিছু বুলব না। সি তার যা খুশি হয় করবে।

ঠাকুরঝি যেতে যেতে বললে—মরণ!

আজ মাসখানেক পরে জনাব সন্ধ্যায় হুঁকায় তামাক খেতে খেতে ভুতুড়ে বটগাছতলায় গিয়ে বসে। এখান থেকে মন্দিরটা দেখা যাচ্ছে, মসজিদের মিনার দেখা যাচ্ছে, বাবুদের চিলে-কোঠা দেখা যাচ্ছে। মাধববাবুর তেতলার ঘরের সারি দেখা যাচ্ছে। সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে এল। ইমারতগুলো আর দেখা যায় না। অন্ধকারের মধ্যে সাদা কিছু যেন নড়ছে জমিনের উপর। এগিয়ে আসছে।

* * *

পলেস্তারা চলছে। হঠাৎ সেদিন জনাব এল না। শ্যামাদাসবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—কি হ'ল?

রসিদ হেসে বললে—ভীমরথি হয়েছে বুড়ার হুজুর। খারাপ ব্যামো হয়েছে।

—খারাপ ব্যামো? কি বিপদ! কি ব্যামো?

—ওই সব কামিনগুলাকে নিয়ে মাতামাতি করে হুজুর এই বুড়া বয়সে—। হাসলে রসিদ।

—রাম রাম রাম।

—কিছু ভাববেন না, বাবু, আমরা কাম ঠিক বাজিয়ে দোব আপনার।

এই ব্যাধি জনাবের ছিল—প্রথম হয়েছিল বর্ধমানে। মধ্যে মধ্যে হঠাৎ দেখা দেয়। আবার নতুন করেও হয়। জনাব যায় ডাক্তারের কাছে।

ডাক্তার বলেন—কি জনাব? একটু হাসেনও সঙ্গে সঙ্গে।

জনাব সকলের সামনেই বলে—রোগের নাম, বলে—কাজ-কাম হাতে রয়েছে—জলদি সারিয়ে দিতে হবে। টাকা ধ'রে দেয় ডাক্তারের টেবিলের উপর।

আগে ইনজেকশন ছিল না। এখন ইনজেকশন উঠেছে। জনাব সব হাল হদিস জানে। সকাল থেকে কোন কিছু না-খেয়ে খালি পেটেই এসেছে। সে তার মোটা মোটা শিরাওয়ালা হাত একখানা বাড়িয়ে দেয়; কনুয়ের ভাঁজের জায়গাটায় তাকিয়ে দেখে। ওইখানটার শিরাতেই ডাক্তার সুচ ফুটিয়ে দেবে। বহুত তারিফের হাত ডাক্তারবাবুর। পুট ক'রে সুচটি ফুটিয়ে চালিয়ে দেবে শিরার মধ্যে। বহুৎ পাতলা হাত।

ইনজেকশন নিয়ে একটু ব'সে সে চ'লে যায় বাড়ি।

অদ্ভুত বাড়ি জনাবের। মাটির দেওয়ালের ভাঙা ঘর। সামনে এক পাকা বারান্দা। গোল থাম, পাকা ছাদ, পাকা মেঝে। সেই বারান্দার উপর বিছানা পেতে সে শুয়ে পড়ে। ইনজেকশনের পর জ্বর আসবে। বাড়িতে কেউ নাই। হামিদনের মৃত্যুর পর সে আর নিকা করে নাই। ইচ্ছাই হয় নাই। কি করবে সে নিকা ক'রে? রঙ্গু, সৈরভী, হায়তন, রোশনী, টগরী বউ, সত্য ঠাকুরঝি, জুবেদা, রানী সই, মতি নাতবউ, দাসী নাতনী—এদের নিয়ে দিন কাটছে তার, কি করবে সে নিকা ক'রে? এক হামিদন এসেছিল তার জীবনে—সেও জানটাকে দিয়ে গেল, গোনাহগারির মাশুল। আবার নিকা? নিকা ক'রে সে মানুষটাকে কষ্ট দিয়ে কাজ কি? ওদের তো সে ছাড়তে পারবে না! সে জানে। অহরহ কাজ-কামের সময় যারা পাশে থাকে, হাতে হাত লাগে, চোখে চোখ রাখতে হয়, পায়ে ইট পড়লে আহা বলে, যাদের মাথার চুল মুখে এসে পড়ে ঝুঁকে ইট মসলা দেবার সময়, ভারার উপর কড়া রোদে মাথা ঘুরে গেলে যারা বাতাস দেয় আঁচল দিয়ে, তাদের উপর দিল্ না পড়ে উপায় কি? এমন কোন রাজমিস্ত্রী সে তো দেখলে না—যে এদের দিল্ না দিয়ে পারলে! তবু তারা বিয়ে করে। করুক—জনাব করে নাই।

সে জানে খোদাতায়লার দরবারে এটা তার 'গোনাহ্'। তার এই পাপ—

'জেনার' জন্য গোনাহের গোনাহ্‌গারি তাকে দিতে হবে। দুনিয়ার মানুষকে সে দেখছে। ভালমানুষ আছে বইকি। এই দুনিয়ায় পয়গম্বর আসেন—ইমানদার মানুষ আছেন—তাইতো দুনিয়া আজও আছে। নইলে দুনিয়া ফেটে চৌচির হয়ে যেত মানুষের পাপে। ওঁরা বাদে বিলকুল মানুষ সুদ খাচ্ছে—ঘুষ নিচ্ছে, চুরি করছে—জেনা ব্যভিচার করছে। সে সুদ খায় না; ঘুষ নেয় না; চুরি করে না। দস্তুরি অবশ্য নিয়ে থাকে—সে মালিকে জানে—ঘুষ আর চুরি জানিয়ে করা হয় না। দস্তুরি দস্তুরি—সে তার পাওনা। সেও তার গোনাহ নয়। এক গোনাহ্‌ এই। সেই পাপের ভার আর বিয়ে ক'রে সে বাড়াতে চায় না। স্ত্রী বর্তমানে এই অন্যায় আরও গোনাহ্‌।

সে বলে—আল্লাহ্‌ তায়লা—খোদাতায়লা—মহম্মদ রসুল আল্লাহ্‌! আমার এই গোনাহ্‌টুকু মাফ্‌ কিয়া যায় হজরত!

অনেকক্ষণ পর সে আবার বলে—যদি গোনাহ্‌গারি দিতে হয়—মাফ যদি নাই করো—সাজা দিয়ো তুমি।

জ্বরের ঘোর কমে আসে; জনাব উঠে বসে। দুটো ইনজেকশনেই জনাব তাজা হয়ে ওঠে। বাইরে থেকে রোগের লক্ষণ আর কিছু নাই। বাবরী চুল আঁচড়ে গামছায় মুখ মুছে ফতুয়া গায়ে দিয়ে চটি পায়ে সে এসে দাঁড়ালো মন্দিরের কাছে।

বুড়ো হয়েছে জনাব। রাগ যেন চট ক'রে হয়ে যায়। রসিদকে সে সজোরে এক চড় মেরে বসল। বেইমান কোথাকার! শয়তান কোথাকার!

রসিদ হতভম্ব হয়ে গেল! তারপর রুখে উঠল।

জনাব গর্জে উঠল—চিল্লাস না—ইখানে চিল্লাস না। গর্দানা ধ'রে নিকাল দিব। ইখানে চিল্লাস না। তুর বাপ সুদি কারবার করে—আমি টাকা ধারি না, তুর বাপের অনেক জমীন আছে—আমি কুষাণ নই। তু ওই মতির সর্বনাশ করেছিস—নিজের বেমার উকে দিছিস। তুর নিজের জোয়ানী বয়েস, বেমার ধরিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছিস না। তোবা, তোবা। হারামী, হারামী তুই। নিকাল হামারা হিঁয়াসে!

রসিদ তার যন্ত্রপাতি নিয়ে চ'লে গেল।

জনাব মতির কাছে এসে দাঁড়ালো। মতি ভয়ে কাঁপছিল। জনাব একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বললে—যা, তুকে আর কিছু বুলব না। তুদের জাতটাই এমনি।

ছুটির সময় বললে—ডাক্তারকে আমি বুলে রেখেছি। যাস ডাক্তার ফুড়ে ওষুধ দিয়ে দেবে। জ্বর আসবে—ইখানে শুয়ে থাকবি। ছুটি হলে বাড়ি যাবি। এই কাঁচা বয়েস—এখন থেকে ঘূণ ধরাস না শরীলে।

আব্দুল বললে যাবার সময়—রসিদকে মেরে ভাল করো নাই ওস্তাদ। ওর বাপ—।

জনাব হা-হা ক'রে হাসলে।—কি করবে আমীর?

রসিদ এবং রসিদের বাপ কিছু করতে পারত কিনা ঠিক পরখ হ'ল না। মাস দুয়েকের মধ্যে মন্দির শেষ হ'তেই জনাব চ'লে গেল এখান থেকে।

এ জেলার পাশেই জেলা সাঁওতাল পরগণা। সেখানে সাহেবান পাদরী বাবালোক—বড় আড্ডা করেছে। সাঁওতালদের কেরেস্তান ধর্ম দিয়েছে। লেংটির বদলে পাতলুন পরিয়েছে, মেয়েরা ঘাঘরা পরে, বাবুলোকের মেয়েদের মত ভাল ভাল শাড়ী পরে, জামা পরে, খোঁপা বাঁধে, লেখাপড়া শেখে। সেখানে এক বড় ভারী গির্জা হবে। বড় বড় খিলান—বহুৎ উঁচু চূড়া ক্রমশ সরু হয়ে উঠে মিলে যাবে সূচালো হয়ে। খিলান—গোল খিলান নয়—ঠিক ইস্কাপনের মাথার মত না হলেও ঐ ধরণের মাথাটা হবে—একটি বাহারের কোণ তৈরী ক'রে মিলবে।

জনাবকে খবর দিয়েছে তারই এক জানা ঠিকাদার। জনাবের খিলানের পাকা হাত সে জানে।

মতিবালা খবরটা শুনে কাঁদলে।

জনাব বললে—যাবি আমার সঙ্গে?

মতি চুপ ক'রে রইল। যেতে সে পারবে না।

জনাব নিজেই বললে—নাঃ, যেয়ে কাজ নাই তোর। ঘর থেকে পা বার করলে তোরা আর থামবি না। ভাগবি আমাকে ফেলে কারুর সঙ্গে। তা ছাড়া —মরেই যদি যাই আমি তো—তোর কি হবে?

একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললে—আমি রসিদকে ব'লে যাব। ওই তোকে দেখবে, বুঝলি। হেসে আবারও বললে—আমি জানি তুর মনের আসল টানটা রসিদের উপর।

রসিদকে ডেকে বললে—গোসা রাখিস না ভাই। আমি চল্লাম। দেখিস—তু মতিকে দেখিস, মেয়েটা ভাল!

গ্রাম থেকে বেরিয়ে একবার সে দাঁড়াল। পিছন ফিরে দেখলে। ওই মন্দির—মন্দিরের উপরের পঙ্কের পালিশ বকের পালকের মত ঝলমল করছে—মাথার উপর পিতলের কলস ঝকমক করছে। ওই মসজিদের দক্ষিণ দিকের মিনার।

আবার সে ফিরল। সাঁওতাল পরগণায় লালমাটির টিলা, সেই টিলার উপর সাহেবানদের গির্জা হবে। চাঁপার কলির মত গোল ক্রমশ সরু স্থচালো হয়ে উঠবে গির্জার চূড়া।

* * * *

শ্যামাদাসবাবুর মন্দির এবং জনাব নিয়ে গল্প শেষ হয়েছে। কিন্তু জনাবের কথা শেষ হয় নাই। সামান্য কয়েকটা কথা।

তিন বৎসর পর জনাবের শেষ দশা। হয়তো আট-দশটা দিন কি দু-একটা মাস—কিম্বা মাত্র কয়েক ঘণ্টা হতে পারে। সাঁওতাল পরগণা থেকে দুরারোগ্য ব্যাধি নিয়ে সে ফিরে এসেছে। অনেক ব্যাধি—তার মধ্যে পেটের অসুখটাই প্রধান। জীর্ণ শরীর, দেখলে চেনা যায় না; বাবরী চুল আছে, কিন্তু তার অধিকাংশই উঠে গিয়েছে। নাকের হাড়টা খাঁড়ার মত উঁচু হয়ে উঠেছে; মোটা হাড়গুলি সার হয়েছে, হাতের আঙুল ঠক ঠক ক'রে কাঁপে। জনাব তবু সেই জনাব। ফিরে এল—সঙ্গে এক ওখানকার সাঁওতাল মেয়ে। বোধ হয় কেরেস্তান। ঘাঘরা না পরলেও বেশ কায়দা ক'রে কাপড় পরে, চুল বাঁধে চমৎকার ছাঁদে। সাধারণ সাঁওতাল মেয়ের মত নয়। পুরানো লোকে বললে—তাজ্জব। একেবারে সেই রঙ্গুর মত দেখতে।

মাসখানেক পর সেদিন জনাব বসেছিল সেই বুড়ো বটতলায়।

তার বাড়ি তিন বৎসর না ছাওয়ানোতে ভেঙে পড়ারই কথা। কিন্তু একেবারে ভেঙে সেখানে নতুন ঘর হয়েছে। জমিদারের বাকী খাজনার নালিশের নীলামে রসিদ আলির বাপ সেটা কিনে পুরানো ঘর ভেঙে নতুন ঘর তুলছে। রসিদ এখন ঠিকাদারী শুরু করছে; তার চুন, সিমেণ্ট, আরও মালপত্র সেখানে থাকে। মতিবালা সেখানে বাঁধা কামিন এখন।

জনাব প্রথম দুটো দিন আব্দুলের বাড়ির দাওয়াতে ছিল। দ্বিতীয় দিন রাত্রে

দাওয়ার আশেপাশে লোক ঘুরতে দেখলে জনাব। সাঁওতাল মেয়েটা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। জনাব তাকে আগলে জেগে ব'সে রইল। সকালে উঠে বাজারের ভিতর গিয়ে একটা ঘর ভাড়া করলে; হাজার হলেও বাজার, এখান থেকে একটা মানুষকে জোর ক'রে তুলে কেউ নিয়ে যেতে পারবে না। জোরের কিন্তু দরকার হ'ল না; দিন বিশেক পরে মেয়েটাই চ'লে গেল—রসিদের আড়তে নয়—তার বাড়িতে; রসিদ তাকে কলমা পড়িয়ে নিকা করবে।

জনাব আব্দুলকে বললে—দুটো ক'রে রান্না ভাত আমাকে দিবি? পয়সা আমি দোব।

আব্দুল বললে—তুমি ওস্তাদ। তুমার কাছে কাম শিখেছি। এ আমার ভাগ্যি। তুমি এইখানেই থাক। তবে পয়সা আমি লিব না।

খুশি হ'ল জনাব। আল্লাহতায়লার দুনিয়া রসুলে আল্লা-হজরত মহম্মদ এসে দিয়ে গেলেন কোরান শরিফ, এসব কি বরবাদ হতে পারে? ইমানদার মানুষ আছে বৈকি। সে বললে—বেশ তবে আমি ম'রে গেলে নিবি। আমাকে ওই বটতলায় একটা ছোট ঘর—চালাঘর বানিয়ে দে। ওখানেই আমি থাকব।

—সে কি?

—হাঁ। চোখের উপর আমি দেখতে পারব না, আব্দুল। তার চেয়ে নিরালায় বেশ থাকব আমি।

সে কিছুতেই তার গোঁ ছাড়লে না।

একটা চালাঘর।

সামনে কতকগুলা ইট। জনাব বলে—মেঝেটা বাঁধিয়ে নেব। তারই কতকগুলা সে বিছিয়ে নিয়েছে বটতলায়, সেইখানে ব'সে থাকে।

আষাঢ় মাস। ঘনঘটায় মেঘ ক'রে এসেছে, আকাশ যেন ভেঙ্গে পড়বে। বৃষ্টি আসবে। জনাব উঠতে চেষ্টা করলে—পারলে না। আবার সে বসল। ওই চলাঘরে গিয়েই বা কি হবে; এ জল আটকাবে না। জোর হাওয়া দিলে হয়তো ভেঙ্গে চাপাই দেবে। আব্দুলের দাওয়াতে গেলেই বা কি হ'ত? ঝাপটায় ভিজতে হ'ত। নিজের ঘর থাকলেও—ভাঙ্গা চাল—দেওয়ালের ফাটলের ভিতর দিয়ে জল আসত। এ নয় তার চেয়ে কিছু বেশী।

ঘন কালো মেঘ। কালো রং মিশানো সিমেন্ট করা মেঝের মত বাহার খুলেছে। বাহবা! বাহবা! ও কি মন্দিরটা নয়? কালো আকাশের গায়ে সোনার বরণ কলস—কয়েকটা দানাবাঁধা বিজলীর মত ঝকমক করছে,তার নিচে পঙ্কের পলেস্তারা করা দুধবরণ মন্দিরের মাথা! আহা-হা-হা! চোখ ফেরালে সে। আকাশ জোড়া কালো মেঘের পালিশের গায়ে হলুদবরণ ঘরে মাধববাবুর তেতলার ঘরের সারি। সোনার বরণ বহুড়ীরা জানালা ধ'রে দাঁড়িয়ে মেঘ দেখছে। নিচের তলায় বৈঠকখানা ঘরে বাবুরা মজলিস ক'রে ব'সে গরম চা খাচ্ছে। বাচ্চারা সব বারান্দায় ছুটাছুটি করছে। তার হাতে গড়া—তার হাতে গড়া ছাদ। কোন ভয় নাই, যত জোরে আসুক বৃষ্টি, এক ফোঁটা গ'লে পড়বে না। আনন্দ রহো, আরাম করো। আরও একটু দৃষ্টি ফিরিয়েই—ওই আর এক টুকরো দালান—কার চিলে-কোঠা—কালো মেঘের গায়ে ভাসা বাড়ির মত মনে হচ্ছে! কবুতরেরা, কাকেরা, পেঁচারা আলসের নীচের খোপে খোপে গিয়ে ঢুকছে; গলা ফুলিয়ে চুপ ক'রে সব ব'সে আছে। এ খোপ রাজমিস্ত্রীরাই রাখে। থাকুন সুখে আরামে মৌজ ক'রে মালিকেরা ঘরের অন্দরে, পাখিরা থাকবে খোপরে-খোপরে। থাক, তোরা আরামসে থাক। খোদাতায়লার কাছে কলকল ক'রে বলিস—জনাব আলির জেনার গোনাহ্ যেন মাফ করেন। আর কোন গোনাহ তার নাই। আবার দৃষ্টি ফেরালে সে, এদিকে কোন কিছু দেখা যায় না। শুধু মেঘ—শুধু মেঘ। বাহারে! চমৎকার মেঘ ত এ-দিকটার! সাদায় কালোয় যেন ভাঙ্গাগড়া চলেছে লহমায় লহমায়। ওই দিকটা দিয়েই সে সাঁওতাল পরগণা গিয়েছিল। বাঃ, সাদা মেঘ ঠিক যেন গির্জার চূড়া হয়ে উঠেছে। চাঁপার কলির মত গোল মিনার ক্রমশ সরু সূচালো হয়ে মিশে গিয়েছে। দুনিয়ার সব দুঃখ সে ভুলে গেল। দৃষ্টি ফেরালে সে আবার।

আঃ—ওই যে মসজিদ—ওই যে তার হাতে গড়া মিনার!

ঝপ ঝপ ক'রে বৃষ্টি নেমে আসছে।

আসুক।

জনাব তাকালে মাথার উপরে—বুড়া বটগাছের পাতায় পাতায় ঢাকা গোল গম্বুজের মত মাথার দিকে। খোদাতায়লার নিজের হাতে গড়া ইমারত!

সব ঝাপসা হয়ে গিয়েছে—এইটুকু ছাড়া।

যাদুকরী

শরতের নির্মল জলভরা বায়ুহিল্লোলিত দীঘিতে কলরব করিয়া যেন একদল বালিহাঁস আসিয়া পড়িল।

আশ্বিন মাস। আকাশ নীল, রৌদ্রে সোনালী আভা, ঘরে ঘরে পুজোর আয়োজন-উদ্যোগের সাড়া, দোকানে দোকানে পণ্যসম্ভার, পরিপূর্ণতায় চঞ্চলতায় গ্রামখানি নির্মল জলভরা বায়ুহিল্লোলিত দীঘির সঙ্গেই তুলনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারই মধ্যে বালিহাঁসের মতই কলরব করিয়া আসিয়া পড়িল দশ বারোটি বাজীকরের মেয়ে ও জনচারেক বাজীকর পুরুষ। বাজীকর অথবা যাদুকর।

বাজীকর একটি বিচিত্র জাতি। বাংলাদেশে অন্য কোথাও আছে বলিয়া সন্ধান পাওয়া যায় না; বীরভূমের সীথল গ্রামে এবং আশেপাশেই ইহাদের বসতি। বেদে নয়, তবু যাযাবরত্বে বেদেদের সঙ্গে খনিকটা মিল আছে। ধর্মে হিন্দু কিন্তু নির্দিষ্ট কোন্ জাতি বা সম্প্রদায়, জাতিকুলপঞ্জিকা ঘাটিয়াও নির্ণয় করা যায় না। পুরুষেরা ঢোলক লইয়া গান করে, যাদুবিদ্যার বাজী দেখায়। নিরীহ শান্ত প্রকৃতি, গলায় তুলসীর মালা, পরনে মোটা তাঁতের কাপড়, দুই কাঁধে দুইটা ঝোলা ও ঢোলক, মুখে এক অদ্ভুত টানের মিষ্ট ভাষা। ঐ ভাষা হইতেই লোকে চিনিয়া লয় ইহারা বাজীকর। মেয়েরা কিন্তু পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিলাসিনীর জাতি। কেশে বেশে বিন্যাস তাহাদের অহরহ, রাত্রে শুইবার সময়ও একবার কেশবিন্যাস করিয়া লয়, প্রভাতে উঠিয়া প্রথমে বসে চুল বাঁধিতে। পরনে শৌখিন-পাড় শাড়ী, হাতে একহাত করিয়া কাচের রেশমী অথবা গিল্‌টির চুড়ি, গলায় গিল্‌টির হার, উপর হাতে তাগা অথবা বাজুবন্ধ, নাকে নাকছাবি, কানে আগে পরিত সারিবন্দী মাকড়ী, এখন পরে গিল্‌টির ঝুমকা, দুল প্রভৃতি আধুনিক ফ্যাশানের কর্ণভূষা। কাঁকালে একটা গোবর-মাটিতে লেপন দেওয়া বিচিত্র-গঠন ঝুড়ি, তাহার মধ্যে থাকে সাপের ঝাঁপি, বাজীর ঝোলা, ভিক্ষা সংগ্রহের পাত্র, সেগুলিকে ঢাকিয়া থাকে ভিক্ষায় সংগৃহীত পুরানো কাপড়। মেয়েদের প্রধান অবলম্বন গান ও নাচ। নিজেদের বাঁধা গান, নিজেদের বিশিষ্ট সুর; নাচও তাই—

বাজীকরের মেয়ে ছাড়া সে নাচ নাচিতে কেহ জানে না; লোকে বলে তামার বদলে রূপো দিলে নির্বিকারচিত্তে নগ্ন অবয়বে নাচে বাজীকরের মেয়ে। দর্শকে চোখ নামায়, কিন্তু বাজীকরের মেয়ের চোখে অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে পলক পড়ে না; দুনিয়ার লোকে ছি ছি করে, কিন্তু বাজীকরের সমাজে ইহার নিন্দা নাই, বাজীকরীর বাজীকরের মনের ছন্দ পর্যন্ত মুহূর্তের জন্য অস্বচ্ছন্দ হইয়া উঠে না।

গ্রামে ঢুকিয়া তাহারা ছড়াইয়া পড়িল। দল বাঁধিয়া উহারা ভিক্ষা করে না; দল দুরের করা—স্বামীস্ত্রীতে একসঙ্গে কখনও গৃহস্থের দুয়ারে দাঁড়ায় না।

—ভিক্ষা দাও মা রানী, চাঁদবদোনী, স্বামীসোহাগী, রাজার মা!

মুখুজ্জে গিন্নী তরকারীর বঁটিতে বসিয়া আনাজ কুটিতেছিলেন, চোখের কোণে দুই ফোঁটা জল টলমল করিতেছিল। সম্মুখে বসিয়াছিল কন্যা রমা, বিষণ্ন নতমুখে নখ দিয়া মাটি খুঁটিতেছিল অকারণে। গিন্নী বিরক্তিভরে বলিলেন—ওরে, ভিক্ষে দিয়ে বিদেয় কর ত, পুজো এলো আর এই হ'ল বাজীকরের আমদানি।

—নাচন ছাখেন মা, গান শোনেন। কই, আমাদের রমা ঠাকরণ কই?

—না। নাচ দেখবার মত মনের সুখ নাই আমার। ওরে!

—বালাই। ষাট! শত্রুর মনের সুখ যাক। আপনার দুঃখ কিসের—

—বকিসনে বলছি। এমন হারামজাদা জাত ত কখনো দেখি নাই। ওরে রমা, ঝি কোথায় গেছে, তুই দে ত ভিক্ষে।

রমা ভিক্ষা লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। বাজীকরের মেয়েটি রমার চেয়ে বয়সে বড় হইলেও দেখিতে প্রায় সমবয়সী মনে হয়। তাহার মুখ স্মিতহাস্যে ভরিয়া উঠিল, পরমুহূর্তেই বলিয়া উঠিল—ভোজটা ফাঁকি পড়লাম দিদি ঠাকরণ!

রমা বিরক্তিভরেই বলিল—নে নে ভিক্ষে নে।

—কোন্ মাসে বিয়া হ'ল ঠাকরণ? কোথা হ'ল বিয়া?

গৃহিণী উঠিয়া আসিলেন, রূঢ়ভাবে বলিলেন—ভিক্ষে নিবি ত নে, না নিবি ত বিদেয় হ'!

—ওরে বাপরে! তাই পারি! আজ শুধু ভিখ নিয়া যেতে পারি! দিদি ঠাকরণের বিয়ার ভোজ খেতে পেলম নাই, বিদায় পেলম নাই—আজ শুধু ভিখ নিয়া যেতে পারি! আজ নাচ দেখাব—গান শুনাব, শিরোপা নিব। কাঁকালের ঝুড়িটা নামাইয়া কাপড়ের আঁচল কোমরে জড়াইয়া বলিল—কাপড় নিব, গয়না নিব,

রমাদিদির কাছে নিব কাঁচের চুড়ির দাম,তবে ছাড়ব। বলিয়াই সে আরম্ভ করিল—

হায় গো দিদি, কাঁচের চুড়ির ঝম্‌ঝমানি
উর-র-র জাগ জাগ জাগিন ঘিনা—
জার ঘিনিনা—
চুরির ওপর রোদের ছটা
হায় মরি কি রঙের ঘটা—
সোণারূপো বাতিল হ'ল কাঁদছে বসে স্যাকরানী।
বেলাত হতে জাহাজ বোঝাই
হ'ল চুড়ির আমদানি।
উর-র-র জাগ জাগ জাগিন ঘিনা—
জার ঘিনিনা—

সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাতের চুড়ি সে তালে তালে বাজাইতেছিল—ঝম্ ঝম্! ঝম্ ঝম্! একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পাক খাইয়া খাইয়া বাজীকরীর সর্বাঙ্গ নাচিতেছিল সাপিনীর মত। গিন্নী ও রমা দুজনের বিষণ্ণ মুখে এতক্ষণে হাসি দেখা দিল—অতি মৃদু ক্ষীণ রেখায়। বাড়ির এবং পাশের বাড়ির মেয়েরাও আসিয়া জুটিয়া গেল। বাজীকরী নাচিয়াই চলিয়াছে—চোখের তারা দুইটি নেশার আমেজে যেন ঢুল ঢুল করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র সুরের গান—

পাড়ার যত এয়োস্তীরি- শাঁখা ফেলে
পরছে চুড়ি—
লালপরী সবুজপরী—মাঝখানে হলুদ পারা—
ওগো চুড়ির বাহার দেখে যা' তোরা—
এবার যদি না দাও চুড়ি, ত্যাজ্য করব
এ ঘর বাড়ি
নয়কো দোব গলায় দড়ি
তবু চুড়ি পরব গো,
হাতের শাঁখা ঘাটে ভেঙ্গে ফেলব চোখের
নোনা পানি।
উর-র-র—জাগ—জাগ—

গান শেষ করিয়া বাজীকরী থামিল।

চুড়ির জন্য গলায় দড়ি দিবার সঙ্কল্প শুনিয়া মেয়েরা মুখে কাপড় দিয়া হাসিতেছিল, একজন বলিল – মরণ!

বাজীকরী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—চুড়ি লইলে মরণ ভাল গো ঠাকরণ! রমা দিদি চুড়ির পয়সা লিয়ে এসো—কাপড় গয়না নিব তোমার বরের কাছে। বর কখন আসবে বলো? চিঠি লিখো তুমি। আমার নাম ক'রে লিখো।

রমা বা গিন্নী কোন কথা বলিল না, একজন প্রতিবেশিনী তরুণী বলিল—তুই যা না হারামজাদী তার কাছে।

—র‍্যাল ভাড়া দাও, ঠিকানা দাও, চিঠি লিখে দাও। আজই যাব! বরং লিয়ে আসব—নাকে দড়ি দিয়া বেঁধে রমা দিদির দরবারে।

—মরণ! ও-পাড়ায় যেতে আবার 'র‍্যাল ভাড়া' লাগে নাকি?

গালে হাত দিয়া মেয়েটা সবিস্ময়ে বলিল—গাঁয়ে গাঁয়ে বিয়া নাকি?

—ঢং করছে! কিছু জানিস না নাকি?

—কি কর‍্যা জানব দিদি, আমরা ফিরেছি তো দেশে তিন দিন।

বাজীকরের জাত ভিক্ষা করিয়া দেশে-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। যাযাবর সম্প্রদায়ের মত গৃহহীন নয় ভূমিহীন নয়—ঘর আছে। প্রাচীনকাল হইতে নিষ্কর জমিও ইহারা ভোগ করে, তবু ভিক্ষা করিয়া ঘুড়িয়া বেড়ায়। পূজার পূর্বে দেশে আসে, পূজার পর বাহির হয়, ফেরে ফসল উঠিবার সময়; ফসল তুলিয়া জমিগুলি ভাগচাষে বিলি করিয়া আমার বাহির হয় নীল সংক্রান্তি অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির গাজন উৎসবের পর। গাজন ইহাদের বিশেষ উৎসব।

মেয়েটি বলিল—ও-পাড়ার বাঁড়ুজ্জে বাড়ির দেবুকে জানিস?

চোখ দুইটি বড় বড় করিয়া বাজীকরী বলিল—খোকাবাবু? কলকাতায় কলেজে পড়ে, টকটকে রঙ, শিবঠাকুরের মত ঢুলু ঢুলু চোখ,—লল্‌ছা'পারা বাবুটি?

—হ্যাঁ।

—অ-মাগো! আমি কুথা যাব গ! মেয়েটা যেন হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িল। —বুঝল ঠাকরণ, বাবুটিকে দেখতম আর ভাবতম ইয়ার গলায় মালা কে দেবে? আর রমা দিদিকে দেখ্যা ভাবতাম ই লক্ষ্মী ঠাকরণটি কার গলায় মালা দিবে?

গভীর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখুজ্জে গিন্নী বলিলেন—থাম বাবু তুই, আদিখ্যেতা করিস নে ; কপালে আমার আগুন লেগেছিল—তাই ওই ঘরে বরে আমি বিয়ে দিতে গিয়েছিলাম।

—কেনে মা ? মেয়েটা চকিত হইয়া উঠিল। চারিদিকে সকলের মুখের দিকে সে একবার চাহিয়া দেখিল, সকলেরই মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে ! রমা দাঁড়াইয়াছে দূরে, নতমুখে। না দেখিয়াও চতুরা বাজীকরী বুঝিয়া লইল—রমার চোখে জল ছলছল করিতেছে।

ক্ষতসন্ধানী মক্ষিকার মত মেয়েটা ব্যগ্রতায় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

* * *

মুখুজ্জেরা অবস্থাপন্ন লোক। গ্রামখানি বেশ বড়, গ্রামের চেয়ে ছোট শহর বলিলেই ঠিক হয়—ব্যবসা-বাণিজ্যের কল্যাণে দিন দিন বড় এবং শহরের শ্রীতেই সমৃদ্ধ হইয়া চলিয়াছে ; অবস্থাপন্ন ব্যবসাদারও কয়েকজন আছে, তবু মুখুজ্জেরা অবস্থাপন্ন বলিয়া খ্যাতি আছে। রমা পিতামাতার একমাত্র সন্তান। শ্রীমতী মেয়ে বাপ-মায়ের আদরের দুলালী ; মেয়েকে চোখের আড়াল করিতে পারিবেন না বলিয়াই গ্রামে বিবাহ দিয়াছেন। ঘর জামাইকেও মুখুজ্জে কর্তা ঘৃণা করেন। ও-পাড়ার বাঁড়ুজ্জেরা এককালে সম্ভ্রান্ত সঙ্গতিপন্ন ঘর ছিল—এখন শুধু সম্ভ্রম আছে, সঙ্গতি নাই। এই বাঁড়ুজ্জেদের দেবনাথ ছেলেটি বড় ভাল। সুরূপ সুন্দর ছেলে, বি. এ. পাস করিয়া এম. এ, পড়িতেছে। এই ছেলেটির সঙ্গে মুখুজ্জেরা রমার বিবাহ দিয়াছেন। ক্ষেতের কলা-মূলা হইতে রান্না-করা তরকারী পর্যন্ত যাহা নিজেদের ভাল লাগিবে—তাহাই মেয়ে-জামাইকে পাঠাইয়া দিবেন, মেয়ে একবেলা থাকিবে শ্বশুরবাড়িতে একবেলা থাকিবে বাপের বাড়িতে—এই ছিল তাঁহাদের কল্পনা।

বিবাহের পর কিন্তু বিরোধ বাধিয়াছে এইখানেই। বনিয়াদী বাঁড়ুজ্জেরা কলা-মূলা রান্না-করা তরকারী উপঢৌকনে অপমান বোধ করিয়াছেন। বধূর একবেলা এখানে—একবেলা ওখানে থাকাও তাঁহারা বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। বাদ-প্রতিবাদই চলিতেছিল, অকস্মাৎ একদিন রমাই সেটাকে বিবাদে পরিণত করিয়া তুলিল। রোজ অপরাহ্ণে মুখুজ্জে বাড়ির ঝি আসিয়া রমাকে লইয়া যাইত—দুধ এবং জল খাইবার জন্য। সেদিন কিসের ছুটিতে দেবনাথ

আসিয়াছিল বাড়ি। রমার শাশুড়ী আপত্তি তুলিয়া বলিয়াছেন—দেবু বাড়ি এসেছে, আজ আর বৌমা যাবে না।

পরক্ষণেই দীর্ঘদিনের সঞ্চিত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া তিনি বলিলেন—আর রোজ রোজ কচি খুকীর মত দুধ খেতে যাওয়াই বা কেন? গরীব ব'লে কি দুধও খাওয়াতে পারিনে আমি বেটার বউকে? বলিস তুই, একটা পাড়া অন্তর রোজ আমার বেটার বউ আমি পাঠাব না।

ঝি-টা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল—আজকের মত পাঠিয়ে দেন মা, মা আজ খাবার-দাবার করেছেন—

—না-না-না! রূঢ়স্বরে রমার শাশুড়ী জবাব দিয়াছিলেন।

ঝি ফিরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর দেখা গিয়াছিল—বউ বাড়িতে নাই। গ্রামের মেয়ে মা-বাপের আদরের দুলালী ততক্ষণে জনবিরল গলি পথে পথে মায়ের কাছে গিয়া হাজির হইয়াছিল।

আরও কিছুক্ষণ পর মুখুজ্জে বাড়ি হইতে এক প্রবীণা আত্মীয়া আসিয়াছিলেন দেবনাথের নিমন্ত্রণ লইয়া—কই হে দেবুর মা! দেবুর আজ নেমন্তন্ন ও-বাড়িতে। শ্বশুর পাঁঠা কেটেছে। শাশুড়ী খাবার করেছে।

নিমন্ত্রণ স্বীকার বা অস্বীকার কিছুই না করিয়া দেবুর মা জানাইয়াছিলেন কেবল ভদ্রতাসম্মত সম্ভাষণ—এসো ব'সো।

—বসব না ভাই। নেমন্তন্ন করতে এসেছিলাম। বউও তোমার ও-বাড়িতে। খেয়ে দেয়ে বউ-বেটা তোমার ও-বাড়িতেই আজ থাকবে; কাল সকালে আসবে।

বাঁড়ুজ্জে গিন্নীর মুখ আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতের মত থমথমে হইয়া উঠিয়াছিল—কথার জবাব তিনি দেন নাই।

—তা হ'লে চললাম ভাই। সন্ধ্যাতেই পাঠিয়ে দিও দেবুকে—

—দেবুকেই কথাটা ব'লে যাও।

—সে কি?

—হ্যাঁ। ব্যাটার শ্বশুরবাড়ির কথাতেও নাই, বউয়ের কথাতেও আমি নাই।

দেবনাথ রাত্রে যায় নাই। সেও বধূর এই আচরণে ক্ষুব্ধ না হইয়া পারে নাই। শ্বশুর-শাশুড়ীর এই প্রশ্রয়পূর্ণ ব্যবহারও তাহার ভাল লাগে নাই।

তাহার উপর ক্ষুব্ধ মাকে উপেক্ষা করিয়া এই নিমন্ত্রণ রক্ষার কোন উপায়ই ছিল না।

ঝগড়ার সূত্রপাত এইখানেই।

দেবনাথের মা বলিলেন—বধূর পিতামাতাকে কন্যাকে লইয়া অপরাধ স্বীকার করিয়া এ বাড়িতে দিয়া যাইতে হইবে।

রমার মা বলিলেন—দেবনাথ নিজে আসিয়া রমার অভিমান ভাঙ্গাইয়া তাহাকে লইয়া যাইবে—তবে তিনি কন্যাকে পাঠাইবেন। উপেক্ষিতা রমা সেদিন নাকি কাঁদিয়াছিল। ধীরে ধীরে সেই বিবাদ কঠিন পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। দেবনাথ স্ত্রীকে চিঠিপত্র পর্যন্ত লেখে না। দেবনাথের মা আস্ফালন করেন—ছেলের তিনি বিবাহ দিবেন—ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক—এই অকাল কয়মাসের অপেক্ষা।

রমার মা ইহাতে ভয় পান না; তিনি কন্যার জন্য দালান-কোঠার প্ল্যান করেন। ইদানীং তিনি খোরপোশ আদায়ের আর্জি পর্যন্ত মুসাবিদা করিতে শুরু করিয়াছেন।

ভরসা কেবল দুই পক্ষের পিতা।

মুখুজ্জে কর্তা ব্যবসা-বাণিজ্যে মহাজনী লইয়া ব্যস্ত। বাঁড়ুজ্জে কর্তা আজীবন মাস্টারী করিয়াছেন—রিটায়ার করিয়াও তিনি আজও পড়াশুনা লইয়া ব্যস্ত। ইতিহাসের মাস্টার—ভাঙ্গামূাত, পুরানো পুঁথি সংগ্রহ করিয়া গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়ান। দুই পক্ষের গিন্নী তারস্বরে চীৎকার করিয়াও অপদার্থ মানুষ দুইটিকে সচেতন করিতে পারেন না বলিয়া মধ্যে মধ্যে কপালে করাঘাত করেন।

বাজীকরী খিল খিল করিয়া হাসিয়া সারা হইল।

মুখুজ্জে গিন্নীর প্রতিবেশিনীর বাড়িতে বসিয়া কথা হইতেছিল। প্রতিবেশিনী বিরক্ত হইয়া বলিল—মর, এতে আবার হাসি কিসের?

—হাসি নাই? ছাগলের লড়াই দেখেছ ঠাকরণ? বলিয়া আবার খিল খিল করিয়া হাসি!

—হাসি তামাসা পরের কথা রাখ; এখন আমি যা বললাম তার কি বল!

তাহার দিকে চাহিয়া বাজীকরী বলিল—তুমার হাতে যোগবশের ওষুদ খাটবে নাই ঠাকরণ!

মেয়েটি বশীকরণের ঔষধ চায়। সবিস্ময়ে সে বলিল—খাটবে না? কেন?

—রাগ কর নাই। তুমি বড় ময়লা থাক ঠাকরণ। আমার ওষুদ লিতে হ'লে তুমাকে পরিষ্কার হতে হবে কিন্তুক।

—আমি তো রোজ চান করি—

—স্নান করা লয় ঠাকরণ; পরিষ্কারের অনেক করণ আছে। তোমাকে কাপড় পরতে হবে, কেশবিন্সেস করতে হবে, ঢলকো ক'রে চুল বাঁধবা, কপালে সিঁদুরের টিপ পরবা! গায়ে গন্ধ লিবা। আলতা পরবা। খোঁপাতে ফুল পরবা, সেই ফুল কর্তার হাতে দিবা। দেখ পার ত এলাচ আন আমি মন্তর দিয়া প'ড়ে দি।

স্থির দৃষ্টিতে বাজীকরীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া মেয়েটি বলিল—পারব।

—তবে আন, এলাচ আন, ছোট এলাচ দারচিনি, বড় এলাচ; মন্তর পড়ে দিব, তাই দিয়া মোটা খিলি ক'রে পান সাজবা, নিজে খাবা; খেয়ে কর্তাকে দিবা। কিন্তুক যা বললাম—তা না করলে খাটবে নাই ওষুদ। তখন যেন আমাকে গাল দিও না। আর পাঁচটি পয়সা লাগবে, পাঁচ পাই চাল লাগবে, পাঁচটি সুপারী সিঁদুর—আর পুরানো কাপড় একখানি। লিয়ে এসো।

* * *

বাজীকরী চলিয়াছে বাজারের পথে।

একটা দোকানের সম্মুখে লোকের ভিড় জমিয়াছে, বাজীকর পুরুষ বাজী দেখাইতেছে।

—লাগ—লাগ—লাগ—লাগ ভেল্কী লাগ! লাগ বললে লাগবি, ছাড় বললে ছাড়বি। ভাটরাজার দোহাই দিয়ে ডুববি বেটা টুপ টুপিয়ে—! বাহারে বেটা—বাহারে!—

একটা বাটির জলে একটা কাঠের হাঁস—ক্রমাগত ডুবিতেছিল আর উঠিতেছিল।

—হাঁ—হাঁ বেটা আর ডুবিস না, সর্দি লাগবে জর হবে!

হাঁসটা ডোবা বন্ধ করিল।

—এইবার আমার কাঠের হাঁস—শুন আমার কথা, খিধায় জলছে পেট, ঘুর‍্যা পড়ছে মাথা। প্যাক প্যাকিয়ে ডাক ছেড়্যা, দে দেখি একটা ডিম পেড়্যা; আগুন জেল্যা পুড়ায়ে খাই।

একটা ঝুড়ির ভিতর কাঠের হাঁসটাকে চাপা দিয়া বাজীকর বোল আওড়াইয়া

একটা হাড় ঝুড়িটাতে ঠেকাইয়া দিল।—ভাটরাজার দোহাই দিয়ে, ওঠ বেটা প্যাক প্যাকিয়ে—! দোহাই ভাটরাজার দোহাই! সঙ্গে সঙ্গে ঝুড়িটা উঠাইতেই দেখা গেল কাঠের হাঁস জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, ঠোঁট দিয়া সে পালক খুঁটিতেছে, পাশে একটা ডিম।

দর্শকের দল আনন্দে বিস্ময়ে হই-হই করিয়া উঠিল। ছোট ছেলের দলে হাততালি আর থামে না। বাজীকরী মৃদু হাসিতে হাসিতে তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিল।

—এই বাজকরুণী! এই! থানার বারান্দায় বসিয়া ছিল কয়েকজন পুলিস কর্মচারী। তিনজন ভদ্রলোক চেয়ারে বসিয়া ছিল। জনকয়েক বসিয়া ছিল বারান্দায়। একজন ডাকিল—এই বাজকরুণী! এই!

বাজীকরী আসিয়া কাঁকালের ঝুড়িটি নামাইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।—পেনাম দারোগাবাবু!

—তোর নাচ দেখা দেখি! এই বাবু তোদের নাচ দেখেন নাই, দেখবেন।

বাজীকরী দেখিল, তাহার চেনা বড়-দরোগা ও ছোট-দারোগার পাশে নূতন একটি বাবু। চতুরা বাজীকরীর ভুল হইল না, সে মুহূর্তে চিনিল, এও এক দারোগাবাবু। গোঁফের এমন জাঁকালো ভঙ্গী, কপালে এমন গোল দাগ, গায়ে এমন হাতকাটা খাঁকীর জামা দারোগা ছাড়া কাহারও হয় না।

বড়-দারোগাকে প্রণাম করিয়া সে বলিল—আপুনি ই-থান থেক্যা চল্যা যাবেন বাবু?

—হঠাৎ আমাকে বিদেয় করবার জন্যে তোর এত গরজ কেন?

—আজ্ঞে, লতুন দারোগাবাবু এলেন—তাথেই বলছি!

—উনি এখানে কাজে এসেছেন।

—কাজে?

—হ্যাঁ, তোকে ধ'রে নিয়ে যাবেন। পরোয়ানা আছে তোর নামে।

—আমার নামে? মেয়েটি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—হাসছিস যে! তোরা হারামজাদীরা পাকা চোর।

হাসিতে হাসিতে বাজীকরী বলিল—আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু ধর্যা কি করবেন হুজুর, মন চুরির বামাল যে সনাক্ত হয় না।

নূতন দারোগাবাবুটি চোখ কপালে তুলিয়া বলিল—ওরে বাপ রে!

বাজীকরী দুই হাত তুড়ি দিয়া আরম্ভ করিল—

উর-র জাগ জাগ জাঘিন ঘিনা জার ঘিনিনা—

সরু কাপড় নক্সিপেড়ে—মাকড়ী চুড়ি গয়না—

গোট পাটা সাপ কাঁটায় পুঁজিপাটা রয়না—

বিদায় হইয়া বাজীকরী চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু বারান্দায় উপবিষ্ট কনস্টেবল দলের জনদুয়েক উঠিয়া গিয়া থানার বড় বটগাছটার আড়াল হইতেই তাহাকে ডাকিল।

হাসিয়া বাজীকরী বলিল—বলো, কি বলছ।

—আমাদের আলাদা ক'রে নাচ দেখাতে হবে।

—দেখাব।

—ল্যাংটা হয়ে নাচতে হবে! 'এরা এসেছে ভরতপুর থেকে, দেখবে।

মুখের দিকে চাহিয়া বাজীকরী বলিল—একটি টাকা লিব কিন্তুক।

—আমি দেব।

—তুমি ভরতপুরের সিপাই?

—হ্যাঁ।

চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া বাজীকরী বলিল—কিসের লেগে এলে তুমরা?

—কাজ আছে, পুলিসের কাজ।

ফিক্ করিয়া হাসিয়া মেয়েটা এবার বলিল—কার মাথা খেতে এসেছ আর কি?

কনেস্টবলটিও হাসিল।

বাজীকরী তাহার গা ঘেঁষিয়া চলিতে চলিতে মৃদুস্বরে বলিল—মানুষটা কে বঁধু?

কনস্টেবলটা তাহার মুখের দিকে চাহিল;—মদিরদৃষ্টিতে বাজীকরী তাহারই দিকে চাহিয়াছিল, ঠোঁটের রেখায় রেখায় মাখানো লাস্যভরা হাসি।

মেয়েটা সত্যই নাচে সমস্ত আবরণ পরিত্যাগ করিয়া! এতটুকু সঙ্কোচ নাই, কুণ্ঠা নাই, যৌবন-লীলায়িত অনাবৃত তনুদেহ চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। সকলের কলুষদৃষ্টি তাহার দিকে নিবদ্ধ থাকিলেও তাহার দৃষ্টি কাহারও দিকে নিবদ্ধ ছিল না। কণ্ঠে মৃদুস্বরে সঙ্গীত—

হায়রে মরি গলায় দড়ি
তুমি হরি লাজ দিবা,
হায়রে মরি গলায় দড়ি
তুমি হরি লাজ দিবা,
তুমার লাজেই আমি মরি
লইলে আমার লাজ কিবা।
কুল ত্যজিলাম মন সঁপিলাম
কলঙ্কেরই কাজল নিলাম—
হায়রে মরি বস্ত্র নিয়া
তুমি আমায় লাজ দিবা!
উর-র জাগ জাগিন ধিনা— ;

আগন্তুক কনেস্টবলটি একটা টাকাই দিল। খানিকটা পথও তাহাকে আগাইয়া দিল। মেয়েটি বলিল—এইবার এসো লাগর, আর লয়।

হাসিয়া সিপাহী বলিল—আচ্ছা!

—তুমি কিন্তুক লোক ভাল লয়।

—কেন?

—বলো না কথাটা! মেয়েটি ফিক্ করিয়া হাসিল।

* * *

আশ্বিনের প্রথম নির্মেঘ-নির্মল নীল আকাশে মধ্যাহ্ন-ভাস্কর ভাস্বরতম দীপ্তিতে জ্বলিতেছে। বৈশাখে প্রখরতর বটে, কিন্তু এমন উজ্জ্বল নয়। বিগত-বর্ষার বর্ষণসিক্ত মাটি হইতে সূর্যের উত্তাপে যেন বাষ্পোত্তাপ উঠিতেছে। ঘামে ভিজিয়া মানুষ সারা হইয়া গেল।

বাজীকরের দল এখনও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গৃহস্থের বাড়িতে তাহারা আহারের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। এইবার সেইখানে গিয়া পাতা পাড়িয়া বসিবে। বাঁড়ুজ্জে বাড়িতে সেই বাজীকরী আসিয়া চাপিয়া বসিল।

—পেসাদ হ'ল মা ঠাকরণ। বাবুদের সেবা হ'ল। পড়ল পাতার এঁটোকাঁটা?

বাঁড়ুজ্জে গিন্নী বলিলেন—বস্ বস্, চেঁচাস নে।

ছেলে দেবনাথ পান মুখে দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, সে বাহির দরজার ওপাশ হইতে মেয়েটাকে ডাকিল—শোন!

কাছে আসিয়া ঠুক করিয়া একটি প্রণাম করিয়া মেয়েটা ফিক্ করিয়া হাসিল, বলিল—আপনার ভিতরটা পাথরে গড়া!

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দেবনাথ বলিল—বলেছিস মাকে?

চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া মেয়েটি বলিল—মিছা বলেছি তো বেটাবেটীর মাথা খাব বাবু!

—তুই দেখেছিস?

—নিজের চোখে গো! বাপ কাঁদছে, মা কাঁদছে, মেয়ের সেই পণ!

কথাবার্তায় বাধা পড়িল। ভিতর হইতে গিন্নী ডাকিলেন—হ্যালা রাজ-কন্নী, গেলি কোথায়?

দেবনাথ তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল—দেখ্, মা ডাকছেন।

গিন্নী বলিলেন—ওই শোনো ওর কাছে।

বাঁড়ুজ্জে কর্তা মেয়েটার দিকে চাহিয়া বলিলেন—বাজীকর তোরা?

—আজ্ঞা হ্যাঁ বাবু; আপনকাদের চরণের ধূলা।

—হুঁ! সাপ আছে? বাজী দেখাতে পারিস? গান গাইতে পারিস? মন্তরতন্তর ওষুদপত্র জানিস?

—আজ্ঞা হ্যাঁ হুজুর।

—ভাটরাজাকে জানিস? ভাটরাজা?

বারবার প্রণাম করিয়া মেয়েটা বলিল—ওরে বাপরে! দেবতা আমাদের! ভগবান আমাদের! এখনও জমি খাই, দোহাই দিয়ে বাজী দেখাই!

মৃদু হাসিয়া কর্তা বলিলেন—ভাটরাজ নয়। তাঁর নাম হ'ল ভবদেব ভট্ট। আর তোদের গ্রামের নাম কি জানিস? সীথল গাঁ নয়—সিদ্ধল, সিদ্ধল!

গিন্নী রাগিয়া একেবারে আগুন হইয়া উঠিয়াছিলেন, বলিলেন—বলি হ্যাঁগা! ঐ সব জিজ্ঞেস করতে তোমায় ডাকলাম বুঝি? যত বাজে—

—বাজে নয়। রাঢ়দেশে সিদ্ধলে ভবদেব ভট্ট মহাপ্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তিনি—

—এই দেখো, এইবারে আমি মাথা খুঁড়ে মরব?

কর্তা একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলেন।

মেয়েটারও বিস্ময়ের সীমা ছিল না; সীথল গ্রামের নাম 'সিদ্ধল', ভাটরাজার নাম 'ভবদেব ভট্ট'! সে বলিল—কর্তাবাবু—আপনি এত কি কর‍্যা জানলা গো?

গিন্নী বলিলেন—বউমায়ের কথা জিজ্ঞেস করো ওকে। ও নিজে চোখে দেখেছে!

—জিজ্ঞেস আর কি করব! আজই ব্যবস্থা করছি আমি। কর্তা চলিয়া গেলেন পড়ার ঘরে; সিদ্ধলে ভবদেব ভট্টের ইতিহাসটা আজও তাঁহার অসমাপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে। আজ এই বাজীকরীকে দেখিয়া মনে পড়িয়া গিয়াছে।

*　　　*　　　*　　　*

অপরাহ্ণেরও শেষ ভাগ।

বাজীকরের দল গ্রাম ছাড়িয়া আপন গ্রাম সীথল গ্রামের দিকে চলিয়াছে। গ্রামের প্রান্তে আসিয়া সেই বাজীকরীটা থমকিয়া দাঁড়াইল।

—তুরা চল গো। সবরাজপুরের হোথা দাঁড়াস খানিক। আমি এলাম বল্যে। দলের কেহ কোন প্রশ্ন করিল না; বলিল—আচ্ছা।

—হ্যাঁ, ও নটবর, তুর বাজীর ঝোলা আর ঢোলকটা দিবি?

নটবর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—তু বড় বাড়াবাড়ি করছিস কিন্তুক। মেয়েটা উত্তরে কেবল হাসিল। নটবর মুখে ও-কথা বলিয়াও ঝুলি ও ঢোলক দিতে আপত্তি করিল না। কাঁকালের ঝুড়িতে কাপড় চাপা দিয়া বেশ করিয়া ঢাকিয়া লইয়া মেয়েটা দ্রুতপদে গ্রামের দিকে চলিয়া গেল। আসিয়া উঠিল ডোমপাড়ায়।

ডোমপল্লী—এ অঞ্চলের বিখ্যাত চোর-ডাকাতের পল্লী। পল্লীর প্রত্যেক মানুষটির রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে অসংখ্য কোটি চৌর্যপ্রবণতার বীজাণু যেন কিলবিল করে।

—গান শোনবা গো। গান! নাচন দেখ। নাচন! মেয়েটা শশী ডোমের বাড়ি আসিয়া ঢুকিল। কাহারও সম্মতির অপেক্ষা করিল না, গান আরম্ভ করিয়া দিল। গান গাহিতে গাহিতে চকিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে চাহিয়া দেখিল। সহসা নজরে পড়িল কোঠার জানালায় একখানি মুখ। বাইশ-চব্বিশ বৎসরের জোয়ানের মুখ! মুখখানা তাহার ভাল লাগিল। গান শেষ করিয়া সে শশীকে ডাকিল—শোনো।

—কি ?

—উপরে মানুষটি কে ?

শশী ক্রোধে ভীষণ হইয়া উঠিল।

হাসিয়া মেয়েটি বলিল—রাগ করছ কেনে, ভাল বলছি। তুমার জামাই, হামি জানি।

শশী স্তম্ভিতের মত মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিল।

মেয়েটি বলিল—ভরতপুর থেকে দারোগা এসেছে, সিপাই এসেছে। কাল সকালে তুমার ঘর খানাতল্লাস হবে, উয়ার নামে পরোয়ানা আছে।

শশী এবার শুকাইয়া গেল।

—তুমার দুয়ারে সারাদিন নোক মোতায়েন আছে। সাঁজের পরে ঘর ঘেরাও করবে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শশী বলিল—জানি।

—এক কাজ করো। এই ঢোলক দাও, এই ঝুলি দাও উয়ার কাঁধে। মাথায় মুখে গামছাটা বেঁধ্যা দাও ফেটা ক'রে। আমার সাথে সাপ আছে। আমি ধরি মুখটা—উ ধরুক লেজটা, তুমরা চেঁচাও 'সাপ সাপ' বল্যা। আমি উয়াকে নিয়ে চল্যা যাই, পুলিশের নোক বুঝতে লারবে, ভাববে আমরা বাজীকর।

মেয়েটা হাসিতে আরম্ভ করিল, সে যেন আকণ্ঠ মদ খাইয়া নেশায় বিভোর হইয়া পড়িয়াছে।

বাজীকরী চলিয়াছে, সঙ্গে তাহার নকল বাজীকর। দ্রুতপদে পথ অতিক্রম করিয়া গ্রাম পার হইয়া চলিতেছে। দক্ষিণপাড়া ভদ্রলোকের পল্লী, পল্লীপথে একখানা পাল্কী আসিতেছে। সঙ্গে দুইজন লোকের মাথায় বাক্স ও কুটুম্ববাড়ির তত্বতল্লাসের জিনিসপত্র।

পাল্কীটা আসিয়া থামিল বাঁড়ুজ্জে বাড়িতে। পাল্কী হইতে নামিল বাঁড়ুজ্জে বাড়ির বধূ—মুখুজ্জে বাড়ির মেয়ে রমা। বাঁড়ুজ্জে গিন্নী আজই দেবনাথকে পাল্কী সঙ্গে দিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহার বধূকে আজই সন্ধ্যার পূর্বে মাহেন্দ্রযোগে পাঠাইয়া দিতে হইবে। মুখুজ্জে কর্তার অমত কোনও কালেই ছিল না। মুখুজ্জে গিন্নীও আর অমত করেন নাই। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল—দেবনাথ নিজে আসিয়া কন্যার অভিমান ভাঙাইয়া লইয়া যাইবে তবে পাঠাইবেন। দেবনাথ নিজে লইতে

আসিয়াছে, কন্যার অভিমান নাই; সুতরাং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সম্মত হইয়া পাঠাইয়া দিলেন। জামাইয়ের হাত ধরিয়া চোখের জলও ফেলিয়াছেন। কাল তিনি বেয়ানের কাছেও আসিবেন। বাপরে, তিনি জামাইয়ের মা, তাঁহার উপর তিনি গাহিতে পারেন? মেয়ে পাঠাইয়া তিনি কর্তার কাছে চলিলেন—মেয়ে জামাইয়ের পূজার ফর্দ লইয়া।

মুখুজ্জে গিন্নী কর্তার ঘরে ঢুকিয়া লজ্জায় গালে হাত দিলেন। তাঁহার প্রতিবেশীর ঘরের খোলা জানালা দিয়া যাহা তিনি দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার লজ্জার অবধি রহিল না। প্রতিবেশিনী মেয়েটি তো খুকী নয়, সে আজ রঙীন শাড়ী পরিয়াছে, ব্লাউস পরিয়াছে, কেশবিন্যাসের কি পরিপাট্য, খোঁপায় ফুল! স্বামীর সহিত যাহার দিনরাত ঝগড়া হইত—সে হাসিয়া স্বামীর হাতে পান দিতেছে। স্বামীও হাসিতেছে।

রমা পাল্কী হইতে নামিয়া শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া নীরবে অপরাধিনীর মত দাঁড়াইল।

শাশুড়ী সেটুকু অনুভব করিয়া সস্নেহে বধূর মাথায় সিঁদুর দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—ছি মা, কি সর্বনাশ বলো দেখি!

রমার চোখ হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। গিন্নী বলিলেন—যাও, আপনার ঘর দেখে-শুনে নাও গে। আমি বুড়োমানুষ পারব কেন—তবু যা পেরেছি গুছিয়ে রেখেছি।

গিন্নী কর্তার ঘরের দিকে গেলেন। কর্তা ঘাড় গুঁজিয়া লিখিতেছিলেন।

—দেখ, কথাটা সত্যি।

—হুঁ।

—আফিং যদি না খেতে চাইবে তবে বৌমা কাঁদল কেন? বাজকরুণী ভাগ্যে দেখেছিল! ছুঁড়িটা এইদিন এলে একখানা কাপড় দেব।

কর্তা মুখ তুলিয়া বিজ্ঞের মত খানিকটা হাসিয়া বলিলেন, ওদের খবর মিথ্যা হয় না গিন্নী! ওরা কায়া জানো! আবার খানিকটা হাসিয়া বলিলেন—ওরা নিজেরা অবশ্য জানে না; বাংলাদেশেই বা ক'জনে জানে! শোনো—

রাঢ়ের সিংহলরাজ ভবদেব ভট্ট—গুপ্তচরের এক অতি নিপুণ সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নটী ও রূপোপজীবিনীদের সন্তানসন্ততি লইয়া গঠিত হইয়াছিল

এই সম্প্রদায়। নারী এবং পুরুষ উভয় শ্রেণীই গুপ্তচরের কাজ করিত। ইহাদিগকে ভোজবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, মন্ত্রতন্ত্র, অবধৌতিক চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হইত ; নারীরা নৃত্যগীতে নিপুণ ছিল। এই সম্প্রদায় যাযাবরের মত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দেশ-দেশান্তরের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিত। তৎকালীন অন্যান্য রাজারাও এই দৃষ্টান্তে···

গিন্নী চলিয়া যাইতেছিলেন, কর্তা বলিলেন, শেষটা শোনো—

গিন্নী পিচ্ কাটিয়া বলিলেন, ওসব শুনবার আমার এখন সময় নেই। যত সব উদ্ভট কথা!

* * * *

গ্রামের প্রান্তে নকল বাজীকরকে বিদায় দিয়া বাজীকরী বলিল—চললাম নাগর! এইবার চল্যা যাও সোজা।

দ্রুতপদে বাজীকরী সবরাজপুরের দিকে চলিল।

এত বড় ডোম জোয়ানটি বার বার কথা বলিতে চাহিয়াও পারিল না। বহুকষ্টে অবশেষে তাহার কথা ফুটিল—সে ডাকিল, শোনো!

কেহ উত্তর দিল না। রাত্রির অন্ধকারে-অভ্যস্ত চোখে ডোম ছেলেটি দৃষ্টি হানিয়া তাকাইল—কিন্তু দেখিতে পাইল না। বাজীকরী যেন মিলাইয়া গিয়াছে।